পাতাঝরার মরশুমে

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

ত্রি বে ণী প্র কা শ ন
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

২৬শে জানুয়ারী,
১৯৬১

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর
ননীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস প্রাইভেট লি
৯, এণ্টনি বাগান লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ
সমীর সরকার

অলংকরণ
সুধীর মৈত্র

ব্লক
সিগনেট ফটোটাইপ

প্রচ্ছদমুদ্রণ
চয়নিকা প্রেস

বাঁধাই
ইউনিভার্সাল বাইণ্ডার্স

স্বর্গীয়া অর্চনা চক্রবর্তী ও শ্রীশ্যামলকুমার চক্রবর্তী

মাম্মি ও ড্যাডি—তোমাদের

হাড়িকাঠটা দেখলেই গা ছমছম করে দিয়েগোর। লাল সিঁদুর মাখানো কালো কাঠের তৈরি জিনিসটা, ইংরেজি ইউ অক্ষরের মতো দেখতে। সারাদিন এরকম ধুলো বালির মধ্যে পড়ে থাকলেও বেশ চকচক করে জিনিসটা। শুনেছে সত্তর-আশি বছর আগেও নাকি এখানে লুকিয়ে চুরিয়ে নরবলি হত। কোনও এক তান্ত্রিক নাকি নর রক্ত পান করতেন।

এই গাছটার পিছনেই একটা বড় বাউন্ডারি ওয়াল। তার মধ্যে একটা বিশাল ম্যানশন ধরনের বাড়ি। আগে দিয়েগো দেখত যে বাড়িটা একদম অযত্নে পড়ে আছে। কেমন প্লাস্টার-খসা, গাছ-গজানো, ভাঙাচোরা চেহারা। কিন্তু গত কয়েক মাসে বাড়িটাকে সারানো হয়েছে, সাজানো হয়েছে। লোহার গেটের ফাঁক দিয়ে ও দেখেছে যে ভেতরের বাগানটাও প্রুন করে সুন্দর করা হয়েছে। হালকা কুসুম রং করা হয়েছে বাড়ির দেওয়ালে। কে বাড়িটায় আসছে কে জানে। তবে যে-ই আসুক সে যে খুবই বড়লোক সেটা দিয়েগো বুঝতে পেরেছে। এই শেষ বিকেলের অল্প আলোতেও নতুন বাড়িটা ঝিকোচ্ছে। দিয়েগো ভাবল এমন বাড়ি বাটানগরে আর নেই।

"কাকা, যাই বলো পরশুর ম্যাচটা কিন্তু জিততেই হবে। তা হলে তিন বছর পরপর কাপটা রাখার চান্স আছে আমাদের। তুই তো জানিস রিটার্ন ম্যাচে ওদের টিম বরাবর হারে। গুরু তোমায় বাঁচাতেই হবে, নিজের নামটা সার্থক করতেই হবে।" জ্যাকসনের কথায় দিয়েগো ওর দিকে মুখ ফেরাল। জ্যাকসনটা এরকমই, কাকা, জ্যাঠা যা খুশি ডাকে। সবাই জ্যাকসন জ্যাকসন বলে বটে, আসলে কিন্তু জ্যাকসন ওর নাম নয়। ওর আসল নাম হল মনোময় মুখোপাধ্যায়। ওকে জ্যাকসন নামে কেন ডাকা হয় তার পিছনে একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে।

দিয়েগোরা তখন ক্লাস এইটে পড়ে। একদিন স্কুলে মনোময় এল অদ্ভুত দেখতে একটা বেল্ট পরে। লাল রঙের, লোহার চকড়াবকড়া নাট-বল্টুর মতো কী সব লাগানো সেটায়। আর বকলেশের জায়গায় লোহার একটা কচ্ছপ লাগানো। স্কুলের সাদা জামা কালো প্যান্টের সঙ্গে একদম মানাচ্ছিল না সেটা। প্রথমেই যাদব স্যারের ক্লাস ছিল। জ্যাকসনের কাণ্ড দেখে তিনি তো রেগে লাল, বললেন, "এসব কী পরেছিস? জোকারের মতো লাগছে। খোল এক্ষুনি, খুলে ফেল।"

মনোময় গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়েছিল, "স্যার, বেল্ট খুললেই কেলো হবে, আজ আবার আন্ডার প্যান্ট পরিনি। আর এরকম বেল্ট তো মাইকেল জ্যাকসনও পরে। তখন তো কোনও দোষ হয় না।"

স্যার আর কিছু বলেননি, মানে বলার আর কিছু ছিল না আর কী।

সেই ঘটনাটা কীভাবে যেন সারা স্কুলে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তার পর থেকেই মনোময় হয়ে উঠেছে জ্যাকসন। আর এই ক্লাস টুয়েলভ অবধি পৌঁছোতে পৌঁছোতে মনোময় নামটাই প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে, আর জ্যাকসন নামটা চলে এসেছে সামনের সারিতে। এমনকী স্কুলের হেডস্যার পর্যন্ত মাঝে মাঝে মনোময়ের বদলে জ্যাকসন ডেকে ফেলেন।

তবে হ্যাঁ, একটা ব্যাপার ঠিক বলেছে জ্যাকসন, এই ফুটবল ম্যাচটা জিততেই হবে। তা হলেই পরপর তিনবার 'টমাস চ্যালেঞ্জ কাপ' উঠে আসবে ওদের নঙ্গী হাই স্কুলে। যদিও একটা রিটার্ন ম্যাচ আছে, সেটাও ওদের, মানে রবিন মেমোরিয়ালের নিজের মাঠে, কিন্তু গত দু'বারই রিটার্ন ম্যাচটা ওরা হেরেছে। আর সঠিকভাবে বলতে গেলে হেরেছে দিয়েগোর কাছেই। এবার, ক্লাস টুয়েলভের দিয়েগোর নঙ্গী হাই স্কুলের হয়ে শেষবার খেলা। কারণ এইচ এস পাশ করলেই তো এখানকার পাঠ শেষ।

দিয়েগো নামটাও ওর নিজের নয়। ওর আসল নাম দয়ারাম আংরে। ওরা মারাঠি। বহুকাল আগে ওদেরই কোনও পূর্বপুরুষ মহারাজা শিবাজির সেনাপতি ছিলেন। সেই বর্গির আমল থেকে ওরা এই

বঙ্গদেশে, ওদের মধ্যে এখন আর মারাঠা দেশের নামগন্ধ নেই। দিয়েগোরা বাংলার জল-মাটির সঙ্গে মিশে সম্পূর্ণ বাঙালি হয়ে গেছে। এমনকী দিয়েগোর মা বাঙালি বাড়ির মেয়ে। বাবা এই ছোট শহরেরই 'বাটা শু কোম্পানি'-তে ম্যানেজার।

তা বলে সেটাই কিন্তু দিয়েগোর একমাত্র পরিচয় নয়। দিয়েগোর আরেকটা পরিচয় আছে। সেটা হল ওর বাঁ পা। যেটা দিয়ে ও অনায়াসে ফুটবল পা থেকে মাথা আর মাথা থেকে পায়ে নাচায়। খুব সহজেই পাঁচ-ছ'জনকে কাটিয়ে ও পৌঁছে যায় বিপক্ষের গোলে। মাঝ মাঠ থেকে আচমকা ড্রপ শটে গোল করে গোলকিপারকে বোকা বানায় যখন তখন। ফুটবল-পাগল বাটানগরের লোকেরা হাঁ হয়ে ওর খেলা দেখে। তাদের মনে পড়ে যায় এরকমই বেঁটেখাটো, ঝাঁকড়া চুলের একজনকে। নিমেষে যিনি ছত্রাখান করে দিতে পারতেন পৃথিবীর যে-কোনও ডিফেন্স। বল পায়ে যিনি ক্রমশ মানুষ থেকে ঈশ্বর হয়ে উঠেছিলেন। দয়ারাম বল নিয়ে এগোয়, তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে বিপক্ষের ডিফেন্স। সমস্ত লোকেরা অবাক হয়ে দেখে, বেঁটে, ঝাঁকড়া চুলের ছেলেটার জাদু। তারা আনন্দে চিৎকার করে ওঠে "দিয়েগো, দিয়েগো।"

দিয়েগো জানে জ্যাকসন পরশুর ম্যাচের কথাটা কেন ওকে বলছে। কারণ ও জানে দিয়েগো ছাড়া গতি নেই। কিন্তু ফুটবল টিম গেম। এভাবে একা কেউ পারে? দিয়েগো বলল, "দুর, কী যে বলিস। আমি একা কী করব? টিম সাপোর্ট না-থাকলে হয়?"

"মাইরি আর কী। '৬০ সালে মারাদোনার টিমে কোনও সাপোর্ট ছিল? মারাদোনা পারলে তুইও পারবি।"

"মামদোবাজি, না? কোথায় মারাদোনা আর কোথায় আমি চারাপোনা! ভাগ।"

"গতবারের ম্যাচটায় তো তুই-ই একা ওদের পুঁতে দিলি। চার গোল! মাইরি, ওদের ক্যাপ্টেন রুদ্রকে দেখে মনে হচ্ছিল কোরামিন দিতে হবে। দ্যাখো বস্ তুমি খেলে দাও, বাকিটুকু আমি দেখে নেব।"

বাকিটুকু যে কী সেটা ঠিক বুঝল না দিয়েগো। কারণ খেলার পর আর

থাকেটা কী? ভাবল জিজ্ঞেস করবে। পারল না। সামনেই গঙ্গার দিক থেকে জোরে হর্ন বাজল একটা। দিয়েগো মুখ ঘুরিয়ে সেদিকে তাকাল। ওরা বসে আছে গঙ্গার পাড়ে। এখন জোয়ার চলছে। ছোটমতো একটা জাহাজ যাচ্ছে, হর্নটা তারই। শেষ বিকেলের আলোয় ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে গোটা দৃশ্যটা। নভেম্বরের প্রথম, অল্প অল্প ঠান্ডা পড়ছে। কুয়াশাও। গঙ্গার ও-পাড়ের ইটখোলার চিমনি থেকে বেরোনো ধোঁয়ায় একটু ঘোলাটে হয়ে আছে চারিদিক। কিন্তু তবু দারুণ দেখাচ্ছে। গঙ্গার পাড়ে এই বিরাট অশ্বত্থ গাছ, সিঁদুর-মাখা হাড়িকাঠ আর সামনের একফালি সবুজ পাড়। এটাই ওদের আড্ডার জায়গা। ওরা বলে গ্যাজনখানা। রোজ প্র্যাকটিস থেকে ওরা এখানে চলে আসে। ওরা মানে দিয়েগো, জ্যাকসন, ডুডু আর কবীর। মাঝে মাঝে অবশ্য আমনও আসে। আমন ওদের এক বছরের জুনিয়ার। ক্লাস ইলেভেনে পড়ে, সায়েন্স নিয়ে।

তবে আজ আর কেউ নেই। শুধু ওরা দু'জন। "কী রে চুপ মেরে গেলি যে? কিছু অভয়বাণী ছাড়, না হলে তো প্রেস্টিজে গ্যামাক্সিন থেকে চোনা সব ডিসকাউন্ট রেটে পড়তে থাকবে।"

জ্যাকসন আবার খোঁচাল।

"ধুর, আমি কী বলব?" দিয়েগো নিস্পৃহ গলায় বলল।

জ্যাকসন লাফিয়ে উঠল, "ন্যাকামি কোরো না, তুমি হচ্ছ বাটানগরের মারাদোনা। তুমি ইচ্ছে করলেই হবে।"

দিয়েগো নিরুপায় গলায় বলল, "চেষ্টা করব।"

"ব্যস, ব্যস ওতেই হবে। তবে পাঁচ গোলের বেশি দিস না। ওদের স্কুলের ছেলেগুলোর হেনস্থা দেখলে মেয়েগুলো খুব কাঁদে। আর তুই তো জানিস মেয়েদের কান্না আমি একদম সহ্য করতে পারি না।"

"কেন?"

"কারণ আমিও তো রামমোহন বিদ্যাসাগরদের উত্তরসূরি, মেয়েদের চোখের জল আমাকে আন্দোলিত করে। বিশেষ করে সুন্দরী মেয়েদের চোখের জল। তাই পাঁচ গোলের বেশি দিস না।"

দিয়েগো হাসল শুধু, জ্যাকসনটা ভুলভালই রয়ে গেল। এত বড় হয়েছে কে বলবে! কিন্তু আর না, সন্ধে হয়ে এসেছে।'ও বলল, "চল, সন্ধে হয়ে এল। শুধু খেলা খেলা করলে হবে, সামনেই টেস্ট পরীক্ষা না?"

গঙ্গার পাড়টা এখন সত্যি বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। ওরা সাইকেল নিয়ে বাঁধের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল। একটু দূরে নড়বড়ে জেটিটা দেখা যাচ্ছে। আগে এখানে জাহাজ থামত। বাটা কোম্পানির মাল আসত সেই জাহাজে। কিন্তু এখন পরিত্যক্ত। সন্ধের পর এখানে যতসব বদ ছেলেদের আড্ডা। জেটির পরেই বাঁধ থেকে রাস্তা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। সেই রাস্তার ডানদিকে শিবমন্দির। আগে মন্দিরটা সুন্দর সাজানো ছিল কিন্তু এখন কেমন যেন রংচটা ভাব সর্বত্র। দেখলেই মন খারাপ হয়ে যায় দিয়েগোর। কিন্তু শিবমন্দিরটা পেরোতে হল না ওদের। আবছা অন্ধকারে দেখল একজন হন্তদন্ত হয়ে ওদের দিকেই আসছে। লোকটার হাঁটা দেখে আর হাতের ঢাউস পাতলা জিনিসটা দেখে দিয়েগো চিনতে পারল। রাধাকাকু। হাতে এক বিশাল ঘুড়ি। বাটানগরের সবাই একে বোঁ ঘুড়ি হিসেবে চেনে। চিনে পট্টির থেকে স্পেশাল অর্ডার দিয়ে বানানো পাঁচ ফুট বাই চার ফুটের প্রজাপতি আকারের ঘুড়ি। যখন এটা ওড়ে, বোঁ শব্দ হয় একটা। আর অনেক দূর থেকে শোনা যায় সেই শব্দ।

রাধাকাকু ছোটখাটো ব্যাবসা করে একটা— জ্যাম, জেলি, আচার, পাঁপড়— এই সবের। কিন্তু সেসবে বিশেষ ওর মন নেই। আসলে লোকটা একদম ঘুড়ি পাগল। বিকেল চারটে বাজলেই নিজের ব্যাবসার দড়ি-দড়া ছিঁড়ে পুজোর মাঠে হাজির হয়। তারপরই ব্যস, বাটানগরের মাথায় বোঁ শব্দে একটা প্রজাপতি ওড়ে। রাধাকাকু জ্যাকসনদের পাশের বাড়িতে থাকে। জ্যাকসনকে নিজের ছেলের মতো ভালবাসে। দিয়েগো জানে তার ঠেলাতেই ও এই সন্ধেয় গঙ্গার ধারে এসেছে। জ্যাকসনটাও যেমন, হয়তো বাড়িতে বলে এসেছে বিকেলের মধ্যে ফিরবে। আর জ্যাকসনদের বাড়িতে থাকার মধ্যে আছে ওর মা। জ্যাকসনের বাবা

জাহাজে চাকরি করে— রেডিয়ো অফিসার। বছরে দু'মাসের জন্য বাড়িতে আসে। ফলে মা সবসময় জ্যাকসনকে নিয়ে চিন্তিত।

ওদের সামনে এসেই রাধাকাকু হাউমাউ করে উঠল, "কী অলপ্পেয়ে ছেলে তুই, পাড়ার মোড়েও যাইনি, বউমা এসে বলল তুই বিকেলে ফিরবি বলে এখনও ফিরিসনি। চল, বাড়িতে চল। তোর দিদা'দাদু এসে বসে আছেন। তোর সঙ্গে দেখা না-করে যেতে পারছেন না। দেখ তো তোর জন্য ঘুড়িটা পর্যন্ত রেখে আসার সময় পাইনি। বাঁদর।"

জ্যাকসন রাধাকাকুর শেষ কথাটার মর্যাদা রাখতেই বোধহয় বাঁদরের মতো মুখ করে হাসল। বলল, "ইস্, ভুলেই গিয়েছিলাম, চলো চলো।" তারপর দিয়েগোর দিকে ফিরে বলল, "তা হলে ওই কথাই রইল, পাঁচের বেশি নয়। মেয়েদের দুঃখটাও তো দেখতে হবে।"

রাধাকাকু দাঁড়িয়ে পড়ল, "ও! পরশু তোমাদের রবিন মেমোরিয়ালের সঙ্গে খেলা, না? দিয়ো তো ওই স্কুলটাকে হারিয়ে। ওই রবিন মেমোরিয়ালের ন্যাংলাপ্যাংলাগুলো সব এক-একটা ক্ষুদ্র শয়তান। আমাকে বলে কিনা 'আধা কাকু আধা কাকিমা'। দিয়ো তো বেশ করে হারিয়ে। আমাদের স্কুলের ইজ্জত তোমার হাতে। মানে ইয়ে, পায়ে।"

দিয়েগো জানে রাধাকাকু নঙ্গী হাই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। দিয়েগো মনে মনে হাসল— কী ভাবে এরা? ও একা জেতাতে পারে নাকি? অবশ্য আগের ম্যাচগুলোর ফলাফল দেখলে সবার এটা মনে হবেই। কারণ বাস্তবিকই দিয়েগোর কাছেই রবিন মেমোরিয়াল হেরেছে, নঙ্গী হাই স্কুলের কাছে নয়।

রাধাকাকু আর জ্যাকসন চলে গেল। অঞ্চলটা একদম ফাঁকা হয়ে গেছে এখন। দূরে টিমটিম করছে বাটা অ্যাবজলমেন্ট কোয়ার্টারের আলো। দোতলা কোয়ার্টারগুলোকে কেমন ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। তার সামনের বিশাল বড় বড় দুটো মাঠকে দেখে তেপান্তরের মাঠ বলে মনে হল দিয়েগোর। বিকেলে খেলা হলেও, এই মাঠগুলোতে একটু সন্ধের পর থেকেই জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়েরা এসে বসতে শুরু করে। মাঠের সামনের রাস্তায় আলো নেই। আসলে ওগুলো যতবারই লাগানো

হয় ততবারই কারা যেন আলোগুলো ভেঙে দিয়ে যায়। আলোয় অসুবিধে হয় যে! একবার হাতঘড়িটা দেখল দিয়েগো, ওরে বাবা আর সময় নষ্ট করা যাবে না। ও সাইকেলে উঠে পড়ল। বাড়ি গিয়ে অ্যাকাউন্টেন্সি নিয়ে বসতে হবে। সায়েন্স কঠিন বলে মাধ্যমিকের পরে কমার্স নিয়েছিল ও। এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে যে এও খুব কঠিন ঠাঁই। বিশেষ করে অ্যাকাউন্টেন্সি। ওঃ কবে যে এইচ এস-এটা শেষ হবে! এ ছাড়াও মায়ের শরীরটাও খারাপ। বাড়ির বাইরে বেশিক্ষণ থাকতে মন চায় না ওর।

শিব মন্দিরের রাস্তার থেকে বাঁদিকে বাঁক নিল দিয়েগো। পরিষ্কার পিচ করা রাস্তা, ফাঁকা। দু'দিকে ছাতিম, গুলমোহর আর রেনট্রির সারি। যদিও এখন পাতাঝরা, তবু খুব সুন্দর।

সামনেই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। দিয়েগো দেখল তার কাছে এক দঙ্গল ছেলে দাঁড়িয়ে। মার্কারি ভেপার ল্যাম্পের আলোয় দিয়েগো চিনতে পারল ওদের। রবিন মেমোরিয়ালের ছেলেরা। ওরা প্র্যাকটিস শেষ করে ফিরছে। সবারই কাঁধে কিট ব্যাগ, গায়ে জার্সি। পরশুর ম্যাচের জন্য ওরাও নিশ্চয়ই খুব খাটছে। দিয়েগো জানে সহজে ছেড়ে দেবে না ওরা। কারণ ওরাও জানে এইবার নঙ্গী হাই যদি জিতে যায়, কাপটা নঙ্গী হাই-এর হয়ে যাবে চিরদিনের মতো। আর ওরাও জানে নঙ্গী হাই-এর একমাত্র অ্যাডভান্টেজ হল দিয়েগো। তাই ওর ওপর ওদের একটা চাপা আক্রোশও আছে যেন। সুযোগ পেলেই ওরা দিয়েগোকে হেনস্থা করে। দিয়েগো জানে এখনও ওকে দেখলে ওরা 'কী গো', 'হ্যাঁ গো', 'ও গো' বলে আওয়াজ দেবে। দিয়েগো সাইকেলের স্পিড বাড়াল। ফালতু ঝামেলা ভাল লাগে না। কিন্তু ওদের পাশ কাটিয়ে বেরোতে পারল না। আওয়াজটা এল। তবে অন্যভাবে। ভিড় থেকে একটা চিৎকার উঠল, "দিয়েগো, অ্যাই দিয়েগো, দাঁড়া কথা আছে।" রুদ্র। গলা শুনেই দিয়েগো বুঝেছে। বাধ্য হয়ে সাইকেল থামাল ও। দেখা যাক কী ব্যাপার।

রুদ্র রবিন মেমোরিয়ালের ক্যাপ্টেন। লম্বা, ছিপছিপে চেহারা, আর

দেখতেও খুব সুন্দর। সবসময়ই একটা ঘ্যাম নিয়ে চলে ও। ওর বাবা বিদেশি এক ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, মা ইনকাম ট্যাক্সের উকিল। বাড়ির অবস্থা খুব ভাল। এর ওপর রুদ্র নিজেও পড়াশুনোতে খুব ভাল। বিশেষ করে অ্যাকাউন্টেন্সিতে দারুণ। টিউশনে এক ব্যাচেই পড়ে ওরা।

দিয়েগো সাইকেল থামাতেই রুদ্র ওদের দঙ্গলটার থেকে বেরিয়ে এল। তারপর দিয়েগোকে বলল, "চল কোথাও বসি, একটু কথা আছে।"

দিয়েগো সামান্য আপত্তি জানাল, "না রে আজ সময় নেই। বাড়িতে গিয়ে অ্যাকাউন্টেন্সি নিয়ে বসতে হবে। আর মাসখানেক বাকি আছে টেস্টের।"

"ধুর ছাড় তো। কোন চ্যাপ্টারটা সমস্যা হচ্ছে বলিস দেখিয়ে দেব।" রুদ্র কনফিডেন্টলি বলল। এভাবে বললে আর ও কী করবে? অগত্যা রাজি হল দিয়েগো।

কাছেই পিৎজার নতুন একটা দোকান খুলেছে। 'নিউল্যান্ড ক্যাফে'। ঝাঁ চকচকে সাইন বোর্ড তার। ভেতরে উর্দি পরা ওয়েটার, হালকা সুরে মিউজিক বাজে। চারিদিকে আয়না লাগানো দেওয়াল। কেমন যেন পার্ক স্ট্রিটের কোনও দোকান মনে হয়। সত্যি বলতে কী এই দোকানটায় ঢুকতেই কেমন কমপ্লেক্সে ভোগে দিয়েগো। কলকাতা থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে এই ছোট্ট বাটানগর। শহর তাই দ্রুত ছুঁয়ে ফেলেছে তাকে।

দুটো চিকেন পিৎজার অর্ডার দিল রুদ্র। দিয়েগো বুঝল না কী এমন দরকার পড়ল রুদ্রর যে এত কস্টলি দোকানে ঢুকিয়ে জামাই আদর করছে! রুদ্রই প্রথমে মুখ খুলল, "তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হয়েছে, না হলে রাতে তোর বাড়িতে যেতাম।"

"আমার বাড়িতে? কেন?" দিয়েগো খুব অবাক হল। রুদ্রর সঙ্গে ওর তেমন বন্ধুত্ব নেই যে রুদ্র ওর বাড়িতে যাবে। তা ছাড়া দিয়েগো চায় না ওর বাড়িতে কেউ যাক। বিশেষ করে এখন। কারণ একটা

গুরুতর সমস্যা শুরু হয়েছে ওর জীবনে, ও চায় না কেউ সেটা জানুক।

রুদ্র এক চুমুক জল খেয়ে বলল, "একটা ছোট্ট প্রস্তাব আছে আমার। বিজনেস ডিলও বলতে পারিস। গিভ অ্যান্ড টেক।"

"মানে, কী বলতে চাইছিস তুই?"

পিৎজা এসে গেছে। রুদ্র এক কামড় দিয়ে শুরু করল, "আগে বল রুপাইকে তোর কেমন লাগে?"

ধক করে উঠল দিয়েগোর বুক। রুদ্র জানল কী করে? কারও তো জানার কথা নয়। "কী রে চুপ করে গেলি কেন? বল, রুপাইকে কেমন লাগে তোর?"

"কেমন আবার ওই ঠিক আছে।" আমতা আমতা করে উত্তর দিল দিয়েগো।

"ঠিক আছে? শুধুই ঠিক আছে? হুঃ আমি কিছু বুঝি না, না? কোচিংয়ে হাঁ করে তো শুধু রুপাইকেই দেখিস। শোন, যদি সত্যি কথা বলিস তা হলে একটা উপায় বের করি।" বলে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে চোখ টিপল রুদ্র।

দিয়েগো বিষম খেল। চিকেন পিৎজার মুরগি যেন পেটের মধ্যে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। কারণ কথাটা সত্যি। ওর অ্যাকাউন্টেন্সি অর্ধেক মাথায় ঢোকে না রুপাইয়ের জন্যই। ওরা একসঙ্গেই তাপস স্যারের কোচিংয়ে পড়ে। স্যার পড়ানও খুব ভাল। কিন্তু রুপাইকে দেখলেই সব গুলিয়ে যায় ওর। সেই ক্লাস ইলেভেনে যেদিন প্রথম দেখেছিল রুপাইকে সেদিনই বুঝেছিল দিয়েগো যে হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্টের বারোটা বাজল। এরকম মেয়ের সামনে বসে পড়া যায় নাকি? কোচিংয়ে সবার সঙ্গে কথা বলে দিয়েগো কিন্তু এই বছরখানেকের বেশি হয়ে গেলেও রুপাইয়ের সামনে বিশেষ কথা বলতে পারে না ও। কে যেন ওর মুখের মধ্যে ব্লটিং পেপার ঢুকিয়ে দেয়। একবার রুপাই ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, "ক'টা বাজে?" ঘাবড়ে গিয়ে দিয়েগো বলে ফেলেছিল, "খুব বাজে, ভীষণ বাজে।" রুপাই এমন অবাক হয়ে গিয়েছিল যে আর প্রশ্ন করতে ভরসা পায়নি। দিয়েগো মাঝে মাঝে ভাবে ও কি কোনওদিন রুপাইকে বলতে

পারবে না নিজের কথা? দিয়েগোর কথা নয়, দয়ারাম আংরের কথা?

"কী রে ভ্যাবলা মেরে গেলি যে? বল রুপাইকে তোর পছন্দ কিনা?" রুদ্র সামান্য হেসে আবার জিজ্ঞেস করল।

দিয়েগো মিয়ানো গলায় বলল, "হলেই বা কী হয়েছে? ও যদি বেল হয় তো আমি ঠোঁট ভাঙা কাক।"

"বা বা, দিয়েগো থেকে যে নেরুদা হয়ে উঠলি রে! হুম, মানে প্রেমে পড়েছিস! কী ঠিক না?" রুদ্রর কথায় দিয়েগো চুপ করে মাথা নাড়ল শুধু। রুদ্র আবার হাসল, বলল, "তোর সমস্যা হল তুই প্রপোজ করতে পারছিস না, রাইট?"

"হ্যাঁ, ঠিক।"

"আমি একটা উপায় বের করতে পারি, তবে..."

"কী বল না, বল।" দিয়েগো উৎসাহিত হয়ে উঠল। অবশ্য ইচ্ছে করলে রুদ্র উপায় বের করতেই পারে। রুপাই রবিন মেমোরিয়ালে রুদ্রর সঙ্গেই পড়ে। তা ছাড়া কোচিং থেকে প্রায় রোজই একসঙ্গে বাড়ি ফেরে। এক পাড়াতেই বাড়ি যে।

"শোন দিয়েগো, আমি রুপাইয়ের সঙ্গে তোকে ফিট করে দিতে পারি, কিন্তু আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে। সেটা তোকে রাখতে হবে।" রুদ্র হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে গেল।

"কী রিকোয়েস্ট?" দিয়েগো অবাক।

"পরশুর ম্যাচটা তোকে ছাড়তে হবে।" শান্ত গলায় বলল রুদ্র।

"মানে?" থতমত খেয়ে গেল দিয়েগো। বলে কী ছেলেটা? ম্যাচ ছাড়তে হবে? এ যে ম্যাচ ফিক্সিং! বিশ্বাসঘাতকতা! এ সম্ভব নাকি? দিয়েগো বলল, "কী যা তা বলছিস? ইয়ারকি মারিস না।"

"না, ইয়ারকি মারছি না তো। শোন, পরশুর ম্যাচটা ছাড় আর ব্যস রুপাই তোর। আমি খুব বেশি কিছু চাইছি না। তুই শুধু গোলে বল না-মেরে বাইরে মারবি। কাউকে বিশেষ কাটাবি টাটাবি না। আর দেখিস যদি আমরা গোল করতে পারছি না, তুই টুক করে একটা সেম সাইড গোল করে দিবি। কেমন?"

দিয়েগোর মাথা বোঁ বোঁ করছে। বলে কী ছেলেটা? পাগল নাকি? রুদ্র আবার বলল, "দেখ, তুই তো জানিস এই ম্যাচটার গুরুত্ব কতটা। আমার ক্যাপটেন্সিতে এবার আমি কাপটা জিততে চাই।"

দিয়েগো চোয়াল শক্ত করে দাঁত চেপে বলল, "আর যদি আমি রাজি না হই?"

রুদ্র হাসল, "তা হলে আমি রুপাইকে গিয়ে বলব যে দিয়েগো একটা খারাপ ছেলে। তোর দিকে দিয়েগোর কুনজর আছে। যে-কোনওদিন বড় রকমের কোনও ক্ষতিও করে দিতে পারে। সিম্পল।"

দিয়েগো চুপ করে গেল। মুখ লাল। রুদ্র এখনও হাসছে, বলল, "থিঙ্ক ওভার ইট মারাদোনা। আমার প্রস্তাবে রাজি হলে রাজকন্যা তোর। মাত্র নব্বইটা তো মিনিট। খেলার পরে একটু গালাগালি খাবি, এই তো। তারপর সবাই ভুলে যাবে। আরে সবাই ভুলে যায়। কেউ সারাজীবন এসব মনে রাখে নাকি? বল এখন তোর কোর্টে। ভেবে দেখ কী করবি।"

২

কুশকে দোকানের সামনে মোটরবাইক স্ট্যান্ড করতে দেখল পুরু। ওর সাতটায় আসার কথা, এখন সওয়া আটটা বাজে। পুরু ভেবেছিল সাড়ে সাতটার মধ্যে কথা সেরে ছাত্রের বাড়ি যাবে পড়াতে। কোথায় কী! কুশটা যা তা। আজ পড়ানোটাই মাটি হল। ছাত্রের মা ভাল হলেও ছাত্রের বাবাটা এক পিস জিনিস। একদিন না-গেলেই খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে। হাজার কারণ জানতে চায়। এ-মাসের মাইনেটাও দিতে ঠিক ঝোলাবে।

এসব ভাবতে ভাবতেই কুশ দোকানে ঢুকল। দোকানটা হল 'চক্রবর্তী টি স্টল'। বাটানগরের কফি হাউস। সন্ধে হতে-না-হতেই রাজত্বের লোক এসে হাজির হয় এখানে। কেউ সচিন তেন্ডুলকরকে ব্যাট করতে শেখায়, কেউ সানিয়া মির্জার স্কার্টের ঝুল আর একটু কমিয়ে দিতে চায়, কেউ আবার বিশ্ব রাজনীতিতে নেতারা কোথায় কোন ভুল

করছে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এখানের সবাই সব বোঝে।

কোণের দিকে একটা বেঞ্চে বসে ছিল পুরু। ওর সামনে এসে ধপ করে বসল কুশ। পুরু বেজার মুখে বলল, "এই তোর সাতটা? ফালতু টিউশনটা মিস করলাম। জানিস তো ছাত্রের বাবাটা কেমন বিষাক্ত টাইপের।"

কুশ পাত্তাই দিল না, "ছাড় তো। কিচ্ছু হবে না। টিউশন করে কেউ বড়লোক হয় না। তা ছাড়া ছাত্রের মা তো তোর ফেভারে। ওই কাল গিয়ে একটু চুমু খেয়ে নিবি সব সাইজ হয়ে যাবে। আরে আমার লেট হয়ে গেল একটু মাপামাপি করতে গিয়ে।"

"মাপামাপি? মানে?" পুরু অবাক।

"ওই 'স্টাডি এড' কোচিং সেন্টারে একটা ব্যাচ শেষ হল তাই মেয়েগুলোকে দেখব বলে অপেক্ষা করছিলাম। ওফ্, যা সব মেয়ে আছে না, ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। এত ভাল ভাল পিস কাদের বাড়িতে যাবে রে? কোন রেশনের চাল খায় এরা? এর মধ্যে বিশেষ করে একটা মেয়ে আছে, মাইরি ওর জন্য যুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু মেয়েটা কিছুতেই আমায় পাত্তা দেয় না, কেন বল তো?"

পুরু হাসল। একবার মণি বলে একটা মেয়েকে পছন্দ হয়েছিল কুশের। মেয়েটা ওকে একদম পাত্তা দিত না। কুশ একদিন সোজা মণির বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। মণির মা দরজা খুলেছিল। কুশ পকেট থেকে একজোড়া সোনার চুড়ি বের করে বলেছিল, "মাসিমা, এই চুড়িদুটো আমার মা আপনার মেয়ের জন্য পাঠিয়েছে। আপনার মেয়ে খালি হাতে রাস্তায় বেরোয়। আমার একদম ভাল লাগে না। আরে আমারও তো একটা প্রেস্টিজ আছে নাকি।" মণির মা এত আশ্চর্য হয়েছিল যে কুশকে থাপ্পড় না মেরে উলটে জিজ্ঞেস করল, "তোমার প্রেস্টিজ মানে?'

"বা রে, আফটার অল আমার বউ হবে তো।" নির্ভয়ে জবাব দিয়েছিল কুশ। সেদিন খুব জোর ধোলাই খেত ও। স্রেফ মোটরবাইকটা ছিল বলে বেঁচে গিয়েছিল।

আরেকবারও অন্য একটা মেয়েকে সরাসরি প্রপোজ করতে গিয়ে

কুশ বলেছিল, "তোমার মতো এত সুন্দর বুক আমি আর কারও দেখিনি।" সেবার অবশ্য থাপ্পড়টা মিস হয়নি। পরে জিজ্ঞেস করাতে কুশ বলেছিল, "না রে বুকটা বলতে চাইনি। বলতে চেয়েছিলাম ওর সুন্দর মুখটা দেখলে আমার বুকটা কেমন করে। কিন্তু টেনশনে সব মিলেমিশে কেমন গুবলেট হয়ে গেল।"

সেই কুশ এখন বসে আছে পুরুর সামনে। লেট করে এসেছে বলে তো কোনও অনুশোচনাই নেই বরং দাঁত দেখাচ্ছে। পুরু বলল, "বাদ দে ওসব। কাকু কিছু করতে পারলেন?"

কুশের হাসিখুশি মুখটা হঠাৎ দপ্‌ করে নিভে গেল। পুরু বুঝল ব্যাপারটা। কুশ বলল, "না রে হয়নি। বাবা বলল ওরা অন্য আরেকজনকে নিয়ে নিয়েছে। বাবার বসের এক ক্যান্ডিডেট। জানিসই তো সব জায়গায় চূড়ান্ত দলবাজি।"

দোকানের ভিতরটা হঠাৎ খুব গুমোট লাগতে শুরু করল পুরুর। সারা পৃথিবীটা আলেকজেন্ডারে ভরে গেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, ও একাই পুরু। সবসময় হারে। কুশের বাবা একটা বড় সফটওয়্যার কোম্পানির অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার। ওঁদের ওখানে একজন ডেটা এন্ট্রির লোক দরকার ছিল। পুরুর কম্পিউটারে ডিপ্লোমা আছে। ও বলেছিল কুশের বাবাকে। কিন্তু হল না। এই চব্বিশ বছর বয়সে এসে পুরু বোঝে যে একটা গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি আর একটা কম্পিউটার ডিপ্লোমা দিয়ে কোনও যুদ্ধই জয় হবে না। কিন্তু হত না কি? ওর যা অস্ত্র ছিল তাতে হয়তো হত। যদি না সেই দুর্ঘটনাটা ঘটত।

তখন সদ্য কলেজ পাশ করেছে পুরু। কলকাতায় একটা 'এ' ডিভিশন ক্লাবের হয়ে ফুটবল খেলে। আর বেশ ভাল খেলে। ময়দানের বড় ক্লাবগুলোও তখন নজর রাখছে ওর ওপর। সবাই বলছে ফুটবলার হিসেবে ওর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বাড়িতে অভাব চিরকাল ছিল। বাবা বাটা কোম্পানির ওয়ার্কার। দুই দিদি। মা হাঁপানির রুগি। মানে একদম বাংলা সিনেমার গল্পের মতো জীবন। বাড়িতে নিত্য অশান্তি বাঁধা। পুরু বুঝত একটা চাকরি ওকে পেতেই হবে। আর এইসবের মধ্যে ওর আনন্দ, ওর

জীবন বলতে ছিল সবুজ মাঠ আর একটা ফুটবল। খেলতে খেলতে প্রায় সবকিছু ভুলে যেত ও।

সেরকমই একসময় রেলওয়েজের একটা ট্রায়াল ম্যাচ ছিল। পাশ মানেই রেলের চাকরি। পুরুদের কোচ অলোকদা বলেছিলেন, "তুই একরকম সিলেক্ট হয়েই আছিস। ম্যাচটায় শুধু তোর স্বাভাবিক খেলা খেল। ব্যস, সেটাই এনাফ।" দারুণ আনন্দ হয়েছিল পুরুর। ভেবেছিল বাবার খোঁটা আর দিনরাত বাড়ির অশান্তি থেকে রেহাই পাবে এবার। তাই কি সেদিন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল? স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে সাইকেল করে বাড়ি ফিরছিল পুরু। তখন বেশ রাত। রাস্তা ফাঁকা। ঝড়ের বেগে সাইকেল চালাচ্ছিল ও। মাথার ভিতর শুধু ম্যাচের চিন্তা। তাই কি হর্নটা শুনতে পায়নি? যখন বুঝেছিল যে গাড়িটা একদম পেছনে চলে এসেছে, তখন আর কোনও উপায় ছিল না। গাড়িটা সাইকেলের পিছনে মেরেছিল। অনেকটা দূরে ছিটকে পড়েছিল পুরু। জ্ঞান হারাবার ঠিক আগের মুহূর্তে পুরুর মনে পড়েছিল যে কালকের ম্যাচটা আর খেলা হবে না ওর। আসলে আর কোনও দিনই ফুটবল খেলা হয়নি পুরুর। শরীর থেকে প্রচুর রক্ত বেরিয়ে গিয়েছিল। পুরুর রক্তের গ্রুপটাও একটু রেয়ার। এবি নেগেটিভ। খবর পেয়ে অলোকদা এসেছিলেন। অলোকদার রক্তের গ্রুপও এবি নেগেটিভ। অলোকদার রক্ত পেয়েছিল বলেই বোধহয় প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল পুরু। ভাঙা হাঁটু সারতে অনেক সময় লেগেছিল। কিছুটা দৌড়োলে এখনও হাঁটুতে ব্যথা হয়। মনে হয় মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যাবে। তাই সবসময় 'নি ক্যাপ' পরে থাকতে হয় ওকে। তার ফলে সাইকেলটা অন্তত চালাতে পারে।

"কী হল রে অত ডাউন হয়ে গেলি কেন?" কুশ খোঁচাল। সংবিৎ ফিরল পুরুর, "না কিছু না, এমনি।"

"শোন, মনখারাপ করিস না। তোর জন্য অন্য একটা খবর আছে। দেখ সেটায় যদি কোনও কাজ দেয়।" কথাটা বলে কুশ এবার একটু হাসল যেন।

পুরু তেমন উৎসাহ পাচ্ছিল না। তবু জিজ্ঞেস করল, "কী খবর?"

"বলব, আগে দুটো চা বলি।" কুশ চেঁচিয়ে দুটো লেবু চা দিতে বলল। তারপর পুরুর দিকে ফিরে শুরু করল, "তুই জানিস তো যে আমার জেঠু নঙ্গী স্কুলের সেক্রেটারি। বাবা তোর কথা জেঠুকে বলেছে। মানে, তুই যে ভাল প্লেয়ার ছিলি সেটাই আর কী। নঙ্গী স্কুলে গেমস টিচারের পোস্টটা খালি আছে। জেঠু আজ একবার তোকে নিয়ে যেতে বলেছে। চল আমার সঙ্গে। দেরি করা ঠিক হবে না।"

পুরু একটা আশার আলো দেখল যেন। তারপর ভাবল ওর যা কপাল! ও জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু ওদের এস এস সি পরীক্ষা নেই?"

"ধুর, প্রাইভেট স্কুল তো। ওরা ডাইরেক্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়।" কুশ আশ্বস্ত করল।

"কিন্তু হবে কি?" পুরু মাথা নিচু করে বসে রইল।

"ডোন্ট বি সো পেসিমিস্টিক। চা-টা শেষ করে তাড়াতাড়ি চল।" কুশ এবার একটু ধমক দিল।

ওরা দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ল। কুশের মোটরবাইকেই যাবে। পুরু দোকানের পাশে ওর সাইকেলটা রেখে গেল। দোকানের আশুদা ঠিক দেখবে। ওরা বাইকে উঠতে যাবে, ঠিক তখনই এক বিপত্তি। পেছন থেকে একটা গলা এল, "এই যে কেষ্ট ঠাকুর একটু দাঁড়াও।" ওরা মুখ ফিরিয়ে দেখল রাধাকাকু।

মুখটা গম্ভীর হয়ে আছে রাধাকাকুর। কী ব্যাপার কে জানে। ছোটবেলা থেকেই রাধাকাকুকে চেনে পুরু— অবশ্য রাধাকাকুকে কে না চেনে? ছেলে থেকে বুড়ো সবার কাছে রাধাকাকু পরিচিত মুখ। কিন্তু আজ মুখটা গোমড়া কেন? পুরু জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে রাধাকাকু?" রাধাকাকু পুরুকে পাত্তাই দিল না। গম্ভীরভাবে কুশকে প্রশ্ন করল, "তুই খুব লায়েক হয়েছিস, না? আমার মেয়ের পেছনে খুব ঘুরছিস? আমাদের বাড়ির ঝি-টা বলছিল ও তোদের একসঙ্গে নিউল্যান্ড মাঠে দেখেছে। অন্ধকারে তোরা বসে কী করছিলি?"

কুশ এমন মুখ করল যেন আকাশ থেকে পড়ছে, "কী বললে? কে বলেছে? তোমাদের ঝি? ছি ছি রাধাকাকু তুমি ঝিয়ের কথায় নাচো?

আর তোমার মেয়েকে কি তুমি অন্ধকারে বসে থাকার শিক্ষা দিয়েছ?"

রাধাকাকু থতমত খেল, "তার মানে তুই বলতে চাস ঝি-টা ভুল দেখেছে?"

"দুশো পারসেন্ট। আরে আমার আলোতে বসারই সময় নেই তো অন্ধকারে বসব! সত্যি, তোমরা যে কী না! তবে ভালই হল তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে।"

"কেন?" রাধাকাকুর এখনও সংশয় কাটেনি।

"কারণ ঘুড়ি।"

"ঘুড়ি!" রাধাকাকুর মুখে পৌনে এক হাসি।

"বাবা এবার তাইওয়ান যাচ্ছে, ভাবছিলাম তোমার জন্য ফোল্ডিং ঘুড়ি আনতে বলব কিনা? বেশ বড়, পাখির মতো দেখতে। প্যারাসুট কাপড়ের ঘুড়ি।"

রাধাকাকু আর পারল না। সব ভুলে, গলে জল হয়ে টোপটা গিলল, "বা বা, বেশ বেশ, তাই বলিস। আমিও তোদের কাকিমাকে বলছিলাম যে ঝি-টা ভুল দেখেছে। তা বাবা কবে যাচ্ছেন?"

কুশ বলল, "সামনের মাসে।"

"সামনের মাসে?" দেরি আছে বুঝে রাধাকাকু আবার সলিড ফর্মে ফিরে এল।

"তো? ডিসেম্বরেই আসবে ঘুড়ি।" যেন দু'বছরের বাচ্চাকে স্তোক দিচ্ছে এমনভাবে বলল কুশ। তারপর আর সময় নষ্ট করল না। বলল, "আজ আসি কেমন? পরে কথা হবে।"

রাধাকাকু একা রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজের মনে হাসতে লাগল। পুরু বুঝল এই সন্ধেবেলা রাধাকাকু মনে মনে ঘুড়ি ওড়াতে শুরু করেছে। লাল টকটকে পাখির মতো একটা ঘুড়ি।

মোটরবাইকে যেতে যেতে পুরু জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁরে কুশ, রাধাকাকুর মেয়ের সঙ্গে তুই সত্যি নিউল্যান্ডের অন্ধকারে বসেছিলি?"

"হ্যাঁ। ওরকম মেয়ের সঙ্গে কক্ষনও আলোয় বসতে নেই। রাধাকাকুর মতো আতার তো সমাজে ওই একটাই কন্ট্রিবিউশন, ঝংকার টাইপের

একটা মেয়ে। ভাল করে লক্ষ করে দেখবি ড্রিউ ব্যারিমোর, প্রীতি জিনটা আর ডেমি মুরের ককটেল একটা। যে খাবে নেশা হয়ে যাবে। আর যা চুমু খায় না, মনে হয় ঠোঁটদুটো ছিঁড়ে বাড়িতে নিয়ে আসি।"

"যাক তবে তুইও প্রেমে পড়লি!"

"তুইও আরেক পিস আতা। প্রেমে পড়তে যাব কেন? তবে গায়ে পড়েছি বলতে পারিস।" কুশ হ্যা হ্যা করে হাসছে। পুরু আর বেশি ঘাঁটাল না। নন-ভেজ গন্ধটা ভালই পাচ্ছে।

পুরু কি এরকম পারত? প্রচণ্ড বৃষ্টির দিনে একবার একজন ওকে বলেছিল চুমু খেতে। পুরু তখন কলেজে পড়ে। মেয়েটার নাম ছিল তমালী। ভারী চটপটে মেয়ে। হইহই করে গান গায়, খলখল করে কথা বলে। কে জানে কেন, প্রথম থেকেই ও পুরুকে পছন্দ করত। অত লাউড মেয়ে পুরুর ভাল লাগত না। কিন্তু স্বভাব মুখচোরা বলে কিছু বলতেও পারত না। আসলে ওর ভাল লাগত সুনেত্রাকে। ফরসা ছিপছিপে ভারী মিষ্টি মুখের মেয়ে ছিল সুনেত্রা। পুরু কোনওদিন তেমন বলিয়ে কইয়ে নয়। ফলে সুনেত্রাকে কিছু বলতে পারেনি। পুরু শুধু তাকিয়ে থাকত। সুনেত্রা মাঝে মাঝে তাকাত, হাসত। ব্যস ওটুকুই। এদিকে তমালী পুরুকে নিজের সম্পত্তি মনে করত। পুরুর চুলটা হয়তো কপালে এসে পড়েছে অমনি তমালী বড় বড় চোখ করে বলত, "কপাল থেকে চুলটা সরা।" কখনও আবার বলত, "কী সব জামা পরে আসিস? একদম জংলির মতো লাগে।" আবার নিজের টিফিন থেকে জোর করে খাওয়াতও ওকে। এরকমই চলত। পুরু একদম কাঁটা হয়ে থাকত সবসময়।

তারপর একদিন ঘটনাটা ঘটল। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে সেদিন কলকাতা প্রায় অচল। পুরুরা কয়েকজন আটকে পড়েছে কলেজে। বাকিরা কমনরুমে থাকলেও তমালী পুরুকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল একটা ফাঁকা ক্লাসরুমে। কী ব্যাপার? পুরু আশ্চর্য হয়েছিল। তমালী বলেছিল, "দেখ তো আমার কাঁধটাতে কী কামড়েছে?" বলেই বড় গলার গেঞ্জিটা একটানে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়েছিল ও। ফরসা কাঁধের ওপর কালো

স্ট্র্যাপ। পুরুর দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বলেছিল, "কই কিছু না তো।" "ভাল করে দেখ।" তমালী পুরুর মাথাটা টেনে নিয়েছিল কাঁধের ওপর। ওর নাকের সামনে দারুণ ফরসা একটা কাঁধ, তার ওপরে কেটে বসা একটা কালো স্ট্র্যাপ। কী সুন্দর গন্ধ আসছে! হঠাৎ শরীর ঘুরিয়ে পুরুর মুখটাকে বুকে চেপে ধরেছিল তমালী। ফিসফিস করে বলেছিল, "কিস মি, পুরু, কিস মি হার্ড।" থতমত খেয়ে গিয়েছিল পুরু। দমবন্ধ হয়ে আসছিল ওর। ততক্ষণে পুরুর মুখটা দু'হাতে তুলে ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়েছে তমালী। ভেজা, মিন্টের গন্ধ, অল্প কামড়, সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছিল পুরুর। কিছু পরে ঠোঁট তুলে নিয়েছিল তমালী, বলেছিল, "যা আজ থেকে তুই আর আমার নোস। তোকে দেখলাম। বড্ড বোকা বোকা রকম ভাল তুই। ভাল আর ইনএফিশিয়েন্ট। চুমুটাও খেতে পারিস না।" গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল তমালী। আর তখনই দূরের জানলায় চোখ পড়াতে কেঁপে উঠেছিল পুরু। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সুনেত্রা একদৃষ্টে ওর দিকেই তাকিয়ে। পুরুর ঠোঁটের চিনচিনে ব্যথাটা নেমে এসেছিল বুকে। কিন্তু সর্বনাশ যা হবার হয়ে গিয়েছিল। সুনেত্রা আর কোনওদিন ওর দিকে তাকিয়ে হাসেনি। সেটুকু আজও মনের মধ্যে খচখচ করে পুরুর। সুনেত্রার সঙ্গে তো ওর কোনও সম্পর্ক ছিল না, তবু কেন যে খারাপ লাগাটা আজও মনে লেগে আছে পুরু বুঝতে পারে না। অবশ্য কতটুকুই বা ও বুঝতে পারে?

আজ মোটরবাইকের পেছনে বসে সেইসব কথাই মনে পড়ে গেল পুরুর। কুশের মতো কেন যে হতে পারল না ও!

কুশদের জ্যাঠার বাড়িটা বিশাল বড়। বাড়ির ভেতরে একটা ছোটখাটো মাঠ আছে, এমনকী শান-বাঁধানো পুকুরও আছে একটা। তা ছাড়া বাগানটাও খুব সুন্দর। পুরু বহুবার এই বাড়ির সামনে দিয়ে গেছে। কিন্তু বড় লোহার গেট পেরিয়ে এই প্রথম বাড়ির মধ্যে ঢুকল। কুশ বলল, "জেঠু একটু মুডি মানুষ, ভুলভাল কথা বললে কিছু মনে করিস না। যতটা পারবি উত্তর দিবি। ঘাবড়াবি না। জানবি মানুষ হিসেবে কিন্তু খুব ভাল।"

"সে কী রে! ইন্টারভিউ নাকি?" রকমসকম দেখে পুরুর জিভ শুকিয়ে গেছে।

"ঘাবড়াচ্ছিস কেন? যা প্রশ্ন করবে জাস্ট উত্তর দিবি।" কুশ পুরুকে আশ্বস্ত করল।

বাড়ির ভিতরটা আরও সুন্দর। দাবার ছকের মতো মেঝে, রোজ উডের গ্র্যান্ড পিয়ানো, কালো কাঠের ঠাকুরদাদা ঘড়ি। পুরুর হাঁটু কাঁপতে লাগল। ভাবল এ কোথায় এসে পড়ল রে বাবা। বাটানগরে এরকম বাড়ি থাকতে পারে? কুশের জ্যাঠা ড্রইং রুমেই ছিলেন। পুরু বুঝল, ওদেরই অপেক্ষা করছিলেন।

"এই তোর ক্যান্ডিডেট?" কুশের জ্যাঠা প্রাণবল্লভ মিত্রর গলায় যেন গোটা সুন্দরবনটাই ডেকে উঠল। গলার আওয়াজের সঙ্গে মানানসই চেহারা। যেমন লম্বা তেমন চওড়া। অর্থাৎ, শুধু গলার স্বরটাই বাঘের মতো নয়, চেহারাটাও সমস্ত বাঘের সাত দিনের খাবার। এরকম বাঘ ভল্লুক টাইপের লোকের সামনে পুরু দেখল কুশও নার্ভাস হয়ে পড়েছে। পুরু বুঝল জ্যাঠা মানুষটা কড়া ধাতের। "কী নাম তোমার?" এবার বাঘ ডাকল পুরুর উদ্দেশে। পুরু নাম বলল। "কী নাম বললে, পুরু? তা, তুমি আমার থেকে কেমন ব্যবহার আশা করো পুরু?" প্রশ্নটা করেই হা হা করে হেসে উঠলেন তিনি। খুব মজা পেয়েছেন। পুরু আরেকটু হলেই নার্ভাস হয়ে হিস্ট্রির উত্তরমতো বলতে যাচ্ছিল 'রাজার প্রতি রাজার মতো', কিন্তু তা না-বলে আমতা আমতা করে চুপ করে গেল। জ্যাঠা আবার চিৎকার দিলেন, "শুনেছি ভাল ফুটবল খেলতে। চোট পেয়ে আর খেলতে পারোনি? ছাত্রদের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করতে পারবে তো?"

"হ্যাঁ পারব।" সংক্ষেপে জবাব দিল পুরু।

"জানো তো আমাদের স্কুলে গেমস বলতে ফুটবলটাই হয়। তোমার সেটাই দেখতে হবে, কেমন?"

পুরু মাথা নাড়ল।

"ঠিক আছে। সামনে আমাদের একটা ম্যাচ আছে রবিন মেমোরিয়ালের সঙ্গে, সেটা হয়ে যাক! দেখি কী করতে পারি। তবে একটা কথা, যদি

কাজটা পাও তবে মন দিয়ে কাজ করবে। বেগড়বাই দেখলেই কিন্তু ঘাড় ধরে বের করে দেব। নাও, তোমরা কিছু খেয়ে নাও এবার।”

ওরে বাবা এ জ্যাঠামশাই না ঠ্যাটামশাই? এই হেমন্তকালেও কুলকুল করে ঘামছে পুরু। এ যে বৃদ্ধ আলেকজেন্ডার!

ঘাড় ধরার কথাটা ঠিক হজম হচ্ছিল না পুরুর। তাই ঠিকমতো খেতে পারল না। ফেরার পথে পুরুকে চুপচাপ দেখে কুশ বলল, “ফিকর নট। ঘাড় ধরার কথায় ভয় পাস না। ওটা গুড সাইন।” সাইন, না ঝাড় খাওয়ার আগের সাইনবোর্ড, বুঝল না পুরু।

রাত্রে ছাদে একা দাঁড়িয়েছিল ও। মাথার ওপর কার্তিক মাসের আকাশ। কোটি কোটি তারার মধ্যে নির্জন কালপুরুষ। এ-সময়টা হিম পড়ে। পুরু ভাবছিল বাবা আজকেও খেতে বসে খোঁটা দিয়েছে। পুরু নাকি অন্ন ধ্বংস করছে। স্কুলের চাকরিটা সত্যি খুব দরকার ওর। কিন্তু হবে কি? শেষ মুহূর্তে আবার সব গন্ডগোল হয়ে যাবে না তো? হঠাৎ ও দেখল একটা বড় উল্কা খসে পড়ল আকাশের এক মাথা থেকে আরেক মাথায়। ঠিক যেন কর্নার ফ্ল্যাগের কাছ থেকে কেউ সেন্টার করল গোল মুখে। উল্কা দেখে কেউ যদি কিছু চায় সেটা নাকি সফল হয়— পুরু শুনেছে। দেখবে নাকি চেয়ে? ভগবান টগবান বিশেষ বিশ্বাস করে না পুরু। তবু আজ খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে ওর। পুরু চোখ বন্ধ করল। দেখা যাক কর্নার ফ্ল্যাগের থেকে ভেসে আসা সেন্টারটায় গোল হয় কিনা!

৩

মাঝে মাঝে জ্যাকসনের খুব মনখারাপ হয়। ওর কপালটাই জঞ্জালের গোডাউন। কেউ ওকে সিরিয়াসলি নেয়ই না। আসলে সবাই ওর কথার ভুল মানে ধরে। কিন্তু জ্যাকসন নিজে জানে যে কথাগুলো ও সাদা মনেই বলে। কিন্তু কী যে হয়, কথার মানেগুলো সব ইন সুইং, আউট সুইং হয়ে যায়। ও বলে এক, লোকে বোঝে আরেক। আর সত্যি বলতে কী মাঝে

মাঝে একটু উলটোপালটা বলেও যে ফেলে না তা নয়। কী করে জানি মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় সব। ভাবে জলের জন্য তো ফিল্টার পাওয়া যায়, মুখের কথার জন্য পাওয়া যায় না।

ক্লাস টেনেই তো একবার ঝামেলা হয়েছিল। হেডস্যার ক্লাস নিতে এসেছেন। ফিজিকাল সায়েন্স ক্লাস। স্যার মুখে বলতে বলতে বোর্ডে লিখলেন— বস্তু দুই প্রকার। এক পদার্থ, দুই... কীভাবে জানি জ্যাকসনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "অপদার্থ।" বলেই বুঝল সর্বনাশ করেছে। হেডস্যার পিছন ফিরেছিলেন, তিনি বুঝতেনই না কে কথাটা বলেছে। কিন্তু ওই— কপাল খারাপ। জ্যাকসনের গলার স্বর অবিকল সচিন তেন্ডুলকরের মতো সরু। স্কুলের সবাই সেটা জানে। হেডস্যার গটগট করে গিয়ে থামলেন ওর সামনে। কান ধরে বললেন, "কে অপদার্থ? দাঁড়া তোর হচ্ছে।" বলে চড়ও তুললেন। কিন্তু আবার বিপত্তি। জ্যাকসনের আবার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, "স্যার আমার পিসেমশাই কিন্তু দারোগা।"

"মানে?" হেডস্যারের চড় মাঝ পথে আটকে গেল, "দারোগা, তো আমায় বলছিস কেন?"

জ্যাকসন ম্যানেজ করার চেষ্টা করল, "জাস্ট এমনি স্যার, এমনি, ফর ইয়োর ইনফরমেশন। দরকার হলে বলবেন, দু'নম্বরি কেসে ফেঁসে গেলে ম্যানেজ করে দেব।"

স্যার কান ছেড়ে দিলেন। বলে কী ছেলেটা? দু' নম্বরি কেস? ম্যানেজ? ব্যস গার্ডিয়ান কল। জ্যাকসন নিজেও জানে না কেন এমন কথা ও বলেছিল। ওর ভেতরে কি অন্য কেউ ঢুকে বসে আছে?

তবে এসব মাঝে মাঝেই জ্যাকসনের সঙ্গে হয়। এই তো গত জানুয়ারিতেই নন্দনকুসুম স্যারের সঙ্গেই একটা ঝামেলা হয়ে গেল।

ওদের ইকো-জিও নেন নন্দনকুসুম রায়। খুব ভাল টিচার, শুধু একটাই গন্ডগোল, সুযোগ পেলেই উনি লন্ডনের গল্প করতে শুরু করেন। ওঁর দাদা লন্ডনে থাকেন। আর ওঁর বউদি ব্রিটিশ মহিলা। নন্দনকুসুম স্যার একবার লন্ডনে গিয়েছিলেন। আর সেটাতেই বিপত্তি।

সেই যাওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে উনি এখন ছাত্রদের কানের পোকা বের করে দেন এই বলে যে— টেমস কত বড় নদী, লন্ডন ব্রিজ কেমন, শেক্সপিয়ারের বাড়িতে উঠোন আছে কিনা, বেকার স্ট্রিটে শার্লক হোমস বাড়ি বলে কিছু নাকি নেই। আরও সব সাতসতেরো, হাবিজাবি। স্কুলে তাই ওঁর নামই হয়ে গেছে লন্ডনকুসুম।

এরকমই একদিন স্যার লন্ডনের গল্প শুরু করেছেন। সেই এক ভ্যানতারা। অনেকক্ষণ বকেটকে শেষে জিজ্ঞেস করলেন, "লন্ডন সম্বন্ধে আর কিছু জানার আছে তোমাদের?" ব্যস, জ্যাকসন হাত তুলল বা বলা যায় রিফ্লেকস অ্যাকশনে হাতটা উঠে গেল ওর। তারপর মুখ কাঁচুমাচু করে জিজ্ঞেস করল, "স্যার, ওখানে শুনেছি বিকিনি খুব সস্তা, সত্যি?"

"কী কিনি?" স্যার প্রথমে বুঝতেই পারেননি। স্বাভাবিক। ওঁর মাথাতেই আসেনি কেউ এরকম প্রশ্ন করতে পারে।

জ্যাকসন এবার বিস্তারিত করল, "ওই যে স্যার বিকিনি। ছোট ছোট স্যান্ডো গেঞ্জিকে কেটে ফেললে যেমন হয় সেরকম জামা, তিনকোনা ছোট প্যান্টের মতো লেংটি। ওই যেগুলো পরে 'এফ' টিভিতে রোগা মেয়েরা ল্যাগব্যাগ করে হাঁটে। সেগুলো কি খুব সস্তা?" লন্ডনকুসুমের মুখ নিমেষে ডিমের কুসুমের মতো হয়ে গেল। পরিণতি গার্জিয়ান কল।

কবীর মাঝে মাঝে ওকে জিজ্ঞেস করে, "হ্যাঁরে জ্যাকসন তোর মুখে কী আছে বল তো? সবসময় এরকম আরবিট প্রশ্ন করিস?" জ্যাকসন কী বলবে ও নিজেই কি জানে নাকি?

জ্যাকসন একটু মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এন এস মাঠ এখনও দর্শকে ভরেনি। আজ শনিবার। বাটা কোম্পানির ছুটি। খেলা শুরু হবে বিকেল তিনটের সময়ে। তার মিনিট দশেক আগেই মাঠ দর্শকে ভরে যাবে। প্রতিবারই তাই হয়। এটা নঙ্গী হাই স্কুলের নিজের মাঠ। খেলাটা হয় হোম-অ্যাওয়ে পদ্ধতিতে। মাঠের ধারে একটু দূরত্ব রেখে চারিদিকে বাঁশের ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছে। এই ম্যাচটায় এত ভিড় হয় আর এত টেনশন থাকে যে এসব ব্যবস্থা নিতেই হয়। আসলে এই ম্যাচটা একটা

প্রেস্টিজ ম্যাচ। মোটামুটিভাবে পশ্চিম বাটানগর রবিন মেমোরিয়ালের সাপোর্টার আর পূর্ব বাটানগর নঙ্গী হাই-য়ের। এ-ম্যাচটা হল বাটানগরের মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ।

জ্যাকসন ওদের স্কুলের শামিয়ানার নীচে গিয়ে বসল। টিম এখন ড্রেস করছে। জ্যাকসনের ড্রেস করা হয়ে গেছে। তবে ও জানে ওকে স্যার ফার্স্ট ইলেভেনে নামাবেন না। ওর চিরজীবন এক্সট্রার কপাল। এমনিতেই এখন গেমস টিচার নেই। বরণ সিনহা স্যার ওদের ইংরাজি পড়ান। উনি আপাতত খেলাটা দেখছেন। আর উনি জ্যাকসনকে প্লেয়ার হিসেবেই ধরেনই না। বলেন "ওটা তো জোকার।" খুব রাগ হয় জ্যাকসনের। মনে মনে ভাবে এই জোকারই একদিন ওভার ট্রাম্প করবে।

মাঠে আস্তে আস্তে লোক বাড়ছে এবার। স্কুলের ছেলেরা তো আছেই। রবিন মেমোরিয়াল কো-এড স্কুল, ওদের মেয়েরাও খেলা দেখতে আসে। নঙ্গী হাই বয়েজ স্কুল। এখানকার ছেলেরা মেয়েদের কাছাকাছি বিশেষ আসতে পারে না। তাই সেদিক থেকেও ম্যাচটা গুরুত্বপূর্ণ। নঙ্গী হাই-এর ছেলেদের খরার জীবনে রবিন মেমোরিয়ালের মেয়েরা একটু মনসুন আর কী। আর হবে নাই বা কেন! রবিন মেমোরিয়ালের মেয়েরা দুর্লভ জিনিস। ওদের জামাকাপড় দেখলেই মাথা ঘুরে যাওয়ার জোগাড় হয়। কেউ জিনস্ পরে, কেউ বা আবার শর্ট স্কার্ট, আবার কারও গায়ে বিপজ্জনক গেঞ্জি। কারও বুকের কাছে লেখা— 'বুকার প্রাইজ'। কারও পিঠে লেখা— 'হিল অন দ্য আদার সাইড'। এসবের কী অর্থ কে জানে! কত রকমের পোশাক, কত রকমের কায়দা। কাঙাল যেভাবে শাকের খেতের দিকে তাকিয়ে থাকে, সেভাবেই নঙ্গী হাই-এর ছেলেরা হাঁ করে ওদের দেখে। জ্যাকসনও তাই করে। কী করবে? ওকে তো আর খেলায় নামাবে না। অবশ্য খেলা দেখেই বা কী হবে? দিয়োগের সঙ্গে তো কথা হয়েই গেছে।

জ্যাকসনের চিন্তায় বাধা পড়ল। কে যেন পিঠে হাত রাখল। জ্যাকসন বলল, "কে বে?" ঘুরেই দেখে বরণ স্যার। 'বে' শব্দটা স্যারের মোটেই

পছন্দ হয়নি। উনি দাঁত কিড়মিড় করে প্রশ্ন করলেন, "বে মানে? বে মানে কী?" উফ এই জিভটাই যত নষ্টের গোড়া। আবার কেলো করে ফেলেছে! ও সামলাতে গিয়ে বলল, "স্যার ওটায় প্রিন্টিং মিসটেক আছে।"

"প্রিন্টিং মিসটেক?" স্যার থতমত খেয়ে রাগটা বজায় রাখবেন কিনা বুঝতে পারলেন না।

"মানে স্যার-ব-য়ের তলায় ফুটকিটা পড়েনি। ওটা 'বে' না 'রে' হবে।"

স্যার অনেক কষ্টে রাগটা গিললেন, "ছাগল। কবীরের গ্লাভস্‌টা কোথায় রেখেছিস?" কবীর নঙ্গী হাই-এর গোলকিপার। জ্যাকসন দূরে রাখা একটা লাল ব্যাগ দেখিয়ে বলল, "ওর মধ্যে আছে স্যার।" স্যার ওর আগাপাস্তলা মেপে গজগজ করতে করতে চলে গেলেন।

স্যার লাল ব্যাগের কাছে গিয়ে ব্যাগ থেকে গ্লাভস্‌টা বের করছেন হঠাৎ জ্যাকসন দেখল যে দিয়েগো স্যারের কাছে গিয়ে কিছু বলছে। মাঠের চিৎকারে দিয়েগো কী বলছে সেটা জ্যাকসন বুঝতে পারল না। কিন্তু জ্যাকসন বুঝল যে দিয়েগো এমন কিছু বলেছে যাতে স্যার উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। হট্টগোল ছাপিয়ে জ্যাকসন শুনল স্যার বলছেন, "কোনও কথা শুনব না। নামো এক্ষুনি।" ও দেখল দিয়েগো মাথা গোঁজ করে চলে গেল ওদের টেন্টে।

মাঠ এখন কানায় কানায় ভরতি। প্লেয়ারেরা নামছে। জ্যাকসন মাঠের ধারে অন্য স্যার আর প্লেয়ারদের সঙ্গে গিয়ে বসল। রবিন মেমোরিয়ালের মেয়েদের জন্য জ্যাকসনের দুঃখ হতে লাগল— কাঁদবি, আজ খুব কাঁদবি তোরা।

ঠিক সময়ে খেলা শুরু হয়ে গেল। সাদা কালো জার্সি পরে নঙ্গী স্কুল পূর্ব প্রান্তে আর নীল জার্সি পরে রবিন মেমোরিয়াল পশ্চিম প্রান্তে প্লেয়ার সাজিয়েছে। প্রথম দশ-পনেরো মিনিট ঢিমেতালে খেলা চলল। দুটো দলই নিজেদের মধ্যে বল দেওয়া নেওয়া করে খেলছে। কেউই বিশেষ রিস্ক নিচ্ছে না। দু'পক্ষই একটু বুঝে, বিপক্ষকে একটু মেপে নিতে

চাইছে। জ্যাকসন জানে মিনিট কুড়ির পর থেকে দিয়েগো খেলাটা ধরে। ও মনে মনে হিসেব করল আর পাঁচ মিনিট তারপরই রবিন মেমোরিয়ালের প্যাথোজ শুরু হবে।

ঠিক বাইশ মিনিটের মাথায় সেন্টার সার্কেলের কাছে বলটা ধরল আমন। একজনকে কাটিয়ে ও বলটা পাস দিল ডান দিক দিয়ে ওভারল্যাপে যাওয়া ওদের স্কুলের সুমনকে। সুমন ওয়ান টাচে বলটা ফরোয়ার্ড পাস করল ডুডুকে। ডুডু ছোট্ট করে কাটিয়ে নিল আরও একজনকে তারপর বলটা লব করে দিল দিয়েগোর পায়ে। ওর সামনে একজন ডিফেন্ডার আর তারপরেই গোলকিপার। জ্যাকসন সাইডলাইন থেকে উঠে দাঁড়াল। গোল নিশ্চিত। দিয়েগোর কাছে এসব দুধভাত। কিন্তু দিয়েগো বলটা ধরে ডিফেন্ডারটাকে কাটাবার কোনও চেষ্টা না-করে আচমকা গোলে শট নিল। গোওও বলে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল জ্যাকসন। কিন্তু অবাক হয়ে দেখল বলটা বারের দশ হাত উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। এ কী করল দিয়েগো? এ যে দু'বছরের ছেলেও গোল দেবে। মনখারাপ হয়ে গেল জ্যাকসনের। তারপর ভাবল হয়তো ভুল হয়ে গেছে দিয়েগোর। আর নিশ্চয়ই হবে না। স্যারকে বলল, "দেখলেন স্যার, দিয়েগোটা এমন গোল মিস করল যেটা আমি চোখ বন্ধ করে দেব।"

এমনিতেই গোল মিস তার ওপর জ্যাকসনের কথা শুনে খেপে গেলেন স্যার, বললেন, "চুপ কর ছাগল। চোখ বন্ধ করে গোল দেবে? চোখ খুলেই কিছু করতে পারে না! দিয়েগোই গোল দেবে, ভাল করে খেলা দেখ।" কিন্তু কোথায় কী? তিরিশ মিনিট কেটে গেল, চল্লিশ মিনিট কেটে গেল। গোল কই? বারবার একইরকম ভুল করছে দিয়েগো। আজ কী হয়েছে ওর? একবারও একজনকে কাটাতে পারছে না! ভুল পাস দিচ্ছে অনবরত। এমনভাবে বল রিসিভ করছে যে অপনেন্ট বল নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। দিয়েগোর সেই বিখ্যাত দৌড়টাই বা কই? কী হল আজ ছেলেটার? ফুটবলের বেসিকটাই ভুলে গেল নাকি? দেখতে দেখতে রেফারি বাঁশি বাজিয়ে দিল হাফ টাইমের।

দিয়েগো মাঠ থেকে বেরোতেই জ্যাকসন গিয়ে ওকে ধরল, "কী করছিসটা কী? ফুটবলটা ভুলে গেলি নাকি?" দিয়েগো চুপ করে রইল। মাঠে বসে পড়ে গ্লাসে করে একটু একটু জল খেতে লাগল। জ্যাকসন আবার খোঁচাল, "কী কাকা, ডুবিয়ে দিচ্ছ? দেখ তো ওদের মেয়েগুলো কেমন হ্যা হ্যা করছে। রবিন মেমোরিয়ালের ছেলেরা মেয়েদের পাশে বসে পড়াশুনো করবে, আবার ফুটবলেও জিতে যাবে, তা হয়? তুই বল, ভগবান বলে কিছু নেই? অ্যাই দিয়েগো।"

দিয়েগো মাথা নিচু করে বলল, "চেষ্টা তো করছি। কিন্তু আজ কেমন সব গন্ডগোল হচ্ছে।' দিয়েগোর মুখটা দেখে জ্যাকসন বুঝল হাওয়া খারাপ। ও গিয়ে ধরল বরণ স্যারকে, "স্যার, একটু দিয়েগোর কাছে এসে ওকে একটু টনিক দিয়ে দিন তো।"

"টনিক?" স্যার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

"ওই যে স্যার পি কে দেন না কী সব লোকাল না ইন্টারন্যাশনাল টনিক, একটু দিয়ে দিন না।"

"ছাগল, ওটা ভোকাল টনিক।" স্যার খিঁচিয়ে উঠলেন। এমনিতেই টিম খারাপ খেলছে তার ওপর জ্যাকসন! কিন্তু জ্যাকসনও নাছোড়বান্দা, "যাই হোক স্যার, ওই টনিকটাই দিয়ে দিন না দিয়েগোকে। ও কেমন নেতিয়ে পড়েছে।"

স্যার আরও রেগে গেলেন, "দাঁড়া তোকে টনিক দেবার সময় হয়েছে।"

আসলে দিয়েগোকে যে কিছু বলার নেই সেটা জ্যাকসন জানে। তবু শেষ চেষ্টা করল, "গুরু একটু দেখো, উতরে দাও।" জ্যাকসন দেখল মাঠে নামার আগে আবার স্যারকে কিছু বলল দিয়েগো কিন্তু স্যার আবার মাথা নেড়ে চলে গেলেন। একটু যেন বেদম হয়েই মাঠে নামল দিয়েগো। জ্যাকসন ভাবল, আচ্ছা দিয়েগোর কি আজ খেলার ইচ্ছে নেই?

সেকেন্ড হাফের শুরুটা একটু অন্যরকমভাবে হল। ডুডুর একটা শট বারে লাগল, আমন একটা মিস করল। বারো মিনিটের মাথায় আবার ডানদিক থেকে একটা আক্রমণ শুরু হল। আমন বল ধরে দু'জনকে

কাটিয়ে ডিফেন্স চেরা পাস বাড়াল দিয়েগোকে। এবার সুযোগ আরও সহজ। বলটা লাফাতে লাফাতে দিয়েগোর দিকে গেল। কিন্তু দিয়েগো শট মারার আগেই বলটা ওর শিন বোনে লেগে বেরিয়ে গেল মাঠের বাইরে। জ্যাকসন উত্তেজনায় মাঠের থেকে একমুঠো ঘাস ছিঁড়ে ফেলল। এ কী রে ভাই? দিয়েগো হাডুডুর মতো করে ফুটবল খেলছে কেন? এত সুযোগ নষ্ট করার জন্যই বোধহয় একটু মনমরা হয়ে গেল নঙ্গী স্কুলের প্লেয়াররা। বরং পঁচিশ মিনিটের পর থেকে রবিন মেমোরিয়াল বেশ চেপে ধরল নঙ্গী হাইকে। এদিকে দিয়েগো বলই ধরতে পারছে না। কবীর গোল থেকে এবার দিয়েগোকে গালাগালি করতে লাগল। কবীর এমনিতেই শর্ট টেমপার্ড, তার ওপর দিয়েগোর নমুনা দেখে ও খেপে আগুন হয়ে গেছে। এমনকী হাফ লাইন থেকে আমন আর রাইট স্ট্রাইকার পজিশন থেকে ডুডুও চিৎকার শুরু করেছে। দর্শকরাও অধৈর্য হয়ে উঠল। কে যেন "অ্যাই শুয়োরের বাচ্চা" বলে চিৎকার দিল। এই দিয়েগোই যে আগের ম্যাচগুলোয় নঙ্গী হাইকে জিতিয়েছে সবাই ভুলে গেছে। অবশ্য ক্রাউডের চরিত্রই তাই। গত ম্যাচের পারফরমেন্স কেউ মনে রাখে না। জ্যাকসন বুঝল আর উপায় নেই, ম্যাচটা ড্র-ই হয়ে যাবে। আর ঠিক তখনই ঘটল ঘটনাটা।

ডান দিক থেকে একটা বল ধরে রবিন মেমোরিয়ালের মলয় অনেকটা ওভারল্যাপ করে কর্নার ফ্ল্যাগের কাছ থেকে বলটা সেন্টার করল। পেনাল্টি বক্সের মাথায় বলটা উঁচু হয়ে এল। রবিন মেমোরিয়ালের চাপে নঙ্গী হাই তখন সবাই মিলে ডিফেন্স করছে। দিয়েগোও নীচে নেমে এসেছে। বলটা হেড করার জন্য সবাই একসঙ্গে লাফাল। কবীর গোল ছেড়ে বেরিয়ে এল বলটা ধরবে বলে। ও সহজেই বলটা হাতে পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কীসের থেকে কী হল, লাফিয়ে ওঠা দিয়েগোর সঙ্গে ধাক্কা লাগল কবীরের। দু'জনেই মাটিতে পড়ে গেল। জ্যাকসন দুঃস্বপ্ন দেখার মতো মুখ করে দেখল বলটা ড্রপ খেতে খেতে চলে গেল গোলের সামনে ফাঁকায় দাঁড়ানো রুদ্রর পায়ে।

মাঠের ওই ধার থেকে যখন চিৎকারটা উঠল জ্যাকসন ততক্ষণে চোখ

বন্ধ করে মাটিতে বসে পড়েছে। সব শেষ। চিৎকারটা বহুক্ষণ ধরে চলল। রেফারি খেলা শেষের বাঁশি বাজাবার পর সেটা আরও বাড়ল। বহুদিন পর নঙ্গী হাইস্কুল 'টমাস চ্যালেঞ্জ কাপ'-এর ম্যাচ হেরে গেল ০-১ গোলে।

চারিদিক থেকে গালাগালি ভেসে আসতে লাগল। প্লেয়াররা মাঠের ধারে প্রায় সবাই মাথা নিচু করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পড়েছে। কবীর হাতের গ্লাভস্‌টা ছুড়ে ফেলল এক কোনায়। ওর চোখে জল। স্যারেরা কী সান্ত্বনা দেবেন বুঝতে পারছেন না। হঠাৎ কবীর লাফিয়ে উঠল, "এই জানোয়ারের বাচ্চা দিয়েগো, তোর জন্য, শুধু তোর জন্যই আজ হারলাম। শুয়োর, আমায় ধাক্কা দিলি কেন? গোলটা তোর জন্যই খেতে হল আমাদের।" বলতে বলতেই কবীর তেড়ে গিয়ে কলার ধরে ফেলেছে দিয়েগোর। এবার ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে দিয়েগোকে মাটিতে শুইয়ে ফেলল ও। চড়, ঘুষি, লাথি যা খুশি তাই চালাতে লাগল দিয়েগোর শরীর লক্ষ্য করে। বরণ স্যার, হেডস্যার সবাই এগিয়ে এলেন। এদিকে দিয়েগো মার ঠেকাবার কোনও চেষ্টাই করছে না, চুপচাপ মার খেয়ে যাচ্ছে। কবীর তখনও বলে যাচ্ছে, "জানোয়ার, তোর জন্য হারলাম, তুই হারিয়ে দিলি।" স্যারদের সঙ্গে এবার জ্যাকসন, ডুডু আর অন্যরাও হাত লাগাল। কোনওমতে কবীরকে ছাড়িয়ে আনল সবাই। কবীর ভীষণ চিৎকার করছে, সঙ্গে কাঁদছেও খুব। দিয়েগো কোনওমতে উঠে বসল। জ্যাকসন দেখল দিয়েগোর চোখের নীচে কালসিটে। নাক দিয়ে সামান্য রক্ত বেরোচ্ছে। ঠোঁটটাও বেশ কেটে গেছে। কিন্তু তবু দিয়েগো কাঁদছিল না। কথা বলছিল না কোনও। জ্যাকসন ফার্স্ট এড বক্স থেকে একটু আয়োডিন তুলোয় করে নিয়ে দিয়েগোকে দিল। বলল, "এটা লাগা।" দিয়েগো তুলোটা নিল না। চুপ করে বসে রইল।

এখন মাঠ অনেক ফাঁকা হয়ে এসেছে। সন্ধেও হয়ে এল প্রায়। জ্যাকসন মাথা তুলে দেখল বোঁ ঘুড়িটা এখনও উড়ছে। রাধাকাকু কি খবর পেয়েছে যে ওরা ম্যাচটা হেরে গেছে? স্যারেরা ব্যাগপত্র গুছিয়ে

নিতে বললেন। জ্যাকসন দেখল রবিন মেমোরিয়াল টিম নিয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, প্রচণ্ড হল্লা করছে ওরা। স্বাভাবিক, নঙ্গী হাইকে তাদের নিজের মাঠে হারিয়ে দেবে, ওরা আশাই করেনি। কিন্তু বাস্তবে তাই হল। হঠাৎ জ্যাকসন দেখল প্লেয়ারদের ভিড় থেকে বেরিয়ে ওদের দিকে আসছে রুদ্র। জ্যাকসন অবাক হল বেশ। রুদ্র এদিকে আসছে কেন?

"কী রে নিজেদের মধ্যে মারামারি করছিস কেন? খেলায় হারজিত আছেই। ব্যাপারটা স্পোর্টিংলি নিতে শেখ। সব বার তোরা জিতবি নাকি? মামার বাড়ির আবদার? মন দিয়ে প্র্যাকটিসটা কর, দেখ ফিরতি ম্যাচে জিততে পারিস কিনা। সরস্বতী পুজো অবধি তো সময় আছে।" রুদ্র মুচকি হেসে বলল। কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটে। যদিও কথাটা সত্যি। 'টমাস চ্যালেঞ্জ কাপ' খেলাটা হয় এই দুটো স্কুলের মধ্যেই। বছরে দুটো ম্যাচ, একটা নভেম্বরে আর একটা সরস্বতী পুজোর আগের দিন। টেস্টের পর জ্যাকসনদের স্কুল শেষ হলেও ওই ম্যাচটা ওরা খেলবে। প্রতিবারের টুয়েলভরা ওটা খেলে। এটাই নিয়ম। সেই হিসেব করলে আর মাস তিনেক সময় আছে।

রুদ্রর কথায় কবীর ছিটকে উঠেছিল কিছু বলার জন্য, কিন্তু বরণ স্যার বারণ করলেন। রুদ্র হাসল, তারপর দিয়েগোর দিকে তাকিয়ে বলল, "কী গো, আজ ফিউজ কেন? যাক, তোকে থ্যাঙ্কস, গোলটা তোর জন্যই দিতে পারলাম। অবশ্য তা না হলেও আজ আমরাই জিততাম।" জ্যাকসন আর পারল না। ভুলে গেল স্যাররা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ও চিৎকার করে বলল, "এই যে দামড়া ছাগল, এবার এখান থেকে না-গেলে পিছনে তিনটে লাথ মারব। এখানে এসে পিনিক দেওয়া হচ্ছে? মনে নেই গতবারগুলোয় কেমন দিয়েছিলাম? এবার ফ্লুকে জিতে খুব পোংটামো হচ্ছে, না?"

রুদ্র সামান্য হাসল, "জোকার, সত্যি তুই জোকার। হেরেছিস তবু লজ্জা নেই! আর তুই কথা বলছিস কী? খেলতে পারিস? দশটা শট মারলে তো কুড়িটা মিস করিস। টিমের লেবুজল বয়ে বেড়াস।"

জ্যাকসন আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু স্যারেরা বলতে দিলেন না। সবাইকে "চল, চল" করে মাঠ থেকে বের করে নিলেন। রুদ্রও গা-জ্বালানো হাসি হেসে চলে গেল। দিয়েগো শুধু চুপ করে বসে রইল। ডুডু যেতে যেতে বলল, "আজ শনিবার না! বারবেলা। তাই তো হারলাম।" জ্যাকসন ওর দিকে কটমট করে তাকাতেই ডুডু রণে ভঙ্গ দিল।

ডুডুটা এরকমই। ভীষণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এর মুখ দেখা খারাপ, এই জামাটা পয়া। এক শালিখ মানে ব্যাড লাক, দু'শালিখ মানে গুড লাক, এরকম হাজারটা প্রেজুডিস ওর। খেলার মাঠেও ওকে সাত নম্বর জার্সিটা দিতে হবে। ওটা নাকি ওর গুড লাক চার্ম। কিন্তু আজ আবহাওয়া দেখে বেশি হ্যাজাল না।

একরকম জোর করেই জ্যাকসন দিয়েগোকে মাঠ থেকে তুলে মাঠের বাইরে বেরিয়ে এল। এখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। নভেম্বর মাস, তাই দিন অনেক ছোট হয়ে এসেছে। দিয়েগো কোনও কথা বলছিল না। এমনিতেই এদিকটা খুব নির্জন। খেলা দেখার ভিড় চলে গেছে। রাস্তার পাশের গাছগুলো থেকে পাতা খসার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে এখন। আর পাওয়া যাচ্ছে আধ ভাঙা পিচের ওপর ওদের জুতোর শব্দ। ওরা হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা চলে এল। জ্যাকসন দেখল এখনও কথা বলছে না দিয়েগো। ও আস্তে জিজ্ঞেস করল, "কী হল গুরু? এত ঠান্ডা মেরে গেলে কেন? এই দিয়েগো কিছু বল। একটা ম্যাচ হেরেছি তো কী হয়েছে? পরেরটা জিতব।"

এবার শব্দ করে নিশ্বাস ছাড়ল দিয়েগো, বলল, "না আমার ব্যাপারটা তোরা বুঝবি না। এটা সামান্য হারা জেতার জন্য নয়। অন্য ব্যাপার। কত করে স্যারকে বললাম যে ম্যাচটা খেলব না, খেলতে পারব না। কে কার কথা শোনে? এখন তাড়াতাড়ি চল। বাড়িতে কেউ নেই। এ ছাড়া আমাকে এক জায়গায় যেতেও হবে।"

"মানে? কী ব্যাপার? খেলতে পারবি না মানে?" জ্যাকসন কৌতূহলী হয়ে উঠল। কিন্তু দিয়েগো আবার চুপ করে গেছে। মহা মুশকিল।

জ্যাকসনেরও ভাল লাগছিল না, কাঁহাতক আর প্রশ্ন করা যায়?

হাঁটতে হাঁটতে ওরা এসে থামল এক মোড়ে। সামনেই বিরাট এক বটগাছ। সবাই এই জায়গাটাকে বটতলা বলে। এই বটতলার নীচের ছায়াচ্ছন্ন জায়গাটা এই সন্ধের সময় আরও অন্ধকার আর ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। বটগাছটার নীচেটা বাঁধানো। সেখানে কারা যেন বসে আড্ডা মারছে। তাদের মুখ দেখতে পেল না জ্যাকসন। ওর আর দিয়েগোর বাড়ি যাওয়ার রাস্তাটা এখান থেকে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। ডানদিকে যাবে দিয়েগো আর বাঁদিকে জ্যাকসন। অন্ধকারে দিয়েগোর মুখটাও ঠিক দেখা যাচ্ছে না, ফলে জ্যাকসন বুঝতে পারল না ওর মনের ভাব কী। তবে আর দেরি করল না জ্যাকসন। চলে যাবে বলে ও সবে "আসছি" বলতে যাবে, এমন সময় বটতলার ওই আড্ডা থেকে একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল ওদের সামনে। কে লোকটা? মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। ছায়ামূর্তিটা নিচু কিন্তু শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, "দিয়েগো, তুমি কি কবীরকে ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়েছিলে?"

৪

কমল স্যার আজ একদম সজুত হয়ে গেছেন। আর কোনওদিন অসভ্যতা করবেন না। বেশ ক'দিন ধরে তক্কে তক্কে ছিল ও। আজ অ্যায়সা দিয়েছে না, বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়েছে। ব্যাটার পট্যাটো হাইল ডিফেক্টিভ ছিল, যাকে বলে পি এইচ ডি। আজ সব শেষ করেছে এক ধাক্কায়। যদি লজ্জা থাকে তবে আর কোনওদিন এসব করবেন না।

টাপুর কাঠি দিয়ে আলুকাবলির আলু তুলল একটা। ওঃ দারুণ বানায় নেপালদা। আ জেনুইন ওয়ার্ক অব আর্ট। হাতটা সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দিতে হয়। তিন টাকা, চার টাকা, যে যেমন বলবে ঝটাঝট নামিয়ে দেবে টক-ঝাল আলুকাবলি। মাঝে মাঝে পাতাটাও খেয়ে নিতে ইচ্ছে করে টাপুরের। তা বলে ও গোগ্রাসে খায় না। খায় একটা একটা করে, আস্তে

আস্তে, তারিয়ে তারিয়ে। শিমুলটা এসব কিচ্ছু খায় না। ওই দেখ না, কেমন মুখ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। এক্ষুনি বলবে, "আলুকাবলির টক জলটা ড্রেনের থেকে নেওয়া।" টাপুর হাসল, "কী রে! খাবি নাকি শিমুল?"

"ইস, দেখলেই মনে হয় অম্বল হয়ে যাবে। খাস কী করে তুই?" শিমুল মুখ ব্যাঁকাল।

"আবার পৃথিবীতে জন্মাতে হবে তোকে, বুঝলি? যমরাজ যদি শোনে তুই পৃথিবীতে ফুচকা, আলুকাবলি, পাঁপড়ি চাট খাসনি, তা হলে তোকে আবার ফেরত পাঠাবে।" টাপুর নেপালদাকে টাকা দিতে দিতে বলল।

এবছরই মাধ্যমিক পাশ করে ইলেভেনে উঠেছে ওরা। এখন পড়াশুনোর তেমন চাপ নেই। তবে ডিসেম্বরের শেষে ফার্স্ট টার্ম আছে। শিমুলটা অবশ্য এখন থেকেই তেড়ে পড়াশুনো শুরু করেছে। পুয়োর গার্ল। টাপুর নিজের মনেই হাসল। "বেশি হাসিস না আজ। স্যারের সঙ্গে যা করলি, সেটা ঠিক হল?" শিমুল টেনস্‌ড গলায় প্রশ্ন করল।

"একশোবার ঠিক হয়েছে। উনি যা করতেন সেটা কি ঠিক ছিল? বুড়োটাকে ডোজ না দিলে চলছিল না।"

ঘটনাটা সত্যিই কেলেঙ্কারির। কমল স্যারের বয়স প্রায় পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বছর। উনি কলকাতার নামী একটা স্কুলে পড়ান। আর প্রাইভেটে, বাটানগরের 'স্টাডি এড' কোচিং সেন্টারে ইলেভেন টুয়েলভের স্টুডেন্টদের ফিজিক্স পড়ান। উনি টিচার হিসেবে দারুণ। স্যারের কাছে পড়ার জন্য তাই ভীষণ ভিড় হয়। কিন্তু এসবের মধ্যে একটা সমস্যা আছে— স্যার মেয়েদের একটু বেশি করে পড়ান বা পড়েন। মানে গায়ে পড়েন। সামান্য ছুতোনাতায় তাদের গায়ে হাত দেন। স্যারের হাত মাঝে মাঝে বিপদ সীমাও ছুঁয়ে ফেলে। এতে সব মেয়েরাই অস্বস্তিতে পড়ে কিন্তু স্যারের এত নাম-ডাক, এত খ্যাতি যে কেউ এ ব্যাপারটা নিয়ে মুখ খোলে না।

টাপুর সবসময়ই একটু খোলামেলা জামাকাপড় পরে। মা রাগারাগি করলেও ও পাত্তা দেয় না। ছেলেরা লোভীর চোখে তাকাবে? তাকাক

না, টাপুরের বয়ে গেছে। কমল স্যারের কাছে পড়তে আসার আগে টাপুর স্যারের এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে শুনেছিল, কিন্তু ভেবেছিল বোগাস। বাবার চেয়ে বয়সে বড় একটা লোক এরকম হতে পারে? তাই আমল দেয়নি। কিন্তু ক্লাসে জয়েন করার চারদিনের মাথায় কথাটা যে সত্যি সেটা বুঝল। সেদিন টাপুর একটা অনেকখানি পিঠ কাটা চুড়িদার পরে এসেছিল। স্যার পড়াতে পড়াতে টাপুরের পাশে এসে দাঁড়ালেন। টাপুর এমনিতেই খুন-খারাপি দেখতে, তার উপর অমন ড্রেস। ব্যস! স্যার পিঠে হাত দিলেন। বলতে লাগলেন, "কী রে যা বললাম বুঝেছিস?" বলতে বলতে পিঠে হাত বোলাতে লাগলেন। স্যারের আঙুলের মাথা থেকে যে লোভ ঝরে পড়ছে সেটা ভালভাবে বুঝলেও টাপুর কিছু বলতে পারছিল না, আবার সহ্যও করতে পারছিল না। জানোয়ার একটা, মনে মনে ভেবেছিল টাপুর। সেদিন থেকেই ব্যাটাকে ঝাড় দেবার তালে ছিল। আর সেটাই সম্পূর্ণ করেছে গত দু'দিনে। একদম স্ট্রাটেজিকালি।

গত দিন টাপুর টিউশনে এসেছিল শাড়ি পরে। আর পরেছিল ফুলহাতা ব্লাউজ। ক্লাসে বসেও ছিল শাড়ির আঁচল দিয়ে পিঠটিঠ ঢেকে। শুধু মুখটুকু দেখা যাচ্ছিল ওর। ঠিক মনে হচ্ছিল কাপড়ের পুঁটলি। সবাই জিজ্ঞেসও করেছিল ব্যাপার কী? ও কোনও উত্তর দেয়নি। সেদিন স্যার টাপুরের ধারে কাছেও মাড়াননি। আজ আজকেই ছিল কাহানি মে ট্যুইস্ট। টাপুর পরে এসেছিল স্লিভলেস ডিপকাট টপ আর টাইট জিনস্। "আগুন, আগুন" বলে রাস্তায় কিছু ছেলে আসার পথে আওয়াজ দিচ্ছিল। একজন চিৎকার করে উঠেছিল "দমকল কো বোলাও"। যথারীতি স্যারও সব স্টুডেন্টকে ছেড়ে আজ টাপুরকেই বেশি বোঝাচ্ছিলেন। বোঝাতে বোঝাতে স্যার যখন প্রায় ওর পিঠে হাত দিয়ে ফেলেছেন, ঠিক তখনই নিরীহ মুখে টাপুর বলল, "স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? গত দিন তো আপনি আমার কাছে এসে এত বোঝাননি। আজ আমায় এত বোঝাচ্ছেন কেন? আজ আমায় দারুণ লাগছে, তাই না?" স্যারের চোয়াল বোয়াল মাছের মতো খুলে গেল।

সারা ক্লাস চুপ। শুধু টাপুর হাসছে। দিয়েছে বুড়োর নুড়ো জ্বেলে। টাপুর এরকমই। ওর যা ইচ্ছে হয় ও করে। ওর সঙ্গে চালাকি নয়। স্যার আর না পড়িয়ে বেরিয়ে গেছেন ক্লাস থেকে।

শিমুল আবার বলল, "একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিস আজকে।"

টাপুর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "কিচ্ছু বাড়াবাড়ি হয়নি। চরিত্রের স্ক্রু ঢিলে হয়ে গিয়েছিল, একটু টাইট দিয়ে দিয়েছি, ব্যস। আর ছাড় তো, তুই এত টেনস্‌ড হচ্ছিস কেন? সবটাতে ভয় পেলে চলে?" শিমুলটা এরকমই। সবসময় 'কী হয়, কী হয়' ভাব। একবার ক্লাস নাইনে পড়ার সময় ওর পিছনে একটা লোফার টাইপের ছেলে লেগেছিল। মানে রাস্তায় দেখলেই শিমুলকে উত্ত্যক্ত করত। পিছনে পিছনে সাইকেল নিয়ে যেত। এমনকী ওদের পাড়ার মোড়েও দাঁড়িয়ে থাকত। শিমুল তো ভয়ে আধমরা। একটা সময় এল যখন প্রায় দু'সপ্তাহ স্কুলই গেল না ও। ওর বাবা-মা কত বোঝাল। ওর দিদি রঙ্গনা, কত সাহস দিল। কিন্তু কে শোনে কার কথা? শিমুল রাস্তায় বেরোলই না। তখন খুব সাহায্য করেছিল রুদ্র। টাপুর রুদ্রকে বলেছিল ব্যাপারটা। কারণ রুদ্রকে বলা যায়। ছোট থেকে রুদ্র টাপুরের দাদার মতো। টাপুর রুদ্রর স্কুলেই পড়ে এক ক্লাস নীচে। অবশ্য রুদ্র কমার্স আর টাপুর সায়েন্স।

রুদ্রই বাঁচিয়েছিল সেবার। ছেলেটাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কী করেছিল কে জানে। ছেলেটা আর শিমুলমুখো হয়নি। রুদ্রকে জিজ্ঞেস করাতে বলেছিল, "জানবি সব জিনিসের ওষুধ আছে। আমার বয়স হয়তো কম, কিন্তু আমি ওষুধগুলো জানি। আর ঠিকঠাক অ্যাপ্লাই করি।" রুদ্র এমনই, ভীষণই আপরাইট। কীভাবে কাজ হাসিল করতে হয় জানে। এইজন্যই তো টাপুর এত পছন্দ করে রুদ্রকে। ও মাঝে মাঝে ভাবে রুদ্র যদি ওর নিজের দাদা হত! ও রুদ্রর জন্য সব করতে পারে।

ওদের পাড়ার গলিতে শিমুল ঢুকে গেল। ওর নাকি পড়াশুনো করতে হবে। পারেও বাবা মেয়েটা। কিন্তু টাপুর এখনই বাড়িতে যাবে না। ওর মোবাইলের কার্ড ফুরিয়ে গেছে, রিচার্জ করাতে হবে। পকেটমানি হিসেবে ওর বরাদ্দ মাসে হাজার দেড়েক টাকা আর সাড়ে চারশো টাকার

মোবাইলের কার্ড। টাপুর জানে ইচ্ছে করলেই ওর বাবা ওকে পাঁচ হাজার টাকা হাতখরচও দিতে পারে। ওর বাবার লেদার এক্সপোর্টের বিজনেস, এ ছাড়া পেট্রল পাম্পও আছে একটা। বাটানগরের লোকে বলে যে ওর বাবা টাকার কুমির। বাটানগরে ওদের বাড়িটাই চারতলা। বাড়ির মধ্যে কিচেন গার্ডেন থেকে শুরু করে সুইমিং পুল সব আছে। ওরা ইচ্ছে করলেই কলকাতায় গিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু বাবার সব ব্যাবসাই এই অঞ্চলে। তা ছাড়া টাপুরের মা কলকাতায় থাকতেই পারবে না। এত জায়গা, বাড়ির সামনে বাগান, কলকাতায় পাবে কোথায়?

মোবাইলটা রিচার্জ করিয়ে দোকান থেকে বেরোতেই ছেলেটাকে দেখল টাপুর। আজও মোটরবাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায়ই দাঁড়িয়ে থাকে। টাপুর জানে অনেক ছেলেই ওকে দেখে কিন্তু এরকম রুটিন মেনে কেউ ওকে ফলো করে না। ডিসগাস্টিং! হঠাৎ রোখ চেপে গেলে টাপুরের। আজ একটা বুড়ো রোমিওকে টাইট দিয়েছে, এবার ছোঁড়া রোমিওর পালা। টাপুর সোজা এগিয়ে গেল মোটরবাইকের দিকে।

ছেলেটা বেশ লম্বা, মুখে একটা ওভার কনফিডেন্ট ভাব। টাপুর জানে এদের কীভাবে শায়েস্তা করতে হয়। ছেলেটার সামনে গিয়ে টাপুর গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল, "কী ব্যাপার বলো তো? তুমি সবসময় আমায় ফলো করো কেন?" কোনও আপনি টাপনি নয়, সোজা তুমি দিয়ে শুরু করল, যাকে বলে একেবারে অ্যাটাকিং মোড। টাপুর দেখল ছেলেটার চোখে মুখে একটা ভ্যাবাচ্যাকা ভাব। টাপুর বুঝল ছেলেটা এই আকস্মিক আক্রমণে ঘাবড়ে গেছে। ও আরও চেঁচিয়ে প্রশ্ন করল, "কী হল, বলছ না কেন? সবসময় বাইক নিয়ে আমায় ফলো করো কেন? কী মতলব তোমার? জবাব দাও।"

"না মানে... আমি মানে... তোমার পিঠটা ইয়ে..." ছেলেটা ঠোঁট চাটছে।

"পিঠ? আমার পিঠটা কী? ইতর, অসভ্য জানোয়ার ছেলে।" টাপুর তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করল।

"না, মানে... পিঠটা.. মন্দিরা বেদীর... মানে আমার পিসিমার কথা মনে পড়ছে..."

"আমার পিঠ দেখে পিসিমার কথা মনে পড়ছে? পারভার্ট।" ছেলেটা ভুলভাল বকছে দেখে টাপুর ওর গলার ভলিউম আরও দু'ঘর বাড়িয়ে দিল। প্রায় সন্ধে সাতটা বাজে। এই অঞ্চলটা লোকজনে ভরতি হয়ে আছে। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে অনেকেই বিনা পয়সায় সার্কাস দেখতে ভিড় জমিয়ে ফেলেছে। একজন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে। এই ছোকরা কি তোমায় বিরক্ত করছে?" টাপুর জানে সুন্দরী মেয়েদের সাহায্য করার লোকের অভাব পৃথিবীতে নেই। লোকটার দেখাদেখি আরেকজন এগিয়ে গিয়ে ছেলেটার কলার ধরল। "কী রে শুয়োরের বাচ্চা! মেয়েদের দেখলেই খচড়ামো করতে ইচ্ছে হয়? ইভটিজিং? অ্যাঁ?"

ছেলেটা এবার বলল, "আমি তো কিছু বলিনি। এখানে বসে ছিলাম। ওই তো এসে ধমক ধামক দিতে শুরু করল।"

"শুরু করল? অ্যাঁ, এমনি শুরু করল? মামদোবাজি?" লোকটা মারার জন্য হাত তুলল। টাপুর দেখল কেলেঙ্কারি, এমনটা হোক ও চায়নি। ছেলেটাকে একটু কড়কে দিলেই হত। এ তো রীতিমতো ঝামেলা শুরু হয়ে গেল। এর মধ্যে পরিচিত কেউ দেখে বাবাকে লাগিয়ে দিলেই সমস্যা হবে। বাবা ভালর ভাল, কিন্তু টাপুর সম্বন্ধে কোনও খারাপ রিপোর্ট এলে দারুণ রেগে যায়। টাপুর পৃথিবীতে এই একটা লোককেই ভয় পায়। টাপুর এবার সেই ভয়টাই পেল। কিন্তু ওর আর কিচ্ছু করার নেই, পুরো ঘটনাটাই ওর হাতের থেকে বেরিয়ে গেছে। সামান্য একটা ছেলেকে শিক্ষা দিতে গিয়ে পুরো কেসটাই জন্ডিসে কনভার্ট করেছে। এখন কী করে এটা সামলাবে টাপুর ভেবে পেল না।

ঠিক তখনই ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল একজন। একহারা চেহারা, গম্ভীর মুখ। এতদিন পরেও ওকে দেখেই টাপুরের পেটের মধ্যে প্রজাপতি ওড়াউড়ি করতে শুরু করে দিল, মনে হল কেউ যেন ওকে বড় ইলেকট্রিকের নাগরদোলায় চড়িয়ে দিয়েছে। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটাও

গতি বাড়িয়ে দিল হঠাৎ। টাপুর ওকে চেনে, খুব ভাল করে চেনে। ও পুরু।

বাটানগরের সাধারণ লোকেরা অনেকেই পুরুকে চেনে। ভাল ফুটবলার হওয়ার সুফল এখনও পায় পুরু। টাপুর অবাক হয়ে দেখল মারমুখী ভিড়টা পুরুর সামনে কেমন নেতিয়ে পড়ল। ছেলেটা যে পুরুর বন্ধু বুঝল টাপুর। অনায়াসেই বন্ধুকে বের করে নিয়ে গেল পুরু। ছেলেটার নাম শুনল কুশ। ছাড়া পেয়ে ফুল স্পিডে বাইক চালিয়ে কুশ বেরিয়ে গেল। আর থাকে? ভিড়টাও আর নেই। বিশেষ কিছু হল না দেখে পাবলিক একটু হতাশ হয়েছে, বুঝল টাপুর। দেখল ঝামেলা মিটিয়ে পুরুও চলে যাচ্ছে। এ সুযোগ ছাড়া যায় না। ও দৌড়ে গেল।

"আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব?" টাপুর পুরুর পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল।

"কিচ্ছু বলে নয়। তুমি বাড়ি যাও।"

"কেন, আমার সঙ্গে হাঁটতে আপনার খারাপ লাগছে?"

"হ্যাঁ। তুমি বাড়ি যাও।"

"আপনি এমন করে বলছেন কেন?"

"তুমি আমার সামনে থেকে যাও টাপুর।" পুরু এবার রূঢ় গলায় বলল।

"কিন্তু কেন? কবে কী হয়েছে সেটা এখনও মনে রেখে দিয়েছেন?" টাপুরের গলাটা ওর নিজের কাছেই অদ্ভুত শোনাল। পুরু আর কোনও কথা না-বলে পাশের রবীন্দ্র সুইমিং ক্লাবের অন্ধকার গলিতে ঢুকে গেল। টাপুর বুঝল বৃথা চেষ্টা। মনটা খারাপ হয়ে গেল। নাঃ এবার বাড়ি যাবে। কিচ্ছু ভাল লাগছে না। কেন যে সেদিন টাপুর অমন করেছিল! মাথায় যে কী ভূত চেপেছিল তখন! এখনও সেদিনের কথা মনে পড়লে লজ্জা পায় টাপুর।

বেশি নয়, বছর দুয়েক আগের কথা। সদ্য ফুটবল ছেড়ে পুরু তখন টিউশন শুরু করেছে। সে সময় পুরু এসেছিল টাপুরকে পড়াতে।

ইতিহাস আর বাংলা। টাপুর তখন ক্লাস নাইনে পড়ে। পড়াতে এসে পুরু খুব কম কথা বলত। যেটুকু পড়াতে গেলে দরকার তার বাইরে বিশেষ কথা বলত না। এককাপ চা-ও খেত না ওদের বাড়িতে। টাপুর দেখত একদম চুপচাপ মানুষ একটা। খুব অবাক লাগত ওর। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় বসে থাকা অল্পবয়সি কিন্তু গম্ভীর মানুষটার দিকে একটা কারণহীন টান অনুভব করত টাপুর। কোনও দিনও নিজের বয়সি ছেলেদের ভাল লাগত না টাপুরের। ভাবত ওর পছন্দের মানুষটা হবে গম্ভীর, ম্যাচিওর্ড। দুটো কথাতেই সে দু'হাজার মানে বুঝিয়ে দিতে পারবে।

টাপুরের মনে হয়েছিল পুরু সেরকমই। তখন সবসময় পুরুর কথা মনে পড়ত ওর। পুরু একদিন কামাই করলে পুরো পৃথিবীটাকেই তছনছ করে দিতে ইচ্ছে করত ওর। মাস পাঁচেকের মাথায় খুব সাহস করে একটা প্রেমপত্র লিখেছিল ও। তারপর ইতিহাস বইয়ের ভাঁজে রেখেছিল সেটা। বইটা সেদিন পুরুর নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। সে টাপুরের একটা টেস্ট নেবে, তার প্রশ্ন বানাবে সেখান থেকে।

সপ্তাহে দু'দিন টাপুরকে পড়াত পুরু। চিঠিটা দেবার পরের দিনে পড়ার দিকে তাকিয়ে বসে ছিল টাপুর। একই সঙ্গে ভাললাগা আর ভয় কাজ করছিল। খেতে বসে খিদে নেই, রাত্রে ঘুম আসতে চাইত না কিছুতেই। কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করত না। সারাদিন মনখারাপ হয়ে থাকত ওর। সবার সঙ্গে অকারণে ঝগড়া হত। সাইকেলের শব্দ পেলেই ভাবত পুরু এসেছে।

তারপর সত্যিই পুরু এল। সন্ধের দিকে সাইকেলের মৃদু ঘণ্টা শুনেই বুঝল টাপুর। পড়ার ঘরে যেতে পা যেন সরছিল না ওর। কিন্তু ঘরে গিয়ে দেখল সেই গম্ভীর চুপচাপ একটা মানুষ। সেদিন কী যে পরীক্ষা দিল টাপুর, ভগবান জানে! অশোক হয়ে গেল সমুদ্রগুপ্তের ছেলে। রানা প্রতাপকে নিয়ে গেল ঔরঙ্গজেবের সময়ে। হর্ষবর্ধন হয়ে গেল বাংলার প্রথম সুলতান। কিন্তু টাপুর দেখল পুরু চুপচাপ, যেন কিছুই হয়নি। একসময় পরীক্ষা শেষ হল। পুরু উঠে দাঁড়াল। চলে যাওয়ার ঠিক আগে

পুরু নরম কিন্তু গম্ভীর গলায় বলল, "টাপুর, এই চিঠিটা ফিরিয়ে নাও। আর এরকম কোরো না কখনও। তোমার সামনে বছর মাধ্যমিক। পড়ায় মন দাও।" ব্যস আর কিচ্ছু নয়। চিঠিটা ভাঁজ করে টেবিলে রেখে দিয়ে চলে গিয়েছিল ও। চোখ ফেটে জল এসে গিয়েছিল টাপুরের। এত অপমান! নিজেকে কী ভাবে ও? সাধুপুরুষ? টাপুরের ভালবাসার কোনও দাম নেই? দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা।

দু'দিন পরে টাপুরের বাড়ির কাজের লোক ডেকে নিয়ে গেল পুরুকে। টাপুরের মা আগুনের মতো মুখ করে বসে ছিল। বাবা সেসময় বাইরে গিয়েছিল কাজে। টাপুর মাকে বলেছিল পুরু ওকে নোংরা চিঠি লিখেছে। অনেক কু ইঙ্গিত-ভরা এক চিঠি। পুরুর হতভম্ব মুখ দেখে খুব আনন্দ হয়েছিল টাপুরের, ভেবেছিল বেশ হয়েছে। টাপুরের মা "ছোটলোক, ইতর, জানোয়ার" যা খুশি বলে অপমান করেছিল পুরুকে। পালটা একটা কথারও জবাব দেয়নি পুরু। মুখ নিচু করে উঠে গিয়েছিল শুধু। সেদিন সারারাত ঘুম আসেনি টাপুরের। বারবার মনে পড়ছিল শান্ত আর গম্ভীর একটা মুখ। জানলা দিয়ে ঠিকরে আসা জ্যোৎস্না ছড়ানো বিছানায় শুয়ে কখনও আনন্দে কখনও দুঃখে খুব কেঁদেছিল ও। এ কি জয় না পরাজয় বুঝতে পারছিল না ও। কারণ টাপুর জানত পুরু আর কোনওদিন ওদের বাড়িতে আসবে না।

বাবা ফিরে আসার পর মা সব বলেছিল বাবাকে। বাবা এসে টাপুরের কাছে চিঠিটা দেখতে চাইল। হাতের লেখাটা মিলিয়ে দেখল টাপুরের হাতের লেখার সঙ্গে। টাপুর হাতের লেখা পালটে চিঠিটা লিখেছিল। কিন্তু চিঠিটা যে নকল সেটা বাবার ধরতে সময় লাগল না। টাপুরকে দু'-চারটে প্রশ্ন করে বুঝেও নিল ব্যাপারটা। বরাবরের মতো টাপুর বাবার সামনে মিথ্যে বলতে পারল না। বাবার চোখ দুটোর দিকে তাকালে কেমন অবশ হয়ে যায় টাপুর।

সব শুনে বাবা ভীষণ রেগে গিয়েছিল। জীবনে প্রথমবার টাপুর চড় খেয়েছিল সেদিন। বাবা বহুদিন কথাও বলেনি টাপুরের সঙ্গে। পরে বাবা নিজে পুরুর কাছে গিয়ে টাপুরের হয়ে ক্ষমা চেয়ে এসেছিল। টাপুরও

পুরুর সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেছিল। পুরু কথাই বলেনি। টাপুর নিজের সব দোষ স্বীকার করেছিল। তবু পুরু একটুও নরম হয়নি। পাথরের মতো মুখ করে ফিরিয়ে দিয়েছিল টাপুরকে।

আজকেও ঠিক তাই হল। পুরু কি কোনও দিনও ভুলতে পারবে না ব্যাপারটা? টাপুর ওদের পাড়ায় ঢুকল। দেখল লোডশেডিং। বাটানগরে এই এক ঝামেলা। তবে ওর চিন্তা নেই। ওদের জেনসেট আছে। অন্ধকারের মধ্যে ওদের বাড়িটিকে আলো ঝলমলে জাহাজের মতো লাগল টাপুরের। বাড়ির দিকে দু'পা এগোতেই পেছন থেকে একটা গলা পেল টাপুর, "এই যে রেন ড্রপ! তোমার গানের খাতাটা ফেলে এসেছিলে, নিয়ে এসেছি।" ওফ্ আবার! পেছনে না-ঘুরেই টাপুর বুঝল গলাটা কার। কবীর আজও এসেছে!

৫

"ব্যানার্জি, দেবপ্রস্থ ব্যানার্জি।" ধুত আজকেও হল না। আসলে কোনও দিনই হয় না। তবু ডুডু চেষ্টা করে মাঝেমধ্যে। একা ঘরে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ধৈর্য ধরে বলে, "ব্যানার্জি, দেবপ্রস্থ ব্যানার্জি।" সেই কবে থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছে নিজের নামটা এভাবে বলার। মানে সিনেমায় যেভাবে শন কোনারি থেকে পিয়ার্স ব্রসনন বলেন, "বন্ড, জেমস বন্ড।" কিন্তু ডুডুর ভাল নামটাই এমন যে এভাবে বলতে গেলে পুরো ব্যাপারটাই মশাকে বারমুডা পরাবার মতো হয়ে যায়। ওর ঠাকুরদার রাখা নাম এই 'দেবপ্রস্থ'। আর যাতে সেটা দেবু না হয়ে যায় সেটার জন্যই ডুডু ডাকনামটা ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে। ঠাকুরদার মোটেই ইচ্ছে নয় দেবপ্রস্থ নামটার অপভ্রংশ হোক। অপভ্রংশ তো না হয় আটকানো গেল কিন্তু এই দেবপ্রস্থ নামটা নিয়েও রিসেন্টলি কম কথা শুনতে হয় না ওকে। কথা শোনা মানে অবশ্য এক জনেরই। সায়েকার।

মাস কয়েক আগে মেঘাদিদের বাড়িতে ডুডুর প্রথম আলাপ হয়েছিল

সায়েকার সঙ্গে। আলাপের দিনই সায়েকা ডুডুর ভাল নাম শুনে বলেছিল, "দেবপ্রস্থ? দেবদৈর্ঘ্য নয় তো? অবশ্য দৈর্ঘ্যপ্রস্থ হলেও খারাপ হত না।" প্রথম দিনের আলাপেই ডুডু বুঝেছিল খুব বিচ্ছু মেয়ে। তাই নিজের ডাকনামটা আর বলেনি বা বলা ভাল, বলার রিস্ক নেয়নি। কিন্তু তাতে অবশ্য ডাকনামটা বেশিদিন চাপা থাকেনি। ওই মেঘাদির কীর্তি।

মেঘাদি ডুডুদের পাশের বাড়িতে থাকে। মেঘাদি খুব ভাল নাচে। খুব ভাল মানে এমন ভাল যে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। এখন মেঘাদি বছরে দু'বার বিদেশে যায় প্রোগ্রাম করতে। সঙ্গে যায় মেঘাদির নাচের স্কুলের বাছাই করা ছাত্রীরা। ফলে মেঘাদির নাচের স্কুলে ভরতি হওয়ার জন্য খুব রাশ হয়। মাস কয়েক হল সায়েকা এসেছে মেঘাদির কাছে নাচ শিখতে। সায়েকা ক্লাস টেনে পড়ে কলকাতার নামকরা এক স্কুলে। ডুডু প্রায় রোজই মেঘাদির বাড়িতে যায়। মেঘাদির মা ডুডুকে ছোটবেলা থেকে নিজের হাতে মানুষ করেছে, আর ভালও বাসে নিজের ছেলের মতো। সেখানেই সায়েকার সঙ্গে ডুডুর আলাপ হয়েছে।

মেঘাদিকে ডুডু, পাখি পড়ানোর মতো করে বুঝিয়েছিল মেঘাদি যেন সায়েকার সামনে ওকে ডুডু বলে না ডাকে। কিন্তু মেঘাদির কি অত মনে থাকে? দু'-তিন দিন সামলে সুমলে থাকার পরে একদিন ভুল করে মেঘাদি বলে ফেলল, "এই ডুডু, আমায় বিক্রম ঘোষের 'রিদমস্কেপ'-টা দিয়ে যাবি তো।" আর যায় কোথায়? লোপ্পা বল পেলে কেউ ছাড়ে? তাও আবার সে যদি সায়েকা হয়?

নাচ শেষ করে সায়েকা তখন ঘরের আরেক কোনায় দাঁড়িয়ে কীসব বই নাড়াচাড়া করছিল। 'ডুডু' নামটা শুনেই এদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, "কী নামে ডাকলে মেঘাদি? ভুতু? এ বাবা সে তো জন্তু জানোয়ারদের নাম।" এ কী বিষাক্ত মেয়ে রে বাবা! মুখে কোনও রাখঢাক নেই? ডুডু যথেষ্ট গম্ভীরভাবে বলল, "তুমি কানে কম শোনো নাকি? নামটা হল ডুডু।" সায়েকা হাসল। ওফ্ মেয়েটা কেন যে হাসে! দাঁতগুলো যেন চন্দ্রানী পার্লস থেকে অর্ডার দিয়ে বানানো। তার ওপর থুতনিতে আলতো একটা ডিপ্রেশন। এরকম থুতনির মেয়ে

দেখলে ডুডু নিজেই একটু ডিপ্রেসড হয়ে পড়ে। এ মেয়ে পুরো 'ফুল অর কাঁটে, হৃদয় ফাটে' টাইপ। তো সেরকম ডিপ্রেশন ছড়ানো হাসি ছড়িয়ে সায়েকা বলল, "না কানে ঠিকই শুনি। আসলে জন্তুদের নাম শুনে অভ্যাস নেই তো। যাক তাও ভাল যে নামটা প্রেজেন্ট টেন্স। ডিড ডিড হলেই পাস্ট টেন্স হয়ে যেত।" ডুডু দাঁত কিড়মিড় করে রাগটা হজম করে নিয়েছিল। তারপর থেকে দেখা হলেই সায়েকা ওকে হ্যাটা করে। ওর যে কী পার্সোনাল এজেন্ডা আছে ডুডুর বিরুদ্ধে কে জানে?

ডুডুকে আজকেও ডেকে পাঠিয়েছে মেঘাদি। কিন্তু যাবে কিনা ভাবছে ও। কারণ আজকে সকাল থেকেই আবার সেই গন্ধটা পাচ্ছে ডুডু। বিরিয়ানির খুব কাছাকাছি একটা গন্ধ, কিন্তু ঠিক বিরিয়ানি নয়। কোত্থেকে যে গন্ধটা ও পায় ভগবান জানে। কিন্তু যেদিনই পায় সেদিনই একটা না-একটা ঝামেলা হয়। আজও পাচ্ছে। ডুডু একটু দমে গেল। জেমস বন্ড হওয়ার ইচ্ছেটাও আর নেই। ডিসেম্বরে টেস্ট পরীক্ষা তবু এখনও ক্লাস হচ্ছে। আজ রবিবার বলে স্কুল ছুটি। ডুডু জানে মেঘাদি কেন ডেকে পাঠিয়েছে। আজ ছাত্রীদের নিয়ে নিজেদের বাড়ির ছাদে পিকনিক করছে মেঘাদি। বাইরের লোক হিসেবে ডুডুই একমাত্র নিমন্ত্রিত। ডুডু জানে সায়েকা আসবে। আর ও যায়? কিন্তু এখন দেখছে মেঘাদি ছাড়বে না। বেলা প্রায় এগারোটা বাজে, তবু ডুডু এখনও যায়নি দেখেই ওকে ডেকে পাঠিয়েছে।

কিন্তু মনটা খচখচ করছে। গন্ধটা আজ আবার কী ঝামেলা পাকাবে কে জানে। ডুডু এসবে খুব বিশ্বাস করে। ডুডু নিজে জানে যে এসব সংস্কার। তবে কু না সু সেটা জানে না। ছোটবেলা থেকেই ডুডু নিজের ঠাকুরদার ন্যাওটা। ওর ঠাকুরদা পুরনো দিনের মানুষ। পুজো না-করে জল গ্রহণ করেন না। ডুডুও ওঁর সঙ্গে থেকে থেকে এসবে ভীষণ বিশ্বাসী। ঠাকুর দেবতা তো আছেই, এ ছাড়া পূর্ণিমা, অমাবস্যা, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ এসবও খুব মানে ও। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় ভরা কলসি দেখা ভাল, ডান পা আগে ফেলে রাস্তায় বেরোতে হয়, খাটের

সোজাসুজি আয়না রাখতে নেই, এক শালিখ খারাপ, দু'শালিখ ভাল, এসবও ডুডু মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। সবাই ওকে খেপায়, বলে বাস্তু বিশারদ, বলে প্রাইভেট চ্যানেলে কমণ্ডলু নিয়ে বসে পড়তে। কিন্তু ডুডু ওসব পাত্তা দেয় না, কারণ ও জানে এসব অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়।

তবে সবচেয়ে অদ্ভুত এই 'ঠিক বিরিয়ানি নয়' গন্ধটা। এই গন্ধটা ও যতবার পেয়েছে ততবারই কোনও না কোনও ঝামেলা হয়েছে। প্রথমবার যেদিন পেয়েছিল, ডুডুর পোষা কাকাতুয়াটা মারা যায়। দ্বিতীয় বারে ওর সাইকেলটা চুরি হয়ে গিয়েছিল। আর শেষবার গন্ধটা পেয়েছিল রবিন মেমোরিয়ালের সঙ্গে ম্যাচের দিন সকালে। ও তখনই ভেবেছিল কোনও ঝামেলা হবে। কিন্তু ম্যাচটা যে হেরে যাবে সেটা ভাবতে পারেনি। দিয়েগোটা সেদিন এমন ঝোলাল যে হেরেই গেল। অবশ্য হারতই হয়তো, শনিবারের বারবেলায় খেলাটা পড়েছিল যে। আর তার ওপর ছিল অমাবস্যা। কেউ বিশ্বাস করে না বটে কিন্তু হল তো?

মেঘাদিদের বাড়ির ছাদটা খুব সুন্দর। চওড়া পাঁচিল দেওয়া শ্বেতপাথর বসানো। তারই এক কোনায় আজ রান্নার আয়োজন করা হয়েছে। ডুডু ঢুকেই রান্নার গন্ধ পেল, চাটনি হচ্ছে। যাক সেই বিটকেল গন্ধটা আর নেই। মেঘাদি ডুডুকে দেখেই দৌড়ে এল, "কী রে সকাল থেকে কোথায় ছিলি? এদিকে তোকে খুঁজছি। একটা জরুরি কাজ আছে, করে দিতে হবে, পারবি?"

"কাজ করে দিতে হবে? ও কাজ করিয়ে নিয়ে তবেই খেতে দেবে?" ডুডু মুখে একটা দুঃখ দুঃখ ভাব এনে বলল।

"মারব এক থাপ্পড়, বাঁদর কোথাকার। যা বলছি শোন, সায়েকা আসেনি। তুই গিয়ে ওকে একটু নিয়ে আয়।"

"আমি? সায়েকাকে? খেপেছ? আর রাজ্যে লোক নেই? আর ও কী এমন ভি আই পি যে নিজে আসতে পারবে না?"

"আরে বলিস না! ওর বাবা সকালে কোন এক আত্মীয়ের বাড়ি গেছে। আর ওর মা একটা জিনিস। মেয়েকে কিছুতেই একা ছাড়বে না।

ভাবতে পারিস ক্লাস টেনের মেয়ে, থাকে পনেরো মিনিট দূরে, তাকে ছাড়বে না! সায়েকা তো ফোনে প্রায় কেঁদেই ফেলেছে। আমি ওর মাকে ফোনে বলে কয়ে রাজি করিয়েছি। বলেছি যে আমার এক ভাইকে পাঠাচ্ছি, ও সায়েকাকে নিয়ে আসবে, আবার পৌঁছেও দেবে। যা লক্ষ্মীটি, একবার সায়েকাকে নিয়ে আয়।"

ডুডু বুঝল 'ঠিক বিরিয়ানি নয়' গন্ধটার তাৎপর্য। মেঘাদিকে না করতে পারবে না ও। নাও এবার নিজের বাঁশ জঙ্গল থেকে নিজে কেটে আনো। সারাদিন ধরে হ্যাটা হও। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডুডু জিজ্ঞেস করল, "ওর বাড়িটা কোথায়?"

"সাহেব কলোনিতে। এফ ফোর বাংলো। ওর বাবার নাম অলিপকুমার জানা। গেটে গিয়ে জিজ্ঞেস করবি, দেখিয়ে দেবে।"

ও বাবা! সাহেব কলোনিতে থাকে নাকি? সে তো ঘ্যামা জায়গা। বাটা কোম্পানির টপ বসেরা ওখানে থাকে। পাঁচিল দিয়ে ঘিরে গোটা কতক বাংলো একেবারে আলাদা করা সেখানে। ওই কম্পাউন্ডের ভেতরে বাটার অফিসার্স ক্লাব, টেনিস কোর্ট, বাস্কেট বল কোর্ট। সবাইকে ওই কম্পাউন্ডে ঢুকতে দেয় না। "মেঘাদি, আমায় কি ওখানে ঢুকতে দেবে?" ডুডু ওর সংশয় জানাল।

"দূর বোকা! সায়েকার মা তো গেটে বলে রাখবে। তুই ফালতু চিন্তা করছিস। নে চট করে গিয়ে ওকে নিয়ে আয়।"

ডুডু বুঝল না করে কোনও লাভ নেই আর। ও বেরিয়ে পড়ল। আকাশটা যেন নীল টাইল্‌স্ বসানো এক সুইমিং পুল। যেন এখুনি একফোঁটা জল গায়ে এসে পড়বে। এর মধ্যে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে বেশ। শীত প্রায় চলে এল। এ সময় বাটানগর ভীষণ সুন্দর হয়ে ওঠে। চারিদিকে গাছপালার রং বদলাতে শুরু করে। সবুজ থেকে ধীরে ধীরে পাতারা লাল-হলুদ হয়ে ওঠে। আর সারাদিন অল্প অল্প করে পাতারা ঝরে পড়ে নীচে। রাস্তার দু'পাশে ধীরে ধীরে জমে ওঠে ঝরা পাতার স্তূপ। বিদেশ হলে একে বলা হত 'ফল'। কিন্তু এখানে বলা হয় হেমন্ত। সেই নামটাও দারুণ। এসবের মাঝে সকালে সাইকেল চালিয়ে টমাস

বাটা অ্যাভিনিউ দিয়ে যেতে ভালই লাগছিল ডুডুর। সাহেবদের তৈরি করা টাউনশিপ তো, সবকিছু এত মাপমতো আর সুন্দর যে ভাবা যায় না। বড় বড় সবুজ মাঠের মধ্যে লাল সাদা কোয়ার্টার, রাস্তার দু'পাশে গাছ, কালো মাখনের মতো রাস্তা। নিখুঁত। সাহেব কলোনি সেই গঙ্গার ধারে। ওর কম্পাউন্ডের ভেতরে অনেক আগে একবার ঢুকেছিল ডুডু। তারপর বহুদিন যায়নি।

সবই ঠিক আছে শুধু মনের মধ্যে খচখচ করছে সায়েকার কথা। দেখা হলেই তো আবার যা তা বলতে শুরু করবে। এত সুন্দর একটা সকালে ওসব বাঁকা বাঁকা কথা শুনতে ভাল লাগবে না। এসব ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল ডুডু, হঠাৎ কেউ ওর নাম ধরে ডাকাতে থতমত খেয়ে ও সাইকেল থামাল। আবার কে ডাকছে? সাইকেল থেকে নেমে ঘুরে দাঁড়াল ও। দেখল একটা লেডিজ সাইকেল নিয়ে রাস্তার অন্যদিকে দাঁড়িয়ে আছে পরী। রূপকথার নয়, মল্লিক বাজারের। মল্লিক বাজার বাটানগরের সবচেয়ে বড় বাজার। তার কাছেই তেরো হাত কালীর মন্দির। তার পাশের বাড়িটাই সুরজিৎদাদের। সুরজিৎদার বোনই হল পরী। পরী ডুডুর একদম ছেলেবেলার বন্ধু। একসঙ্গে বাটানগর নার্সারি স্কুলে ওরা পড়ত। নঙ্গী স্কুলে ডুডু ভরতি হয়েছে ক্লাস ফাইভে। কিন্তু পরী তো এখানে এখন থাকে না! ও তো দাদু দিদিমার সঙ্গে দুর্গাপুরে থাকে। সেখানে থেকেই হায়ার সেকেন্ডারি দেবে। ও হঠাৎ এখানে?

"কী রে পরী? তুই কবে এলি?"

পরী ওর সামনে এসে বলল, "গতকাল। সামনে ডিসেম্বরে টেস্ট তো, তাই এখন স্টাডি লিভ চলছে। তা তোদের ছুটি হয়নি এখনও?" ছুটি? মনে মনে ভাবল ডুডু, সেসব কী জিনিস? স্যারেরা পারলে টেস্টের আগের দিন পর্যন্ত ক্লাস নেন। ওরা ছুটির কথা বললেই বলেন এখন যা পড়ানো হচ্ছে সেগুলোই নাকি আসল। ডুডু ভাবে তা হলে সারাবছর কি নকল পড়াশুনো করল নাকি? জ্যাকসন তো সেদিন বাংলার স্যার সুনির্মলবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "স্যার, সবার ছুটি হয়ে গেছে, আমাদের হবে না?"

স্যার হেসে বললেন, " তুমি ছুটি নিয়ে কী করবে? পড়াশুনো তো কিছুই করো না।"

জ্যাকসন তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, "না স্যার, আমি প্রচণ্ড পড়াশুনো করছি।"

স্যার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বললেন, "তুমি .পড়াশুনো করছ? আই সুগার ইউ বোন টু বোন। তুমি পড়াশুনো করার ছেলে?" কথাটা মনে পড়াতে নিজের মনেই হেসে ফেলল ডুডু।

"কী রে পাগল নাকি? একা একা হাসছিস কেন? স্কুল ছুটি হয়নি এখনও?"

ডুডু অপ্রস্তুত মুখে বলল, "হয়ে যাবে, যে-কোনও দিন হয়ে যাবে। তা বল তোর কী খবর? এদিকে কোথায় যাচ্ছিস?"

"আরে তোর বাড়িতেই যাচ্ছিলাম। ভাগ্যিস তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।"

ডুডু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, "কেন?"

পরী বলল, "বলছি। আগে বল তুই কোথায় যাচ্ছিস?" ডুডু সংক্ষেপে বলল পুরোটা।

"তবে তো তোর দেরি হয়ে যাচ্ছে। চল তোর সঙ্গে যাই। যেতে যেতে তোকে বলছি।"

বাটা কোম্পানির গেট থেকে সাহেব কলোনি একটুখানি পথ। পরী কিছু বলার আগেই ওরা পৌঁছে গেল। ডুডু ভাবল পরীর আবার কী দরকার? বন্ধু মহলে একটা কথা সবাই জানে যে বেগার কাজের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত হল ডুডু। কারও হয়ে কোনও কাজ করে দিতে হবে? চলে যাও ডুডুর কাছে। ডুডু কী করবে? ওর সমস্যা হল ও কাউকে 'না' বলতে পারে না। নিজের হাজার অসুবিধা হলেও ডুডু কাজটা করে দেয়। এখানেও সেই ঠাকুরদার প্রভাব। ঠাকুরদা বলেন, "সাধ্যমতো মানুষের সেবা করতে হয়, তা হলে ঈশ্বর আশীর্বাদ করেন।" ভগবান হল ঠাকুরদার নুন। সব কথাতেই এক চিমটে-দু'চিমটে মিশিয়ে দেন।

সত্যি, সায়েকার মা সাহেব কলোনির গেটে বলে রেখেছিল। ডুডুদের

কলোনির ভেতরে ঢুকতে তাই অসুবিধা হল না। সায়েকা সাইকেল নিয়ে রেডি হয়েই ছিল। প্রথমে ও ঝোপঝাড়ের আড়ালে পরীকে দেখতে পায়নি। সামনে ডুডুকে দেখেই বলল, "তুমি এতটা ইরেস্পন্সিবল জানতাম না তো! আমি কখন থেকে ওয়েট করছি। আমি তো ভাবলাম দেবপ্রস্থ ইন্দ্রপ্রস্থের পথে রওনা দিয়েছে।" এই রে আবার শুরু হয়ে গেছে, প্রথম বলেই গুগলি। ডুডু বোকা হাসি দিয়ে বলটা কোনওমতে ব্লক করার চেষ্টা করল। ওই হাসি দেখে আরও কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল সায়েকা কিন্তু ডুডুর পেছনে পরীকে দেখে চুপ করে গেল ও। সায়েকার মা বলল, "শোনো ডুডু, ডুডুই নাম তো তোমার? তুমি কিন্তু সায়েকাকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে দিয়ে যাবে। দেরি না হয় যেন। আর সায়েকা, মেঘার ওখানে পৌঁছে আমায় একটা ফোন করে দেবে, কেমন!"

ডুডু ভাবল এত সতর্কতা কেন রে বাবা? মেয়ে প্রিয়াঙ্কা গাঁধী নাকি? আর সায়েকা যা এক পিস যন্তর, কেউ নেবে না। কারণ যে নেবে তারও তো নিজের প্রাণের ভয় আছে। নিজের হাড়ে স্বরচিত দুব্বো কে গজাতে চায়?

পথে সায়েকা একটা কথাও বলল না আজ। সেই সুযোগে ডুডু পরীর দরকারটা শুনল। ডুডুকে সন্ধেবেলা পরীর সঙ্গে যেতে হবে বাটানগর থেকে একটু দূরে সারেঙ্গাবাদ বলে একটা জায়গায়। সেখানে পরীদের কোন এক আত্মীয়ের বাড়ি। তাদের ওখানে পরীর কীসব দরকার আছে। দরকারটা কী ডুডু আর জিজ্ঞেস করল না, কারণ তা হলেই পরী হ্যাজাতে থাকবে। সারেঙ্গাবাদটা পরী একদম চেনে না। তাই আজ সন্ধেবেলা ডুডু গাইড ওর ভরসা।

মেঘাদিদের বাড়িতে পৌঁছে সায়েকা দ্রুত ওপরে উঠে গেল। পরী বলল যে ও সওয়া পাঁচটা নাগাদ মেঘাদিদের বাড়িতে চলে আসবে। দু'জনে সায়েকাকে ওর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে সারেঙ্গাবাদ যাবে। ডুডু দেখল প্ল্যানটা ভালই। কারণ ফেরার পথে পরী সঙ্গে থাকলে সায়েকা ওকে কাবু করতে পারবে না। ডুডু রাজি হয়ে গেল।

মেঘাদিদের বাড়ির তিনতলায় ছাদ। ডুডু ছাদে উঠে দেখল রান্না প্লাস আড্ডা বেশ জমে উঠেছে। ডুডুর খুব আউট অব প্লেস মনে হল নিজেকে। এতগুলো মেয়ের মধ্যে ও একা বসে কী করবে? কিন্তু চলে যেতেও পারবে না। তা হলেই মেঘাদি ক্যাঁক করে ধরবে। তবে কি টপ মেরে একটু ঘুরে আসার চেষ্টা করবে? এই ভাবতে ভাবতেই মেঘাদি ডুডুকে ডাকল, "অ্যাই ডুডু, এই গরমমশলাগুলো হামানদিস্তায় গুঁড়ো করে দে তো।" ডুডু ভাবল যাক কিছু একটা কাজ পাওয়া গেল। ডুডু ভারী হামানদিস্তা নিয়ে খুটুং খুটুং শুরু করল। যদিও কাজটা খুব প্লেজেন্ট নয় তবু হালকা মশলার গন্ধে বেশ ভালই লাগছিল ডুডুর। ও একমনে লবঙ্গ, বড় এলাচ, দারুচিনি গুঁড়ো করছিল হঠাৎ দেখল টাপুর ওর পাশে এসে বসল। টাপুর নাচ শেখে মেঘাদির কাছে। ও পাশে বসতেই ডুডু কাঁটা হয়ে রইল। ওরে বাবা এ মেয়ে যে ট্রান্সফরমার! এই মেয়ে গোটা বাটানগরে নানান কারণে বিখ্যাত। ডুডু বেশ কয়েকটা কারণ নিজেই জানে। ওর আবার কী দরকার? মশলার গন্ধের সঙ্গে টাপুরের শরীর থেকে ভেসে আসা পারফিউমের গন্ধ পাচ্ছিল ডুডু। সুরেলা গলায় টাপুর জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা ডুডুদা, গত ম্যাচটা যে তোমরা হারলে সেটায় কি সাবোটাজ ছিল?"

"মানে?" কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না ডুডু।

"মানে, শুনেছি তোমাদের দিয়েগো নাকি ইচ্ছে করে তোমাদের হারিয়ে দিয়েছে?"

"না না। তা হয় নাকি? দিয়েগো সেদিন ভাল খেলতে পারেনি এটা ঠিক। তার মানে এই নয় যে ইচ্ছে করে হারিয়ে দিয়েছে। কে রটাচ্ছে রে এসব?"

"রটাচ্ছে না, কথাটা আমাদের স্কুলেই শুনলাম।"

"বোগাস, একদম ফালতু কথা।" টাপুর ডুডুর উত্তরে চুপ করে রইল।

একটু পরেই আবার জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কবীর কেমন ছেলে বলো তো?"

"কবীর? কেন বল তো?" ডুডু কেসটা জানে। ও সাবধান হয়ে গেল।

"বলো না কেমন ছেলে?"

"ভালই তো। পড়াশুনোতেও ভাল, খেলাধুলোতেও ভাল। আমাদের স্কুল টিমের গোলকিপার তো ও-ই।"

"সে আমি জানি। আচ্ছা ও কি মুসলিম?"

"হ্যাঁ। আচ্ছা হঠাৎ এত প্রশ্ন করছিস কেন রে?" ডুডু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল। বলা যায় না, মেয়ে তো সুবিধের নয়।

"না এমনি। নাও তুমি মশলা গুঁড়ো করো। আমি যাই।" পাশের ঠোঙার থেকে দুটো এলাচ আর লবঙ্গ তুলে মুখে পুরে টাপুর আবার মেয়েদের আড্ডায় ফিরে গেল।

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে বেলা চারটে বেজে গেল। ডুডু বেশি খেতে পারে না, তবু সাধ্যমতো খেল। রান্নাটা ভালই হয়েছিল, তবে বাঁশকাঠি চালের ভাত তো, বেশ গলে গিয়েছিল। মেঘাদি রান্না কেমন হয়েছে জিজ্ঞেস করাতে ডুডু বলেছে, "মেঘাদি, এটা ভণ্ড টাইপ হয়েছে। মানে ভাতের মণ্ড আর কী।" তবে একটা ব্যাপারে ডুডু আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে, আজ সায়েকা একবারও ওকে হ্যাটা করেনি। ঠিকমতো কথাই বলেনি বলা যায়। এমনকী চোখে চোখ পড়লে চোখ সরিয়ে নিয়েছে। যাক গে, বাঁচা গেছে, কথা বলা মানেই তো মুরগি করার চেষ্টা। এতগুলো মেয়ের সামনে সেটা খুব ভাল হত না।

এখন দিন বেশ ছোট হয়ে গেছে, তাই খাওয়ার পরেই সবাই তিনতলার ছাদ থেকে নীচে নেমে এল। ডুডু মেঘাদিদের কাজের লোকটার সঙ্গে বাসনপত্র নীচে নামাল ধরাধরি করে। ঠিক সওয়া পাঁচটায় মেঘাদিদের কাজের মেয়েটা এসে বলল পরী বলে একজন ডুডুকে খুঁজছে। মেঘাদি ঘড়ি দেখে সায়েকাকে বলল, "এই, এবার যা, ডুডু তোকে পৌঁছে দেবে।" সায়েকা গম্ভীরভাবে বলল, "দরকার নেই, আমি একাই যেতে পারব।"

"চুপ কর। কাকিমাকে আমি কী উত্তর দেব? যা, পাকামো করিস না। ডুডু তোকে পৌঁছে দেবে। এরপর কিন্তু দেরি হয়ে যাবে।" সায়েকা আর কোনও কথা না-বলে নীচে নামতে লাগল।

পরী সাইকেল নিয়ে নীচেই দাঁড়িয়ে ছিল। ডুডুরা নামতেই ওরা একসঙ্গে রওনা দিল। এখন প্রায় সন্ধে হয়ে গেছে। চারিদিক ইলেকট্রিক আলোয় ঝলমল করছে। ডুডুর ছোটবেলাতেও কিন্তু এরকম এত দোকানপাট ছিল না। তখনও বাটানগর ছিল এক টিমটিমে মফস্‌সল। আর এখন প্রায় কলকাতার মতোই লাগে। আর পিন কোডও তো কলকাতার। বৃহত্তর কলকাতার।

পরী এবার আর সাহেব কলোনির ভিতরে ঢুকল না। বলল, "যা তুই ওকে ছেড়ে আয়, আমি ওয়েট করছি। একটু তাড়াতাড়ি আসিস কিন্তু।" ডুডু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে সায়েকার সঙ্গে কলোনির কম্পাউন্ডে ঢুকে গেল।

ডানদিকে দুটো টেনিস কোর্ট আর বাঁয়ে কাঠের রেলিং দেওয়া সার সার সাদা বাংলো। সায়েকাদের বাংলোটা একটু ভিতরের দিকে। রঙ্গন গাছের ঝোপ পেরিয়ে সায়েকা ওদের বাড়ির সামনে সাইকেল থেকে নামল। ডুডু দেখল সায়েকার মুখটা এখনও গম্ভীর। ডুডু বলল, "ঠিক আছে তা হলে, আমি আসি?"

সায়েকা বাড়ির ভেতরে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল, অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর দিল, "হ্যাঁ যাও, তাড়াতাড়ি যাও, একজন অপেক্ষা করছে।" ওর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে ডুডু চলে না-গিয়ে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল, বলল, "মানে?"

সারাদিন পর এবার ঝড়টা এল। সায়েকা চট করে মুখ ফেরাল। ওদের বারান্দার আলোয় ডুডু দেখল সায়েকার নাকের মাথা লাল হয়ে উঠেছে আর চোখের কোণ চিকচিক করছে। সায়েকা রাগ আর কান্না মেশানো গলায় বলল, "সবসময় শুধু মানে আর মানে। ঘটে কি একটুও বুদ্ধি নেই? আর আমি এতই খারাপ যে আমার সঙ্গে আসতে হলে বডিগার্ড লাগে। অন্য মেয়েদের সঙ্গে সারাক্ষণ পুটুর পুটুর। আর আমি? আমার কোনও দাম নেই, না? যাও, এখানে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন? পরী হুরিরা তো সব অপেক্ষা করছে। যাও।"

চোখের চিকচিকে জিনিসটা এবার গড়িয়ে নেমে এল গালে। সায়েকা

সাইকেলটা বারান্দায় রেখে ঘরের মধ্যে ঢুকে দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা।

"আমার কোনও দাম নেই?" মানে? এর মানে কোন ডিকশনারিতে আছে? মাথা নিচু করে ফিরে যেতে লাগল ডুডু। ভাবল, চোখের চিকচিকে জিনিসটা কি ডি বিয়ারস-এর, না আসমির? কার হিরে? এই হিরে মুক্তোর মেয়েটার কোনও দাম নেই? কার কাছে নেই? ডুডুর কাছে?

৬

আজ স্কুল জীবন শেষ হয়ে গেল কবীরদের। মাত্র চার পিরিয়ড ক্লাস হয়েছে। কবীরের মনটা বেশ খারাপ হয়ে আছে। এই হলুদ স্কুল বিল্ডিং, এই পাঁচিল ঘেরা বিশাল কমপাউন্ড, এইসব স্যারেরা, আর কোনওদিন পড়া হবে না এখানে। আর কোনওদিন শুনতে পাবে না সকাল এগারোটায় স্কুলবাড়ির থেকে জেগে ওঠা জাতীয় সংগীত। দেখতে পারবে না পাশের পুকুরের ওপর ঝুঁকে-পড়া খেজুর গাছের ওপর বসে থাকা মাছরাঙা। আসলে সব কিছুরই শেষ আছে জীবনে। শুধু স্মৃতির কোনও শেষ নেই।। কবীর স্কুল কম্পাউন্ডের বাইরে এসে একবার ফিরে তাকাল। এই স্কুলে আর পড়তে আসবে না ভাবতে খারাপ লাগছে। কিন্তু কী করা যাবে?

"কী বস স্কুলটা দেখছিস কেন? ছেড়ে চলে যেতে মায়া হচ্ছে? তা হলে টেস্টে গাড্ডু মার। আর এক বছর এই দৃশ্য দেখতে পাবি।" জ্যাকসন হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে বলল। কবীর মনে মনে ভাবল এটা জন্ম উল্লুক। ও শুধু বলল, "তোকে কদ্দিন বলব যে 'বস' বলে ডাকবি না কাউকে। এটা খারাপ কথা।"

"খারাপ কথা? ভাগ! ঢপ মারলেই হল, না? কী খারাপ কথা এটা?" জ্যাকসন তেরিয়া হয়ে বলল।

"বি ও এস এস-এর পুরো কথাটা হল ব্রাদার অব সেক্সি সিস্টার। বুঝলি ছাগল?"

"ওমা তাই নাকি? ও তোর বোন নেই বলে বলতে বারণ করছিস?"

কবীর আর উত্তর দিল না। কারণ ও শুরু করলেই জ্যাকসন হেজিয়ে লাট করে দেবে। তবে একটা ভাল ব্যাপার যে স্কুল শেষ হলেও প্র্যাকটিস পুরো দমে চালু থাকবে। কারণ সামনে সরস্বতী পুজোর আগের দিন রবিন মেমোরিয়ালের সঙ্গে ওদের ফিরতি ফুটবল ম্যাচ। এবার কবীররা এক গোলে হেরেছে। সামনের বার অন্তত দু'গোলের মার্জিন রেখে ওদের জিততে হবে। কারণ হোম অ্যাওয়ে পদ্ধতিতে ম্যাচ তো, দুটো ম্যাচের স্কোরের যোগফলের ভিত্তিতেই জয় পরাজয় ঠিক হবে। দু'গোলের ব্যবধানে জেতা অত সহজ নয়। সহজ হত যদি দিয়েগোটা ঠিকঠাক খেলত। কিন্তু গত ম্যাচে যা নমুনা দেখাল, তাতে একটুও ভরসা পাচ্ছে না কবীর। ও নিজে গোলকিপার। আর যাই হোক সামনের ম্যাচে ওর অন্তত গোল খাওয়া চলবে না। আর তার জন্য চাই জান কবুল প্র্যাকটিস। কবীর একটা ব্যাপার বোঝে যে বরণ সিনহা স্যার খুব চেষ্টা করছেন, কিন্তু ফুটবলটা ওঁর লাইন নয়। উনি পারছেনও না। একজন ভাল গেমস স্যার যদি থাকত দারুণ হত।

"আই কবীর, কোথায় যাবি এখন? আজ তো তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল, চল না একবার গ্যাজনখানায় যাই সবাই মিলে।" ডুডু স্কুল গেট থেকে বেরিয়ে এসে বলল। কবীর দেখল ওর পেছনে দিয়েগো দাঁড়িয়ে। দিয়েগোকে দেখিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "দেখ ডুডু, ও থাকলে আমি নেই। ওই নোংরা ছেলেটা যেখানে থাকবে সেখানে তোরা যা, আমি যাব না।"

দিয়েগো এবার মুখ খুলল, "ফালতু কথা বলবি না কবীর। অনেকদিন থেকে এই কথাটা বলছিস। খারাপ দিন কার না আসে? আর ভুলে গেলি আগের ম্যাচগুলো? নমকহারাম।"

"কে নমকহারাম? কবীর আহমেদ না দয়ারাম আংরে? বেশি কথা বলিস না। সেদিন মাঠে কী হয়েছিল সারা বাটানগরের লোক দেখেছে।

কাউকে কাটাতে পারছিলি না, না কাটাচ্ছিলি না? আমাকে ধাক্কা মারিসনি?" কবীর প্রায় তেড়ে গেল দিয়েগোর দিকে।

এবার জ্যাকসন ফোড়ন কাটল, "তোর মতো তালকানা গোলকিপার থাকলে দিয়েগো কী করবে?"

"তুই চুপ কর।" কবীর খিঁচিয়ে উঠল।

"মামার বাড়ি না? উনি চিল্লিয়ে পাড়া বেপাড়ার কাক জড়ো করে ফেলবেন আর আমি কথা বলব না? আমার গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ? কী করবি আমি কথা বললে? জানিস আমার পিসেমশাই দারোগা?"

"তোর পিসেমশাই দারোগা আর তোর মাথাটা দা মোটা। বারবার ক্যানালের মতো পিসেমশাই দারোগা বলিস কেন? আর ফুটবলটা কেমন খেলিস আমি দেখিনি? শট মারতে গিয়ে বল না-মেরে মাটি উপড়ে তুলিস। চাষা না ফুটবলার বোঝা মুশকিল।"

"কী বললি! আমি চাষা? আমি চাষা হলে তুই চাষের বলদ।" জ্যাকসন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল।

"চুপ কর তোরা। অনেক হয়েছে। রাস্তায় এভাবে সিন ক্রিয়েট করিস না।" ডুডু চিৎকার করে থামিয়ে দিল ওদের।

কিন্তু কবীর তাও বলল, "দেখ দিয়েগো, একটা কথা কিন্তু আমার কানে এসেছে যে তুই নাকি সেদিন ইচ্ছে করে ম্যাচ ছেড়েছিলি। যদি এটা সত্যি হয়, তবে তোর কপালে দুঃখ আছে।" কবীর আর দাঁড়াল না, হনহন করে হাঁটা দিল।

কবীর সব কিছু সহ্য করতে পারে কিন্তু হিউমিলিয়েশন সহ্য করতে পারে না। রাস্তাঘাটে যেখানেই যায় সেখানেই সবাই বলে যে ওরা হেরো। আজ দিয়েগোর সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করত, কিন্তু জ্যাকসন ব্যাটা এসে সব গুলিয়ে দিল। সত্যি, জ্যাকসন কোন ধাতু দিয়ে গড়া খোদায় জানে। আজ স্কুলের শেষ দিন ছিল, আর গামবাটটা আজও ক্লাসে একটা গন্ডগোল পাকিয়েছে।

ক্লাসটা ছিল হেডস্যারের। স্যার ওদের কমার্সের যে অঙ্ক পেপারটা

আছে সেটা নেন। কিন্তু আজ আর পড়াশুনো নয়, স্যার এমনিই গল্প করছিলেন। নিজের জীবনের গল্প, স্কুল জীবনের গল্প, এই স্কুলের গল্প এইসব। বলতে বলতে সবাইকে ভাল করে পড়াশুনো করার কথাও বললেন। বললেন এইচ এস খুব ইমপর্টান্ট পরীক্ষা। সারাজীবনের পড়াশুনো নির্ভর এই রেজাল্টের ওপর। এই কথা বলে গিয়ে দাঁড়ালেন দিয়েগোর সামনে, বললেন, "তুমি ভাল খেলোয়াড়, কিন্তু পরীক্ষায় ভাল লিখে তোমায় লেখোয়ার হয়ে উঠতে হবে।" দিয়েগোর পাশেই বসে ছিল জ্যাকসন। ব্যস যায় কোথায়? ফস করে বলে বসল, "আর স্যার, যারা খুব জানে, সব জানে, প্রচণ্ড জানে তারা কী হবে, জানোয়ার?" স্যার থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

ঘটনাটা মজার হলেও কেন জানে না মজা লাগল না ওর। সব কিছুই কেমন পানসে লাগছে আজ। তাই এদিক ওদিক না-গিয়ে বাড়িতে ফিরে বিকেল অবধি চুপচাপ শুয়ে রইল কবীর। ও ঝগড়া করতে চায় না, কিন্তু কী করে জানি হয়ে যায়। বিশেষ করে আজকাল দিয়েগোকে দেখলেই কেমন মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে।

বিছানায় শুয়ে দুপুরটা বড় নিঝুম মনে হল কবীরের। ওদের বাড়ির দোতলায় ওর ঘর। জানলার ধারে ওর খাট। ও শুয়ে শুয়ে দেখছিল লম্বা লম্বা সুপুরি গাছ, দু'-চারটে তালগাছের মাথা আর তার মধ্যে দিয়ে উঁকি মারা পুরনো মন্দিরের চুড়ো। কাঁচা হলুদ রঙের রোদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে লেগে আছে এই সব কিছুর গায়ে। বহু দূরে আকাশে কয়েকটা চিল চক্কর মারছে গোল করে। জানলার পাশের বেলগাছের ডাল থেকে একটা কাঠবেড়ালি ওর দিকেই তাকিয়ে আছে যেন। আচ্ছা, আজ এই যে কবীরের মন খারাপ, কাঠবেড়ালিটা কি বুঝতে পারছে? ওর এই প্রায়-আঠারো বছরের দুপুরটা তো কোনওদিন ফিরে আসবে না আর! একসময় তো ও বুড়ো হয়ে যাবে, তখন কি ওর মনে পড়বে এইসব দিনের কথা? এই স্কুল, এই বন্ধুরা আর টাপুরের কথা? তখন কি এসবের আর কোনও গুরুত্ব থাকবে ওর কাছে? একবার ক্লাস নাইনে পড়ার সময় সন্দীপ স্যার বলেছিলেন সমস্ত ঘটনার ছবিই নাকি আলোর

মধ্যে থেকে যায়। মানে, যদি ধরে নেওয়া যায় যে অ্যানড্রোমিডা নক্ষত্র থেকে পৃথিবীকে এখন দেখা যাবে, তা হলে নাকি এই ২০০৫ সাল নয়, দেখা যাবে আকবর বাদশার শাসন চলছে। কিন্তু এ-সবই হাইপোথিসিস। সত্যি যদি এমন কিছু দেখার কোনও যন্ত্র থাকত! তা হলে কি কবীর আলোয় জমে থাকা এই সময়টাকে দেখত না আবার? ও কি দেখত না ওর স্কুলকে? ওর বাটানগরকে? ওর বন্ধুদের? ওর কি মন খারাপ হত না টাপুরের ছবি দেখে?

ধড়মড় করে খাটে উঠে বসল কবীর। কীসব আবোল তাবোল চিন্তা করতে করতে ঘুম এসে গিয়েছিল। এর নাম কি 'ডুডু সিনড্রোম'? একবার ঘড়ি দেখল ও। প্রায় চারটে বাজে। আর ঝিমোলে হবে না। ও উঠে পড়ল। স্কুল থেকে এসে মন খারাপ থাকায় কিছু না-খেয়ে শুয়ে পড়েছিল। এখন পেটবাবাজি জানান দিচ্ছে। মাকে খাবার দিতে বলবে।

বারান্দায় বসে মায়ের দেওয়া নারকোল কোরা আর চিনি দিয়ে মুড়ি খেল কবীর। দারুণ লাগে। এবার গানের ক্লাসে যেতে হবে ওকে। গানের ক্লাস মানে রবীন্দ্রসংগীত শেখার ক্লাস। কবীরের মোটেই গানে তেমন ইন্টারেস্ট নেই। এ হচ্ছে গুঁতো, প্রেমের গুঁতো। যখন গানের ক্লাসে সোমাদি ঠিকমতো সম লাগাতে বলে কবীরের বিষম খাওয়ার জোগাড় হয়। যখন 'এসেছিলে তবু আসো নাই' গানটার অন্তরা ধরতে বলেন, ভয়ে ঘামতে ঘামতে কবীরের ইচ্ছে হয় পাশে বসে থাকা অন্তরা বোসকে চেপে ধরে। কবীর মাঝে মাঝে ভাবে, "ও টাপুর! আমায় দিয়ে আর কী কী করাবে? রবি ঠাকুর থাকলে আমার গান শুনে গান লেখাই ছেড়ে দিতেন।" একবার সোমাদি বলেছিল, "কবীর, তুই রবীন্দ্রনাথের গানগুলো ওঁর মতো করে না-গেয়ে আপাচে ইন্ডিয়ানের মতো করে গাইছিস কেন?" কবীর বলতে যাচ্ছিল অন্তত আপাচে ইন্ডিয়ানের মতো তো হচ্ছে। কিন্তু টাপুর ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে ও আর কিছু বলতে পারেনি। কিন্তু তবু এরকম হেনস্থা মাঝে মধ্যেই হয় কবীরের। আর এই সমস্ত অপমান, মন খারাপ কবীর মনে মনে টাপুরকে উৎসর্গ করে। বলে, "তোমার জন্যই আমি এত কষ্ট সহ্য করি। একমাত্র তোমার

কাছাকাছি থাকব বলেই আমি রোজ এখানে অপমানিত হতে আসি।”

টাপুর কবীরের কাছে যে কী সেটা ও ঠিক কাউকে বোঝাতে পারে না। আসলে বোঝাবে কী করে, সব কি বোঝানো যায়? প্রথম সমুদ্র দেখলে কেমন লাগে বোঝানো যায়? না বহুদিন প্রচণ্ড গরমের পর শহর আবছা করে যখন বৃষ্টি আসে তখন কেমন লাগে তা বোঝানো যায়! এই না-বোঝানোর ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল সেই সময় যখন কবীর প্রথম টাপুরকে দেখেছিল বাটা রিক্রিয়েশন ক্লাবের একটা ফাংশনে। কবীর সেই অনুষ্ঠানটা দেখতে গিয়েছিল। সেখানে একটা নাচ নেচেছিল টাপুর। “পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে” গানের সঙ্গে ছিল নাচটা। সেই নাচ দেখে কবীরেরই পাগল হওয়ার জোগাড়। সেই যে কবীরের সব গণ্ডগোল হয়ে গেল আর তা ঠিক হয়নি।

সেই নাচের পর খোঁজ শুরু করেছিল কবীর। টাপুর কোথাকার মেয়ে, কোথায় থাকে, কোন স্কুলে পড়ে, সব কিছু জানতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল কবীর। এরকম একটা মেয়ে বাটানগরে থাকে অথচ ওর চোখে পড়েনি, কীভাবে সেটা সম্ভব তাই ভাবত কবীর। অবশ্য পড়ার কথাও নয়। কবীরের সারাটা জীবনই ছিল পড়াশুনো আর ফুটবল। ওর বন্ধুরা ওকে ‘ইনঅ্যানিমেট’ বলে খেপাত। কিন্তু সেই নাচ ঘুরিয়ে দিল কবীরের মাথা। জীবনও।

কিছুদিনের ফেলুদাগিরির পর ও জানতে পারল যে টাপুর ভীষণ বড়লোকের মেয়ে। রবিন মেমোরিয়ালে পড়ে, ক্লাস ইলেভেনে। এ ছাড়া ও নাচ শেখে মেঘাদির কাছে আর গান শেখে সোমাদির কাছে। নাচের খবরটার সোর্স হচ্ছে ডুডু। একমাত্র ডুডুকেই ও বলেছিল টাপুরের ব্যাপারে। ডুডু তো শুনেই বলে দিয়েছিল, “তুই এ কী করছিস কবীর? এ পুরো বিষ জিনিস। তুই এমন লাথি খাবি না যে সারাজীবন আর খিদে পাবে না। বাটানগরে আর মেয়ে ছিল না?” কিন্তু যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। কবীর মাছের চোখ ছাড়া আর কিছু দেখছে না। যে-করেই হোক ওকে টাপুরের কাছাকাছি যেতে হবে। উপায়? হয় নাচ নয় গান। নাচ শেখার রিস্কটা আর কবীর নেয়নি। ওটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। তার চেয়ে গান ভাল।

সোমাদি তো প্রথমে নেবেই না, বলল, "তুই যে-ব্যাচে ভরতি হতে চাইছিস সেখানে সবাই বেশ ভাল গায় আর তুই সবে শুরু করবি। এ হয়?" হয় মানে? হয়ে আছে। কবীর অনেক বুঝিয়ে না-পেরে স্ট্রেট সোমাদির পায়ে পড়ে গিয়েছিল। এক সপ্তাহ ধরে রোজ সোমাদির কাছে যেত ও। শেষ অবধি ফল মিলল। সোমাদি কবীরকে নিল ওই ব্যাচেই। শর্ত হল সবার ফাঁকে ফাঁকে সোমাদি কবীরকে একটু একটু শেখাবে। কবীর প্রায় বলেই ফেলেছিল যে না-শেখালেও চলবে, কারণ গান শিখতে কে চায়?

কিন্তু এত সাধনার ফল কী হল? না, লবডঙ্কা। ও কত চেষ্টা করে টাপুরের সঙ্গে কথা বলার, কিন্তু টাপুর পাত্তাই দেয় না। প্রথম দিন কথা বলতে গেলে টাপুর কবীরকে জিজ্ঞেস করেছিল, "তুমি কবীর? তা তুমি কবীরের দোঁহা জানো?" দোঁহা শুনে হাঁ করে তাকিয়েছিল কবীর। টাপুর মুচকি হেসে চলে গিয়েছিল। অনেক খুঁজে পেতে সন্ত কবীরের দোঁহার বই জোগাড় করেছিল কবীর। মুখস্থও করেছিল বেশ কিছু। কিন্তু তারপর একদিন দোঁহা শোনাতে গেলে টাপুর জিজ্ঞেস করেছিল, "কবীর সুমনের গান জানো তুমি? ওই যে 'সারারাত জ্বলেছে নিবিড়' গানটা?" জ্বালালে দেখছি। কে সারারাত জ্বলেছে তাতে ওর কী? ও যে জ্বলছে সেটার খবর কেউ রাখে! কিন্তু কী করবে, টাপুর বলেছে, খুব খুঁজে ক্যাসেটটা জোগাড় করল। গানটাও মোটামুটি তোলার চেষ্টা করল। একদিন শোনাতে যাবে দেখল টাপুর তো শুনছেই না, উলটে প্রশ্ন করল, "বলো তো কবীর বেদী জেমস বন্ডের কোন সিনেমায় অ্যাকটিং করেছে?"

ডুডু সত্যি কথাই বলেছে, এ সাংঘাতিক জিনিস। কবীর বুঝল একে ইমপ্রেস করা অসম্ভব। পৃথিবীর যাবতীয় কবীরের ঠিকুজি নিয়ে এ-মেয়ে বসে আছে। তাই আর ভ্যানতারা করে সময় নষ্ট না-করে সোজাসুজি টাপুরকে প্রোপোজই করে ফেলল একদিন। সেদিন সোজাসুজি টাপুরকে কবীর বলেছিল যে ওর টাপুরকে খুব ভাল লাগে। ওকে ছাড়া কবীর আর কিচ্ছু চিন্তা করতে পারে না। কবীরের রাত্রের ঘুমটুম সব নষ্ট হচ্ছে এইজন্য। এখন কবীর চায় যে টাপুরও ওকে পছন্দ করুক। কথাটা শুনে

টাপুর অদ্ভুতভাবে হেসেছিল যার একটাই মানে হয়— কুঁজোর চিত হয়ে শোয়ার ইচ্ছে হয়েছে, আর একটা মানে হয় যে ও ভেবে দেখতেই পারে। কিন্তু এর কোনটা ঠিক? টাপুরকে সেটা জিজ্ঞেস করার আগেই টাপুর প্রশ্ন করেছিল, "তুমি হঠাৎ আমায় প্রোপোজ করলে কেন? যাক গে, ওসব হয়েই থাকে, বাদ দাও। আচ্ছা বলো তো সঞ্জীবকুমারের কোন সিনেমায় নাম হয়েছিল কবীর?"

কবীর হাল ছাড়েনি। এই তো সেদিনও টাপুরের বাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ও। সোমাদির কাছে গানের খাতা ফেলে এসেছিল টাপুর। কবীর ওটা নিয়ে এসেছিল। পরদিন খাতাটাই ফেরত দিতে গিয়েছিল। খুব গোপনে টাপুরের যে আদরের নামটা ও দিয়েছে, সেই 'রেন ড্রপ' নামে ডেকেওছিল টাপুরকে। টাপুর যেন শুনতেই পায়নি এমন ভান করেছিল। খুব অবহেলায় মরা নেংটি ইঁদুর ধরার মতো দু'আঙুলে বইটা ধরে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। কেন জানি না ভীষণ অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল টাপুরকে। কবীরকে ধন্যবাদ তো দূরে থাক, এমনি কোনও কথাও বলেনি। গোটা ব্যাপারটাই কেমন উচ্ছে সেদ্ধর মতো হয়ে গিয়েছিল কবীরের কাছে।

কবীর আবার বর্তমানে ফিরে এল। সোমাদির ক্লাসের সময় হয়ে এল প্রায়। ও তাড়াতাড়ি সাইকেল বের করল। টাপুরের সামনে সোমাদি ওকে লেট নিয়ে কিছু বলুক ও চায় না।

সোমাদ্দির গানের ক্লাস চ্যাটার্জি পাড়ায়। ওদের বাড়ি থেকে যেতে একটু সময় লাগে। সাইকেল নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল কবীর। কিন্তু সাইকেলে উঠেও যেতে পারল না। ওর কাবাবে মূর্তিমান হাড্ডির মতো হাজির হল নারুকাকা। নারুকাকা হল কবীরদের বাড়ির কন্সট্যান্ট ফ্যাক্টর। নারুকাকা কোনও চাকরিবাকরি করে না। ওর বাবা একটা হাওয়াই চটির ফিতে তৈরির ফ্যাক্টরি করে দিয়েছিলেন, নারুকাকা এখন সেটাই দেখাশুনো করে। দেখে অবশ্য নামেই। কারণ নারুকাকার কাজই হল সবার সব ব্যাপারে নিজের ছোট্ট বড়ির মতো নাকটা গলিয়ে দেওয়া। সারাদিন ঘুরে ঘুরে কোথায় ঝামেলা হচ্ছে, কোন বুড়োবুড়িকে তাদের

ছেলেমেয়েরা বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে, কোন মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, নারুকাকা এসব খুঁজে বেড়ায়। আর কবীরের বাবা যেহেতু উকিল, নারুকাকা ওর কাছে হয় কি নয় ছুটে আসে লিগাল অ্যাডভাইস নিতে। এখনও নিশ্চয়ই সেরকম কোনও কেস।

নারুকাকার 'কয়লার সঙ্গে কেস চলছে' টাইপের কালো মুখটা দেখে কবীরের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। কবীরকে দেখেই নারুকাকা বলল, "এই যে সন্ত কবীর! কী খবর?" এই সন্ত কবীর নামে কেউ ওকে ডাকলেই কবীরের মাথা গরম হয়ে যায়। এখনও গরম মাথাটা আরও তেতে গেল ওর। কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে ও বলল, "কী ব্যাপার নারুকাকা?"

"আর বলিস না, এক ঝামেলায় পড়েছি। আমাদের পাশের বাড়ির ছেলেটা একটা কাণ্ড করেছে। একটা বাচ্চামতো মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছে। গতকাল রাতের ঘটনা এটা। মেয়ের বাপ তো খুঁজে পেতে আজ দুপুরে এসে হাজির। সঙ্গে একগাদা পুলিশ আর লোকজন। ছেলেটাকে ধরে নিয়ে যাবে। কী? না, মেয়ের নাকি আঠারো বছর হয়নি এখনও। এদিকে মেয়েটা বেঁকে বসেছে, বলছে ওর আঠারো হয়ে গেছে। আরে গন্ডগোলটা করেছে কোথায় জানিস? মেয়েটা মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডটা বাড়িতে ফেলে এসেছে। ওটাই তো এজ প্রুফ।"

কবীর ভাবল ওকে এসব বলছে কেন? ওদিকে সোমাদির গানের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে বোধহয়। নারুকাকা আবার জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁরে কালামদা আছেন?" কালামদা মানে কবীরের বাবা। খুব নামকরা উকিল। কিন্তু বাবা তো বিকেলে বাড়িতে থাকে না। সেটা তো নারুকাকার জানাও উচিত। কবীর সেটাই বলল। সব শুনে নারুকাকা বলল, "ও, তাই তো, ভুলেই গেছি। ঠিক আছে বউদির সঙ্গেই দেখা করে যাই।" কবীর ভাবল মা আবার কবে থেকে উকিল হল? আসলে বিকেলের চা-কেস আছে। যাক গে, কবীর আবার সাইকেলে উঠেছে আর নারুকাকাও বাড়ির ভেতরে ঢুকবে, এমন সময় ঘটনাটা ঘটল।

রাস্তা দিয়ে একদল ইয়াং ছেলে যাচ্ছিল, ওরা নারুকাকাকে দেখে

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, "গুড় চা, অ্যাই গুড় চা।" ব্যস কুরুক্ষেত্র! নারুকাকা নিমেষের মধ্যে ঘুরে দাঁড়াল আর তারপরই অকথ্য গালাগাল শুরু করল। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর বাচ্চাদের সঙ্গে পটাপট· ছেলেগুলোকে মিলিয়ে দিতে শুরু করল। নিমেষে মজা দেখার ভিড় জমে গেল চারপাশে।

নারুকাকার এই এক সমস্যা। কেউ ওকে 'গুড় চা' বলে ডাকলেই ও খেপে যায়। কেন যায় সেটা কেউ জানে না। কিন্তু 'গুড় চা' শুনলেই নারুকাকা সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে ওঠে। অবশ্য কবীররাও ওকে কম খেপায়নি এ নিয়ে।

নারুকাকা মান্না দে-র গানের অন্ধ ভক্ত। মান্না দে-র গান শোনাব বলে নারুকাকাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। একবার কবীর, ডুডু, জ্যাকসন আর দিয়েগো একটা মান্না দে-র গানের ক্যাসেট নিয়ে গিয়েছিল নারুকাকার বাড়িতে। ক্যাসেটটা অরিজিনাল নয়, অন্য ক্যাসেট থেকে রেকর্ড করা। কিন্তু তাতে একটু কারসাজি করেছিল কবীররা। আর কারসাজিটা করেছিল শেষ গানে। গানটা সেই বিখ্যাত 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা'। মান্না দে-র গানের ক্যাসেট দেখে তো নারুকাকা আহ্লাদে আঠাশ টুকরো। সবাই টেপ রেকর্ডার ঘিরে বসার পর তো গান শুরু হল। এক-একটা গান হচ্ছে আর নারুকাকাও ডিসকাউন্ট রেটে আহা উহু করে যাচ্ছে। একসময় শুরু হল শেষ গানটা। "এটা আমার প্রিয় গান" বলে নড়েচড়ে বসল নারুকাকা। গানটা বাজতে লাগল—"কফি হাউসের সেই 'গুড় চা'... কোথায় হারাল সেই 'গুড় চা'..." নিখিলেশ প্যারিসে, মইদুল 'গুড় চা'... সুজাতাই আজ শুধু 'গুড় চা'... এভাবে গানটা বেজে চলল। কবীররাই জায়গামতো কথাটা ঢুকিয়েছে। কবীর আড়চোখে দেখল নারুকাকার মুখ লাল, চোয়াল শক্ত, মাথার চুলগুলো প্রায় খাড়া হয়ে গেছে। কিন্তু কিছু করতেও পারছে না। টেপ রেকর্ডারটা যে ভেঙে ফেলবে, সেটাও সম্ভব নয় কারণ সেটা নিজের। শেষে আর থাকতে না-পেরে বলেই ফেলল, "শেষ পর্যন্ত মান্না দে-ও বলছেন? তা হলে আর কী করা যাবে?"

এখন এই বিকেলে নারুকাকাকে থামাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হল কবীরকে। চিৎকার চেঁচামেচিতে কবীরের মা-ও নেমে এসেছে নীচে। দু'জনে মিলে ওরা কোনওমতে থামাল নারুকাকাকে। কিন্তু নারুকাকা আর বাড়ির ভেতরে গেল না। রইল পড়ে বিয়ের ঝামেলা। নারুকাকা হনহন করে স্টেশনের দিকে হাঁটা দিল। কবীর ঘড়ি দেখল। ওফ প্রচুর লেট হয়ে গেছে। সোমাদির ক্লাস প্রায় হাফ হয়ে গেছে। কবীর আর কোনও দিকে না-তাকিয়ে পড়ি কি মরি করে সাইকেল ছোটাল।

সোমাদির বাড়িটা আজ বড় চুপচাপ লাগল কবীরের। কী ব্যাপার? দরজার কাছে খুলে রাখা কোনও জুতো তো নেই। ক্লাস শেষ হয়ে গেল নাকি? কবীর কলিং বেল টিপল। সোমাদি নিজেই বেরিয়ে এল, বলল, "ও কবীর তুই? আজ বেশিক্ষণ ক্লাস নিতে পারিনি রে। মায়ের শরীরটা খারাপ হয়েছে হঠাৎ, একবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব, তাই তাড়াতাড়ি ছুটি দিয়ে দিয়েছি। পরের দিনও ক্লাস নিতে পারব না বুঝলি? ও ভাল কথা! এই গানের খাতাটা টাপুরকে দিয়ে দিস তো। আজও খাতাটা ফেলে গেছে। কী যে হয়েছে মেয়েটার! গানেও মন নেই একদম।" সোমাদি গানের খাতাটা কবীরের হাতে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

কবীরের মনে হল ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে ও। আজও টাপুরের খাতা? আচ্ছা, টাপুর ইচ্ছে করে খাতাটা ফেলে যাচ্ছে না তো যাতে কবীর ওকে বারবার খাতাটা ফেরত দিতে পারে? মনের মধ্যে পপকর্ন ফুটতে লাগল কবীরের। ও দ্রুত প্যাডেলে চাপ দিল। টাপুরের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে আজও। আজ নিশ্চয়ই টাপুর ওকে অবজ্ঞা করবে না। হঠাৎ কী মনে হওয়াতে রাস্তার পাশে সাইকেলটা থামাল কবীর। গতদিন খাতাটা খুলে দেখেনি ও। আজ খুব ইচ্ছে করছে। দেখবে একবার? একবার দেখলে কী হয়েছে? কেউ তো আর জানতে পারছে না। খাতাটা খুব যত্ন করে খুলল কবীর। ওর 'রেন ড্রপ'-এর খাতা। নাকের কাছে নিয়ে একবার গন্ধ শুঁকল। অদ্ভুত সুন্দর একটা গন্ধ পেল ও। পাতায় পাতায়

নানান গান লেখা। কী সুন্দর টাপুরের হাতের লেখা! দেখি তো শেষ পাতাটা। কারণ খাতার শেষ পাতাতে হিজিবিজি লেখার মধ্যে অনেক গোপন কিছু লিখে রাখে মানুষ। শেষ পাতাটা খুলল কবীর। রাস্তার আলোয় কবীর দেখল শেষ পাতার লেখাটা। সাদা পৃষ্ঠার ওপর লাল কালি দিয়ে আঁকা একটা পানপাতা আর তার মধ্যে মোটা করে লাল কালি দিয়ে লেখা 'পুরু!' হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল ওর। পুরু? এর মানে কী? পুরুর সঙ্গে টাপুরের যোগ কোথায়? মাথাটা ঘুরতে লাগল কবীরের। ওর চোখের সামনে বাটানগর ঢেউ-লাগা নৌকার মতো অল্প অল্প দুলতে লাগল।

৭

ফেশিয়াল করাটা খুব ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। মুখের ওপর চটচটে কীসব প্যাকট্যাক লাগিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা। প্রথমে কেমন ভেজা ভেজা, তারপর কেমন শুকনো শুকনো লাগে। তারওপর শীতকাল, ঠান্ডাও লাগে। আর ওইসব মেখে আয়নায় নিজেকে দেখলে প্লুটোর বাসিন্দা মনে হয় ওর। তা ছাড়া বসে থাকতে থাকতে কোমর লক হয়ে যাওয়ার জোগাড়। এরপর আছে ভুরু প্লাক। সে আরও ভয়ংকর। সরু সুতো দিয়ে অদ্ভুত কায়দায় ভুরুর লোম তুলে ভুরুকে ধনুক বানানো। কী ব্যথা লাগে রে বাবা! শিমুল তাই ভুরু প্লাক করার ঝামেলায় যায় না। ফ্যাশন মাথায় থাক। ওর ভয় লাগে খুব। অবশ্য শুধু এটাতেই নয়, শিমুলের আরও অনেক কিছুতেই ভয় লাগে। ওদের বাড়ির কাছেই গঙ্গা, কিন্তু শিমুল কোনওদিন নৌকায় চড়েনি। ওর জলে ভীষণ ভয় লাগে। এই কিছুদিন আগে কালীপুজো হয়ে গেল, কিন্তু শিমুল বাজি পোড়ায়নি। যদি হাত পুড়ে যায়। আগুনেও শিমুলের খুব ভয়। বেশি তেল ঝালের খাবার, রাস্তার খাবার কিচ্ছু খায় না শিমুল। ওর ভয় হয় যদি জন্ডিস হয়! মা মাঝে মাঝে রাগ করে খুব, বলে, "এত ভয় কেন তোর? সব

কিছুতেই ভয়, আশ্চর্য! পৃথিবীতে বাঁচবি কীভাবে? পুরো বাপের ধাঁচে গেছিস।" হ্যাঁ, সবাই তাই বলে। শিমুল নাকি একদম ওর বাবার মতো— মুখচোরা, শান্ত, নিরীহ। আচ্ছা এই যে শান্ত চুপচাপ বলেই কি কারও কাছে ওর গুরুত্ব নেই?

ওর মা, ঠাকুরদা, ঠাকুমা সবাই সবসময় ওর দিদিকে, মানে রঙ্গনাকে নিয়ে ব্যস্ত। রঙ্গনাকে দেখতে ভাল, রঙ্গনা ভাল গান গায়, রঙ্গনা প্রেসিডেন্সিতে পড়ে, রঙ্গনা ভাল রান্না করে। শুধু রঙ্গনা আর রঙ্গনা, রঙ্গনার সব ভাল। ছোটবেলায় রঙ্গনা যখন স্কুল স্পোর্টসে প্রচুর প্রাইজ আনত আর বাড়ির প্রায় সবাই যখন ওকে নিয়েই আনন্দ করত, তখন সামান্য একটা সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে পেনসিল বক্স নিয়ে ঘরের এক কোনায় দাঁড়িয়ে থাকত শিমুল আর বারবার নাক থেকে পিছলে-পড়া চশমাটা ঠিক করত হাত দিয়ে। একমাত্র বাবা-ই তখন আসত ওর কাছে। আর ও, পৃথিবীর সমস্ত উপেক্ষা আর ভয়ের থেকে লুকোবার জন্য বাবার বুকে মুখ লুকোত। আড়চোখে দেখত সমস্ত আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রঙ্গনা।

সেই ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত সব আলোই সবসময় রঙ্গনার ওপর গিয়ে পড়ে। অবশ্য শুধু যে বাড়িতেই ব্যাপারটা এরকম সেটা নয়। রাস্তাতেও এক ঘটনা। রঙ্গনা যখন ট্রেন ধরার জন্য বেরোয় তখন স্টেশন রোড একদম জমে যায়, যাকে বলে 'ফ্রিজ শট'। নিজের চোখে একবার ব্যাপারটা দেখেছে শিমুল। সাইকেল করে যারা যায় তারা পেছন ঘুরে রঙ্গনাকে দেখতে গিয়ে সাইকেল সমেত ড্রেনের মধ্যে নেমে যায়। চায়ের দোকানের লোকেরা চায়ের খুরি হাতে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পড়ে। রঙ্গনার হাঁটার দিকে তাকিয়ে মুদিওলা সুজির বদলে ময়দা প্যাক করতে থাকে। হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবাবু রোগীর নাড়ি দেখতে গিয়ে কনুই ধরে বসে থাকে। আর সবাই হাঁ করে দেখে রঙ্গনা হাঁটছে। শাড়ির ভাঁজ সরে গিয়ে কোমরের মহার্ঘ খাঁজ বেরিয়ে পড়েছে, বালি ঘড়ির মতো তার ঢাল। সময় যেন পিছলে পড়ছে ব্রোঞ্জের মতো শরীর থেকে।

সেদিন রঙ্গনার পাশে হাঁটতে হাঁটতে কেমন যেন মাটির তলায়

সেঁদিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল শিমুলের। মাঝে মাঝে ও ভাবে ওকে কেন রঙ্গনার মতো দেখতে হল না! আসলে শিমুলের কি কোনও পজেটিভ দিকই নেই? জোরে হাওয়া দিলেই স্কুলের বন্ধুরা ওকে বলে, "ওরে, শিমুল তুলোকে বেঁধে রাখ নইলে উড়ে যাবে।" উড়ে যেতেই তো ইচ্ছে করে ওর। যেখানে কেউ ওকে দেখতে পাবে না কখনও, কেউ ওকে সবসময় মনে করাবে না যে ও হেরো, যেখানে ভয় পৌঁছোতে পারবে না ওর কাছে। কিন্তু পারে না, কিছুটা ভয়ে আর কিছুটা বাবার কথা চিন্তা করে।

কুট করে পায়ে একটা পিঁপড়ে কামড়াল। উফ। বর্তমানে ফিরে এল শিমুল। আয়নার সামনে ফেশিয়াল প্যাকটা পড়ে আছে। মরে গেলেও ও ওটা লাগাবে না। মা আর দিদি খুব বকবে, বকুক, ওদেরই গলা ব্যথা হবে। ওরা কেন যে ওকে সুন্দর বানাতে চেষ্টা করে। কী হবে সুন্দর হয়ে? দিদি অবশ্য মাঝে মাঝে ওকে বলে, "শিমু, তোকে এত মিষ্টি দেখতে, একটু সাজলে তো পারিস।" মিষ্টি দেখতে না হাতি। ও খুব জানে এ-সব ওকে স্তোক দেওয়া। সত্যি যদি শিমুলকে মিষ্টি দেখতে হত তা হলে কি 'ও' নজর করত না শিমুলকে? তা হলে না হয় একটু সাজবার মোটিভেশন পেত ও। ওই জঘন্য প্যাকটা মুখে লাগিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত, খুব ব্যথা লাগলেও ভুরুটা প্লাক করে ফেলত। কিন্তু 'ও' তো আর ওর দিকে নজর দেয় না। ভুল করেও না। ওর সামনে গেলে শিমুলের নিজেকে অদৃশ্য মনে হয়।

ধুর, কোনওমতে চুলটা আঁচড়ে বেরিয়ে গেল শিমুল। মা বলছিল স্যান্ডউইচ খেতে। ইয়াক, স্যান্ডউইচ শুনলেই ওর বমি পায়। তার চেয়ে ও এখন যে বাড়িতে যাবে সেখানেই কিছু খেয়ে নেবে। আচ্ছা 'ও' কি এখন বাড়িতে থাকবে?

শিমুলদের বাড়ির পাশেই একটা পুকুর আর তার পাশেই ওদের বাড়ি। 'ও' মানে আমন। শিমুলের জ্ঞান হওয়ার থেকেই ও দেখে আসছে আমনদের বাড়ির সঙ্গে ওদের বাড়ির সম্পর্ক খুব ভাল। দু'বাড়ির মধ্যে

খুব যাতায়াত। আমন আর শিমুল একবয়সি আর পড়েও এক ক্লাসে। ইলেভেনে। স্ট্রিমও এক, সায়েন্স। শিমুল ভাবে কত মিল তবু আমন কেন যে ওকে দেখতে পায় না! কিন্তু তবু ও রোজ আমনদের বাড়িতে যায়। যদি কোনওদিন আমন ওর গুরুত্ব বোঝে। এটুকু বাদ দিলে পৃথিবীতে এই একটা জায়গাই আছে যেখানে গেলে শিমুলের নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। শিমুল ও-বাড়িতে গেলেই আমনের মা ওর ওপর হামলে পড়ে। বলে, "কী রোগা রে তুই। নে খা। সব খেয়ে নিবি, যদি কিছু ফেলে উঠিস তো দেখবি মজা।" বলেই কোনওদিন ঘিয়ে ভাজা লুচি, কোনওদিন চিড়ের পোলাও, মিষ্টি ঠেসে ধরে সামনে। ওর ওজনের চেয়ে বেশি ওজনের খাবার খেতে পারে নাকি শিমুল? তবু সাধ্যমতো খায়। কিন্তু তাতে আমনের মায়ের মন ভরে না। সারাক্ষণ খুঁতখুঁত করতে থাকে। কিন্তু তবু ভাল লাগে শিমুলের। এই ছদ্ম শাসনের ভেতরে যে আদর আছে সেটা ওর ভাল লাগে।

এই মফস্‌সলে শীত একটু তাড়াতাড়ি পড়ে। উত্তরে গঙ্গার থেকে বিকেল হলেই একটা শিরশিরে ঠান্ডা হাওয়া দেয়। শিমুলের মনে হয় যেন কাছেই কেউ ফ্রিজ খুলে রেখেছে। ওর নাকের মাথা ঠান্ডা হয়ে ওঠে। হাতের আর পায়ের তলায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা হয়। শিমুলের ভয় লাগে আবার সর্দি হয়ে যাবে না তো? এটা মনে পড়াতে শিমুল একটা মাফলার নিয়ে নিল। তারপর দুদ্দাড় করে নেমে এল রাস্তায়। আর রাস্তায় বেরিয়েই আচমকা একজনকে দেখে একদম কাঠ হয়ে গেল ও। ওর সামনেই রুদ্র। আবহাওয়ার তাপমাত্রা হঠাৎই যেন চার ডিগ্রি নেমে গেল। কে যেন বরফের গুলি গড়িয়ে দিল শিমুলের শিরদাঁড়ায়। রুদ্রকে শিমুল যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলে। ও যে কতটা খারাপ ছেলে সেটা শিমুলের চেয়ে বেশি কেউ জানে না।

তখন ক্লাস নাইনে পড়ে শিমুল। একটা লোফার টাইপের ছেলে ওর পেছনে খুব লেগেছিল। রাস্তায় বেরোলেই প্রচণ্ড উত্ত্যক্ত করত ওকে। স্কুলে যাওয়ার সময় সারাটা পথ ওর পেছন পেছন যেত। গুলমোহর ফুল

থেকে শুরু করে গোলাপ, ছোট ছোট কাগজের টুকরো ওকে ছুড়ে ছুড়ে মারত। এমনকী ছোট ছোট রঙিন যৌন মিলনের ছবির বই থেকে অসভ্য ছবি ছিঁড়ে ওর দিকে ছুড়ে দিত। এ ছাড়া খারাপ কথা তো আছেই। শিমুল ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকত। পরের দিন স্কুল আছে চিন্তা করে রাতে ঘুম আসত না। একটা আতঙ্ক হয়ে গেছিল ওর। ছেলেটার কথা মাকে বলেছিল ও। কিন্তু সবটা বলতে পারেনি। খারাপ ছবি আর অশ্লীল কথাগুলো ও মাকে বলতে পারেনি। মা জানে মেয়ে ভিতু তাই ওর কথায় অতটা গুরুত্বও দেয়নি।

এর পর একদিন ঘটল বিপত্তি। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে ছেলেটা আবার ওর পিছু নিল। তখনও শীতকাল ছিল। স্কুল ফাংশনের নাচের রিহার্সালের জন্য শিমুলের স্কুল থেকে বেরোতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। আর ভাগ্যটাও এমন সেদিন টাপুরও সঙ্গে ছিল না। স্কুল থেকে বাড়ির পথ অনেকটা। অল্প আলোকিত রাস্তা দিয়ে একা ফিরছিল ও। হঠাৎই পেছনে শুনল ক্রিং ক্রিং— সাইকেলের বেল। শিমুলের শরীর যেন অবশ হয়ে গেল। রাস্তার দু'দিকে বড় মাঠ, তাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গুলমোহর আর পাম গাছের সারি। জায়গাটা খুব সুন্দর হলেও বেশ নির্জন, তার ওপর আলোও কম। ছেলেটা ওর সাইকেল নিয়ে শিমুলের সামনে এসে দাঁড়াল, বলল, "কী ডার্লিং, আজ একা! চলো, যা শীত পড়েছে, একটু মস্তি করা যাক। এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।" বলে হাত দিয়ে একটা প্রচণ্ড খারাপ ইঙ্গিত দেখাল। শিমুল ভয়ে নীল হয়ে গেল। ডিসেম্বরের ঠান্ডাতেও দরদর করে ঘামতে লাগল। আর তার সঙ্গে ওর কান্নাও পেল খুব। ছেলেটা এবার সাইকেল থেকে নেমে এসে দাঁড়াল ওর সামনে। ফিসফিস করে বলল, "চলো না, আজ একটু তোমায় খাব। এই যে তোমার সালমা হায়েকের মতো পেট সেটা একটু চেটে দেখব।" বলে এবার ছেলেটা শিমুলের বুক আর পেটের মাঝখানটা ধরতে গেল। শিমুল আর পারল না। এক ধাক্কায় ছেলেটাকে মাটিতে ফেলে দৌড় লাগাল। ছেলেটা মাটিতে পড়ে গিয়েও সামলে নিল মুহূর্তের মধ্যে। তারপর তাড়া করে শিমুল বেশি দূর যাওয়ার আগেই

গিয়ে ধরে ফেলল ওকে। শিমুলের হাতটা মুচড়ে ধরে হিম গলায় বলল, "অ্যাসিড বাল্‌ব জানো? নাইট্রিক অ্যাসিড? ওর এক ফোঁটা যদি কারও চামড়ায় পড়ে তা হলে সেটা চামড়া হাড় সব জ্বালিয়ে দেয়। ভাবো যদি বাল্‌ব ভরতি সেটা তোমার মুখে পড়ে? এই প্রীতি জিনটার মতো ঠোঁট তো কুষ্ঠ রোগীর মতো হয়ে যাবে। না? যদি নিজেকে বাঁচাতে চাও তো কাল অবশ্যই গঙ্গার জেটির ধারে আসবে। এই সাড়ে চারটে নাগাদ। আমি তোমাকে খাব। আর যদি তুমি রাজি থাকো তবে ফিতে কাটার জন্যে ক্যাপ নিয়ে আসব।" ছেলেটা খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগল। জোর করে শিমুলকে নিজের দিকে টেনে আনল। আরও কিছু করতও বোধহয়, কিন্তু পারল না জ্যাকসন আর দিয়েগোর জন্যে। আমনদের বাড়িতে যায় বলে ওরা শিমুলকে ভালই চেনে। ওরা কাছ দিয়েই যাচ্ছিল। ঘটনা দেখে হা হা করে এসে পড়ায় ছেলেটা রণে ভঙ্গ দিল।

ছেলেটা ওর হাত ছেড়ে দিতেই কাপড়ের স্তূপের মতো মাটিতে পড়ে গিয়েছিল শিমুল। সেদিন জ্যাকসন আর দিয়েগো না-থাকলে কী হত কে বলতে পারে। ওরাই শিমুলকে বাড়িতে দিয়ে গিয়েছিল। সে-রাতে তুমুল জ্বর এসেছিল শিমুলের। জ্বরের ঘোরে "অ্যাসিড মারবে" কথাটা নাকি অনেকবার বলেছিল ও। ডাক্তার বলেছিল মেন্টাল শক।

ঠিক হতে সাত দিনেরও বেশি সময় লেগেছিল শিমুলের। মা আর দিদি ওকে অনেক সাহস দিয়েছিল। কিন্তু তবু কিচ্ছু হয়নি। ঘরের এক কোনায় গুটিশুটি মেরে বসে থাকত শিমুল। তারপর একদিন টাপুর এল। প্রথমে টাপুরকেও কোনও কথা বলতে চায়নি শিমুল, কিন্তু টাপুর অন্য ধাতুতে গড়া। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিল, তারপর বলল, "ভাবিস না, একটা উপায় করছি। ছেলেটাকে শুধু চিনিয়ে দিতে পারবি তো একবার? তা হলেই হবে। রুদ্রদাকে বলছি। সব ব্যবস্থা করবে।"

সেই রুদ্রর সঙ্গে প্রথম কথা হয়েছিল শিমুলের। আগে শিমুল রুদ্রকে চিনত, কিন্তু কোনওদিন কথা বলেনি। এবার হল টাপুরের জন্য। টাপুর রুদ্রকে নিজের দাদার মতো মানে। প্রায় সব কথাই শেয়ার করে ওর সঙ্গে। শিমুলের সমস্যার কথা শুনেই তাই হয়তো টাপুরের রুদ্রর কথা

মনে এসেছিল। "কিন্তু রুদ্রদা কি ওই ছেলেটাকে শায়েস্তা করতে পারবে? ও তো মাত্র ক্লাস টেন-এ পড়ে।" শিমুল না-জিজ্ঞেস করে পারেনি। টাপুর হেসে বলেছিল, "পারে কি পারে না সময় হলেই দেখবি।"

দু'সপ্তাহ পরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল শিমুল। বুক কাঁপছিল ভীষণ। খালি মনে হচ্ছিল এই বুঝি কেউ অ্যাসিড মারবে। যথারীতি বাটা ব্রিজের কাছে এসে ও সেই পরিচিত ক্রিং শব্দটা শুনল। আশ্চর্য! ছেলেটা কি ওর বাড়ির বাইরে আসার অপেক্ষাই করছিল? ছেলেটা সাইকেল নিয়ে একটা বড় চক্কর দিয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়াল, "কী গো তুমি যে অশোক বনে সীতা হয়ে বসে রইলে এতদিন। এদিকে আমার কত কষ্ট হল বলো তো। আচ্ছা তোমারও যদি এমন কষ্ট হয়? মানে হতেও তো পারে, অ্যাসিড মুখে পড়লে সবারই তো হয়। তাই না?"

শিমুলের হাত পা আবার জমে গেল। টাপুরের কথা শুনে বাইরে বেরিয়ে তবে কি ভুল করল ও? রুদ্র কোথায়? আর ঠিক তখনই আচমকাই, যেন মাটি ফুঁড়ে রুদ্র এসে হাজির হল। শিমুলের পেছনে রুদ্রকে দেখে ছেলেটা থতমত খেয়ে গেল। রুদ্র সাইকেল থেকে নেমে বলল, "শিমুল, তুমি যাও।" তারপর ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী রে তিমির, তুই আবার ঝামেলা শুরু করেছিস? চল তো একটু ওদিকে। তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।" শিমুল অবাক হয়ে দেখেছিল বদ ছেলেটা সুড়সুড় করে রুদ্রর সঙ্গে চলে গেল।

শিমুল আর জানে না কী হয়েছিল কিন্তু তিমির নামে ছেলেটা আর কোনও গন্ডগোল পাকায়নি। আর কোনওদিন শিমুলের সামনেও আসেনি। খুব ভাল লেগেছিল শিমুলের। রুদ্র কি ম্যাজিশিয়ান? কী ভাবে এটা সম্ভব হল? তারপর থেকে রুদ্র মাঝে মাঝে আসত শিমুলদের বাড়ি। রুদ্র দারুণ ভাল গান গাইতে পারে, কথাও বলে খুব সুন্দর। রুদ্র এলে খুব ভাল সময় কাটত শিমুলের। ওরও নিজের দাদার মতো মনে হত রুদ্রকে। কিন্তু অত সুখ কি সহ্য হয় শিমুলের কপালে? সেই বিশ্রী ঘটনাটা ঘটল এক বর্ষার বিকেলে।

সেদিন বাড়িতে শিমুল আর ওর ঠাকুরদা ঠাকুমাই ছিল শুধু। দিদি, বাবা আর মা কোথাও গিয়েছিল। সেদিন শেষ বিকেলে রুদ্র এল। হাতে একটা চকোলেট। ছাদের চিলেকোঠার ঘরটা হল শিমুলের স্টাডি রুম। বরাবরের মতো সেখানেই বসল ওরা। গল্পও হল অনেকক্ষণ। আর বিপত্তিটা ঘটল তার পরেই। রুদ্র চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল একসময়। শিমুলও দাঁড়াল। আর হঠাৎই পেছন ঘুরে রুদ্র ঝাঁপিয়ে পড়ল শিমুলের ওপর। রুদ্র এমনিতেই লম্বা চওড়া। আর শিমুল, তুলোর মতো। আচমকা ধাক্কায় বেসামাল হয়ে ও পড়ে গেল গেল পাশের ছোট্ট ডিভানের ওপর। ও প্রথমে বুঝতেই পারেনি কী হল। একেবারেই প্রস্তুত ছিল না এই ঘটনার জন্য। ওকে বিছানায় চেপে ধরে রুদ্র বলল, "একটা চুমু খাব, প্লিজ একটা চুমু খাব তোমায়।" শিমুল আপ্রাণ চেষ্টা করল হাত ছাড়াতে, পারল না। এদিকে রুদ্র পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল শিমুলকে। ঠোঁটে গালে গলায় মুখ ঘষতে লাগল রুদ্র। শিমুলের গা গুলিয়ে উঠল রুদ্রর মুখের লালায়। হাতে ব্যথাও লাগল খুব। রুদ্রর তখন কোনও হুঁশ নেই। ও প্রলাপের মতো বলছিল, "জানো, কেন সেদিন তোমায় বাঁচিয়েছি? তোমার এই ঠোঁট দুটোর জন্য। তিমিরকে বলেছিলাম আমার মালের পেছনে লাগলে ওকে শেষ করে দেব। শিমুল, এত সুন্দর ঠোঁট তুমি কেমন করে বানালে? আমি এটা আজ কামড়ে ছিঁড়ে নেব। এটা আমার, এক্কেবারে আমার।"

রুদ্র চলে যাওয়ার পর বিধ্বস্ত শিমুল একা বসে ছিল। ঠোঁট দুটো জ্বলছিল খুব। গলায় দু'-চারটে আঁচড়ের দাগ। শিমুলের কান্নার শক্তিও ছিল না। কাউকে ও সেই কথা বলতে পারেনি। এক লজ্জায় আর দুই কেউ ওকে বিশ্বাস করবে না। শুধু অনেক ভরসায় ও আমনকে বলেছিল ঘটনাটা। সব শুনে আমন উত্তর দিয়েছিল, "আমায় এসব বলে কী লাভ বল? আমি কী করব?" শিমুল অবাক হয়ে তাকিয়েছিল আমনের দিকে। ছেলেগুলো সবাই কি এরকম নিষ্ঠুর হয়? নিষ্ঠুর আর স্বার্থপর? কিন্তু তবু আমনের ওপর রাগ করতে পারেনি শিমুল। আজও সুযোগ পেলেই আমনের সামনে যেতে ওর ভাল লাগে। আমন কখনও কথা বলে,

কখনও বলে না। আমনও কি দেখতে পায় না ওকে? ও কি অদৃশ্য? এর পরও রুদ্র কয়েকবার অসভ্যতা করতে গেছে। ঠিক কায়দা করতে পারেনি। তবে হিন্ট দিয়ে গেছে ক্রমাগত। শিমুল এখন পারতপক্ষে রুদ্রর সঙ্গে একা থাকে না।

অবশ্য আমন আসে ওদের বাড়িতে। কিন্তু সে তো ওর জন্য নয়। দিদির জন্য। ওর সঙ্গে ক্ষমাঘেন্নার মতো একটু কথা বলে আমন সোজা ঢুকে যায় দিদির ঘরে। সেখানে কত হা হা হি হি করে। সবাই কেন যে দিদিকে এত পাত্তা দেয়! ওদের হাসি পাশের ঘরে বসে শোনে শিমুল। ভীষণ রাগ হয়। নাক থেকে চশমাটা পিছলে পড়ে যায়। শিমুল চশমাটা জায়গায় বসাতে গিয়ে দেখে সেটা আবার পিছলে নেমে আসছে নীচে।

আজ রুদ্রকে দেখে থমকে গেল শিমুল। রুদ্র হাসল। শিমুল দেখল শয়তানটার হাসিটা খুব সুন্দর। সেইজন্যে কি বলে— ইভল্ লুকস বেটার! রুদ্র এগিয়ে এল, বলল, "কী সুইটি পাই? আমার কাছে আসছিলে?" শিমুল কোনও কথা না-বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। "আরে কথা বলছ না কেন? আমি কি এখন তোমায় খেয়ে নেব নাকি? এখন খাব না, ঠিক সময়ে খাব। বহুদিন খাইনি তো! ভুলে গেছি টেস্ট কেমন। কাল একবার গঙ্গার ধারে এসো তো।" শিমুলের চোখ দিয়ে জল বেরোবার উপক্রম হল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে একজনের সাইকেল এসে দাঁড়াল ওদের পাশে। জ্যাকসন।

"কী বে রুদ্র, আমাদের এলাকায় এসে লক্কাগিরি হচ্ছে?" জ্যাকসন রুদ্রকে দেখেই দাঁত কিড়মিড় করে বলল।

রুদ্র জ্যাকসনের দিকে ঘুরল, "বাঁদরের বাচ্চা! ভাগ এখান থেকে। তোর এলাকা মানে? তোর বাপ তোকে লিখে দিয়েছে?"

"বাপ তুলবি না রুদ্র। কেলিয়ে তক্তা বানিয়ে দেব শালা।"

রুদ্র হো হো করে হেসে উঠল, "যা যা হেরো পার্টি, হেরে গিয়ে মাথার ঠিক নেই। জোকার শালা।" তারপর আর সময় নষ্ট না-করে বলল, "তা হলে আমি আসি শিমুল। কেমন?" কী ভদ্র, কী ভদ্র!

জানোয়ার। ঠিক সময়ে এসে পড়ার জন্য শিমুল মনে মনে জ্যাকসনকে ধন্যবাদ দিল।

রুদ্র চলে গেল। জ্যাকসনও আর দাঁড়াল না। শিমুল প্রায় দৌড়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল আমনদের বাড়িতে। আজ আমনদের সারাবাড়ি চুপচাপ। শিমুল বুঝল আমনের মা আজ বাড়িতে নেই। কোথাও গেছে বোধহয়। অবশ্য তাতে শিমুলের হাঁপ ছাড়ল, কেউ ওকে খাওয়া নিয়ে এখন অতিষ্ঠ করবে না। দোতলায় আমনের ঠাম্মার ঘর। শিমুলের খুব ভাল লাগে ওঁকে। শিমুল দোতলায় উঠে সোজা ঠাম্মার ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঠাম্মা একটা মোটা বই পড়ছিলেন। ঠাম্মাকে যত দেখে তত অবাক হয় শিমুল। একটা মানুষ এই বয়সেও এত সুন্দর থাকে কেমন করে! শিমুল ঠাম্মার গা ঘেঁষে বসল। দু'হাতে ঠাম্মাকে জড়িয়ে ধরে পিঠে মাথা রাখল। কী দারুণ ওডিকোলনের গন্ধ। ঠাম্মা বললেন, "কী রে পাগলি, দু'দিন আসিসনি কেন? তোর জন্য মিটসেফে নারকেলের তক্তি রেখেছি। নিয়ে খা। আর আমায় ছাড়, রামায়ণের এই অধ্যায়টা শেষ করি, তারপর গল্প করছি তোর সঙ্গে।"

অগত্যা উঠল শিমুল। নারকেলের তক্তি ওর প্রিয়। মিটসেফ থেকে দুটো তক্তি বের করে নিল ও। ঠাম্মা পড়া শেষ করুক, ততক্ষণে আমনের ঘরে গিয়ে দেখা যাক ও আছে কিনা।

আমনের ঘরটা খুব সুন্দরভাবে সাজানো। কিন্তু আমনটা এমন অগোছালো যে কিছুই ঠিকভাবে রাখে না। ঘরের চারিদিকে জামাকাপড়, বই, খাতা সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা। শিমুল ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। যা ভেবেছিল ঠিক তাই, আমন ঘরে নেই। অন্য দিন ও যা করে আজও তাই শুরু করল শিমুল। আমনের ঘরটা গোছাতে শুরু করল। জামাকাপড়গুলো ভাঁজ করে তুলে রাখল আলমারিতে। বইখাতাগুলো জড়ো করে রাখল র‍্যাকে। শিমুলের মনে হয় এই কাজগুলো করা ওর পক্ষে স্বাভাবিক। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরটা আবার আগের মতো সুন্দর হয়ে গেল। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে শেষবারের মতো দেখে নিল শিমুল। সব ঠিক আছে তো? দেখল কম্পিউটার টেবিলের নীচে দু'-চারটে লুজ

পৃষ্ঠা উঁকি দিচ্ছে। এই আমনের দোষ। সবসময় লুজ পৃষ্ঠায় লিখবে আর ঘরময় ছড়িয়ে রাখবে। পরে নিজেই আর কিছু খুঁজে পাবে না। শিমুল টেবিলের তলা থেকে কাগজগুলো বের করল। বাংলায় কীসব লেখা। শিমুল ড্রয়ারে কাগজগুলো রাখতে গিয়েও পারল না। লেখার প্রথম লাইনটায় চোখ আটকে গেল ওর। কী লিখেছে এসব আমন? এর মানে কী? শিমুল ধপ করে বসে পড়ল খাটে। লেখাগুলো পড়তে লাগল— 'রঙ্গনাদি, তোমার মুখটাই বারবার সামনে চলে আসে আমার। তোমার ব্রোঞ্জরঙা শরীর, তোমার গিটারের মতো খাঁজওলা কোমর। সেদিন তুমি যখন সামনে ঝুঁকে মাটি থেকে স্কেল তুলছিলে আমি স্পষ্ট দেখলাম তোমার পোড়ামাটির বুক। আমার সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। আমি এখন রাত্রে ঘুমোতে পারি না। তুমি যখন মুখ টিপে হাসো, আমার দিকে তাকাও, আমি মরে যাই একদম, আবার বেঁচেও উঠি। তুমি বোঝো না রঙ্গনাদি? তোমাকে যতবার দেখি কে জানি আমার শরীরে গরম লোহা ঢেলে দেয়, আমার পুরু..."

আর পড়তে পারল না শিমুল। এসব কী লিখেছে আমন? কেন লিখেছে এসব? এর মানে কী। শিমুলের হাত পা অবশ হয়ে গেল। মাথাটাও ঘুরছে। ঠাম্মার তৈরি নারকেলের তক্তি আঠার মতো জড়িয়ে আসছে জিভে। নারকেলের তক্তি এত তেতো হয় আগে জানত না।

৮

আজ প্র্যাকটিসের চতুর্থ দিন। এখন দিন যেহেতু অনেক ছোট হয়ে গেছে তাই এই বেলা সাড়ে তিনটের মধ্যেই সূর্য অনেক ঠান্ডা হয়ে আসে। ওদের প্র্যাকটিস ঘণ্টা দেড়েকের হয়, স্টুডেন্টরা একে একে আসছে সবে। পুরুও খানিকক্ষণ হল মাঠে এসেছে। পুরু মাঝে মাঝে ভাবে যে এখন তো ওর ফুটবলার থাকার সময়, আর এখনই ওকে গেমস টিচার হিসেবে একটা স্কুলে ট্রেনিং করাতে হচ্ছে। আচ্ছা ওকে কি কোচ বলা

যায়, মানে যে-অর্থে কোচ বলা হয়? প্রশ্নটা মনে আসাতে নিজেই হেসে ফেলল পুরু। কিন্তু পুরু জানে এই হাসিটুকু টিকিয়ে রাখা মুশকিল। কারণ প্রাণবল্লভ মিত্রের হাতেই পুরুর চাকরির প্রাণ।

প্রথম দেখা হওয়ার সময় প্রাণবল্লভ মিত্র বলেছিলেন সাত দিনের মধ্যে উনি পুরুকে খবর পাঠাবেন চাকরির ব্যাপারে। কিন্তু পুরুকে অপেক্ষা করতে হয়েছে দু'সপ্তাহ। তারপর একদিন এসেছে ইন্টারভিউয়ের ডাক।

ইন্টারভিউতে নঙ্গী হাই-এর হেডস্যার ছাড়াও আরও কয়েক জনের সঙ্গে প্রাণবল্লভ মিত্র নিজেও ছিলেন। পুরুকে অবশ্য বিশেষ কিছুই জিজ্ঞেস করা হয়নি। স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে জানুয়ারির শেষ অবধি ওকে গেমস টিচার করা হচ্ছে। তারপর ওর কাজ দেখে ওকে পারমানেন্ট করা হবে কিনা বলা হবে। এর জন্য টাকাপয়সাও যা দেওয়া হচ্ছে সেটাও বলার মতো নয়। তবু নেই মামার চেয়ে কানা মামা তো ভাল।

গত তিন দিন কিছুই বিশেষ প্র্যাকটিস হয়নি। সবার সঙ্গে পরিচয় হতে হতেই সময় চলে গেছে। পুরু লক্ষ করেছে, এই তিন দিন সবাই এসেছে শুধু একজন আসেনি। দয়ারাম আংরে। দিয়েগোর নাম যে দয়ারাম আংরে এটা জানতই না পুরু, এখানে এসে জেনেছে। কিন্তু কেন আসছে না সে? জ্যাকসন বলে একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিল ও। জ্যাকসন নামটাও পুরুকে অবাক করেছিল। এদের কি কারও স্বাভাবিক নাম নেই? যাই হোক, ওর প্রশ্নের উত্তরে জ্যাকসন বলেছিল, "দিয়েগোর তো হেপাটাইটিস কেস স্যার।"

"মানে? শরীর খারাপ নাকি?"

"না স্যার, মন। গত ম্যাচটা হারার জন্য সবাই ওকে অ্যাকিউজ করছে তো। তার ওপর বোধহয় বাড়িতেও খুব টেনশন চলছে।"

"বোধহয় কেন? তুমি ওর বন্ধু, তুমি জানো না?"

"স্যার, যে দিয়োগোর যতই বন্ধু হোক ওর সমস্যার কথা ও কাউকে বলে না। এমনকী কেউ ওর বাড়িতে যায়, সেটাও ও পছন্দ করে না।"

পুরু ভাবল, এ তো মহা সমস্যা। পুরু একটা ব্যাপার জানে, মানে ওকে কেউ স্পষ্ট না করে বললেও ও জানে, স্কুল কেন ওকে জানুয়ারির শেষ অবধি সময় দিয়েছে। কারণ সেকেন্ড ফেব্রুয়ারি নঙ্গী হাই-এর সঙ্গে রবিন মেমোরিয়ালের ফিরতি এবং ডিসাইডিং ম্যাচ। ওই ম্যাচটায় জেতা হারা অনেক কিছু পার্থক্য করে দেবে। বাটানগরে সব স্কুল টিমের যে-ক'টা খেলা পুরু দেখেছে তাতে ও.জানে এই অঞ্চলের সব স্কুলের প্লেয়ারদের মধ্যে এই দিয়েগো ছেলেটা স্পেশাল। ও একাই যে-কোনও ম্যাচের ভাগ্য বদলে দিতে পারে। পুরুর মনে হয়েছে কৃশানু দের পরে কলকাতা মাঠ আর কোনও বল প্লেয়ার পায়নি। পুরু দিয়েগোর মধ্যে সেই সম্ভাবনা দেখেছে। ও শুধু গোল করে না, গোল করায়ও। গত ম্যাচটায় ও যাই করে থাকুক না কেন এই দিয়েগোকে পুরুর চাই। ও সেদিন জ্যাকসনকে বলেছিল, "যে-করেই হোক পরের দিন দিয়েগোকে মাঠে নিয়ে আসবে।"

কিন্তু পরের দিন মানে গত প্র্যাকটিস সেশনেও দিয়েগোকে নিয়ে আসতে পারেনি জ্যাকসন। দেখা যাক আজ পারে কিনা। পুরু দেখল প্রায় সব স্টুডেন্টই চলে এসেছে। এবার প্র্যাকটিস শুরু করতে হবে। হঠাৎ পেছন থেকে "স্যার" বলে কে যেন ডাকল ওকে। পুরু পেছন ঘুরে দেখল জ্যাকসন। ও কাছে এসে বলল, "স্যার, দিয়েগোকে নিয়ে এসেছি। কিন্তু গুরুর মুড একদম পাংচার হয়ে আছে, খেলতেই চাইছে না। দেখুন না, জার্সি বুট কিছুই নিয়ে আসেনি। ও বলছে আপনি কোচিং করালে ও খেলবে না।"

"কেন?" পুরু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"জানি না স্যার আপনার সঙ্গে ওর কী দুষমনি! ও বারবার বলছে ও খেলবে না। স্যার, আপনি প্লিজ ওকে রাজি করান। ও না-খেললে ফিরতি ম্যাচে ল্যাজে গোবরে হয়ে যাব।"

"ল্যাজে গোবরে হবে কেন? ওকে ছাড়া তোমরা জিততে পারবে না? ফুটবল টিম গেম। অ্যান্ড নো ওয়ান ইজ বিগার দ্যান দ্য গেম।" পুরু চোয়াল শক্ত করল। ও জানে প্রথম থেকেই ওকে শক্ত হতে হবে, রাশ

আলগা দিলেই মুশকিল। জ্যাকসন হাউমাউ করে উত্তর দিল, "ওসব বইয়ের কথা স্যার আমি মানি না। মারাদোনা না-থাকলে ছিয়াশিতে আর্জেন্টিনা জিতত? মারাদোনা ফুটবলের চেয়েও বড়।" পুরু কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু জ্যাকসন ওকে বলার সুযোগ না-দিয়ে নিজেই আবার বলল, "প্লিজ স্যার, আমাদের ইজ্জত কা সওয়াল। পুরো বাঁশ হয়ে যাবে স্যার।"

"চুপ করো, কী আজেবাজে বকছ?" পুরু ধমক দিল, "তুমি প্র্যাকটিসে নামো। ও বসে থাকুক, পরে দেখা যাবে।"

পুরু জোর করে জ্যাকসনকে প্র্যাকটিসে নামিয়ে দিল। ওয়ার্ম আপ করিয়ে নিয়ে কিছুটা ফিজিকাল ট্রেনিং করাল। দেখল ছেলেগুলো ফিজিকালি খুব একটা ফিট নয়। আধ ঘণ্টাখানেক পরে পাঁচ মিনিটের ব্রেকে আমন বলে একটা ছেলে এসে বলল, "স্যার, গত তিন দিনে একবারও বল পেলাম না। আমরা বল নিয়ে ট্রেনিং করব না?"

পুরু বলল, "নিশ্চয়ই করবে। আগে একটু ফিজিকাল ফিটনেসটা বাড়ুক। ফার্স্ট উইক অব ডিসেম্বর বল নামাব।"

"সে কী স্যার! তখন তো প্র্যাকটিস বন্ধ থাকবে। আমাদের ফার্স্ট টার্ম পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে, তা ছাড়া টেন-টুয়েলভের টেস্ট শুরু হবে। ডিসেম্বরের শেষে আবার প্র্যাকটিস শুরু হবে। পুরো গিভ আপ কেস হয়ে যাবে স্যার।"

সর্বনাশ! এটা তো জানত না পুরু। ও নিজের মতো একটা ট্রেনিং শিডিউল বানিয়ে রেখেছিল। এখন তো পুরোটা বদলাতে হবে। পুরু চিন্তা করল খানিকক্ষণ। বুঝল যে, সময় যখন কম ওকে খানিকটা ইমপ্রোভাইজ করতেই হবে। আর একটা কথাও সত্যি। শুধু ফিজিকাল ফিটনেস বাড়াতে গেলে ছেলেরাও বোর হয়ে যাবে। ওরা তো আর বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে না। পুরু মনে মনে ঠিক করে নিল। আমনকে বলল, "আজই বল পাবে তোমরা। শোনো, এবার থেকে প্রথমে ড্রিল করে নেবে, তারপর বল নিয়ে ম্যাচ সিচুয়েশন তৈরি করে খেলা হবে। নাও এবার নেমে পড়ো।"

এরপর বল নিয়ে খানিকটা সময় নানা ড্রিল করানোর পর বেশ কিছুটা শুটিং প্র্যাকটিস করাল পুরু। দেখল সবাই মোটামুটি মারতে পারলেও জ্যাকসন ছেলেটা বল ডানদিকে শট মারলে তা বাঁ দিকে যাচ্ছে। একে দেখলে পুরুদের কোচ অলোকদা বলতেন 'তাল কানা'। কিন্তু জ্যাকসনের যেটা গুণ সেটা হল স্পিড। বেশ জোরে দৌড়োয় ছেলেটা। পুরুর মনে পড়ল এরকমই জোরে দৌড়োত ও নিজে। অলোকদা বলতেন 'জেসি ওয়েন্স'।

এরপর ওদের একটা ছোট ম্যাচও খেলাল পুরু। দুটো টিম ভাগ করে পনেরো পনেরো তিরিশ মিনিটের ম্যাচ। পুরু দেখল ছেলেগুলো মোটামুটি খেলছে। কিন্তু সবারই নিজের কেরামতি দেখাবার একটা ঝোঁক। এদের বোঝাতে হবে যে ফুটবল টিম গেম, এটা টেনিস নয়। তবু এসব কিছুর মাঝেও পুরু দেখছিল দিয়েগোকে। মাঠের এক পাশে চুপ করে বসে আছে ও। দেখে মনে হচ্ছে এই মাঠ, এই স্কুল কোনও কিছুর সঙ্গেই ওর আর যোগাযোগ নেই কোনও। পুরু দেখল মাঠের দিকেও তাকাচ্ছে না দিয়েগো। দূরে দুটো শালিখ পাখির দিকে তাকিয়ে বসে আছে ও। এ-ছেলেকে মাঠে ফেরাতে যথেষ্ট বেগ যে ওকে পেতে হবে সেটা বিলক্ষণ বুঝল পুরু।

নির্দিষ্ট সময়ে প্র্যাকটিস শেষ করে দিল পুরু। আজ আর নয়। সবাইকে কিট গোছাতে বলে নিজের ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করে জল খেল খানিকটা। জামার হাতায় মুখ মুছে এবার দিয়েগোর দিকে এগিয়ে গেল ও। দিয়েগো ডুডু আর জ্যাকসনের সঙ্গে গল্প করছিল। পুরুকে আসতে দেখেই চুপ করে গেল।

পুরুই প্রথম কথা শুরু করল। বলল, "দিয়েগো, তুমি প্র্যাকটিসে আসছ না কেন?" দিয়েগো কোনও উত্তর না-দিয়ে চুপ করে রইল। পুরু দেখল এ তো মহা ঝামেলা। ও আবার একই প্রশ্ন করল। দিয়েগো এখনও চুপ। পুরু বুঝল এভাবে হবে না। দেখা যাক অন্যভাবে চেষ্টা করে। পুরু এবার বলল, "শোনো দিয়েগো, চুপ করে থেকে কোনও কিছুর সমাধান হয় না। অন্তত এইটুকু বলো তোমার প্রবলেমটা কী?

এমনও তো হতে পারে যে কোথাও কোনও ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে।”

দিয়েগো সরু চোখে পুরুর দিকে তাকাল একবার, তারপর শান্তভাবে বলল, “দেখুন, আমি এমন কারও কাছে ট্রেনিং করতে চাই না যিনি আমায় বিশ্বাস করেন না। ম্যাচের দিন সন্ধেবেলায় বটতলায় আপনিই তো ছিলেন, তাই না? আপনিই তো আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি ইচ্ছে করে কবীরকে ধাক্কা মেরেছিলাম কিনা? ঠিক কিনা?”

পুরু চুপ করে রইল। কথাটা সত্যি। পুরু ভেবেছিল যাদের গেমস টিচার হওয়ার কথা হচ্ছে, তাদের খেলা একবার দেখে নেবে। আসলে এর আগেও ওদের অনেক খেলা দেখেছে পুরু, কিন্তু এবার ভেবেছিল অনেক খুঁটিয়ে দেখবে, শুধু দর্শকের চোখে নয়, পরীক্ষকের চোখেও। তাই সেদিন খেলা দেখতে গিয়েছিল ও। আর খেলা দেখে ওর মনে হয়েছিল দিয়েগো ঠিক গা লাগাচ্ছে না। তাই সন্ধেবেলা বটতলার কাছে ওদের আড্ডায় বসে হঠাৎ রাস্তা দিয়ে দিয়েগোকে যেতে দেখে দিয়েগোকে খেলা সম্বন্ধে ওই কথাটা না জিজ্ঞেস করে পারেনি।

“আপনি বললেন না কিন্তু আমি ঠিক বলেছি কিনা।” দিয়েগোর গলায় সামান্য অধৈর্য। এবার চোয়াল শক্ত হল পুরুর। ও জানত এই স্কুলে এসে ওকে ঝামেলার সামনে পড়তে হবেই। কারণ ওর বয়সটা তো ঠিক স্যার হওয়ার নয়। কিন্তু পুরু জানে এমন সময় কী করতে হয়। ও বলল, “দিয়েগো, আমি নিজে সুপার ডিভিশনে ফুটবল খেলেছি। আমি কিন্তু বুঝি কে কী ভাবে খেলছে। সেদিন তুমি যে ঠিক খেলোনি সেটা তুমি নিজেও জানো। শোনো, তুমি ভাল প্লেয়ার তাই তোমাকে এতগুলো কথা বলছি।”

“আপনি সুপার ডিভিশনে কী খেলেছেন আমি জানি না, কিন্তু এখানে যে প্র্যাকটিস করাচ্ছেন!” দিয়েগোর অবজ্ঞাটা স্পষ্ট বুঝতে পারল পুরু।

“আচ্ছা? তুমি ফুটবলের সব জানো দেখছি! তুমি আমায় কাটিয়ে বেরোতে পারবে দিয়েগো? যদিও আমি ডিফেন্সে খেলতাম না, তবু, পারবে?” পুরু কঠিন গলায় বলল।

“একশোর মধ্যে একশোবার।” কনফিডেন্টলি বলল দিয়েগো।

"ও. কে, কাম অন দেন।" বল হাতে মাঠের দিকে এগিয়ে গেল পুরু। দিয়েগো বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে হেসে চোখ টিপল একবার, তারপর মাঠের দিকে এগোল।

জ্যাকসন ডুডুকে চাপা গলায় বলল, "দেখলি, স্যার কেমন কায়দা করে দিয়েগোকে মাঠে নিয়ে গেলেন! একদম কাকা টাইপের স্যার।"

"একশোবার নয়, তিনবার, জাস্ট তিনবার তুমি আমায় কাটিয়ে বেরোও।" বলল পুরু।

"ঠিক আছে। নাও মে উই স্টার্ট?" দিয়েগো প্যান্ট গুটিয়ে পা দিয়ে বলটাকে আলতো জাগ্‌ল্ করে বলল।

"কাম অন।" পুরু ঝুঁকে দাঁড়াল একটু। পুরু জানে এটা ওর করা উচিত নয়। কারণ এটা ওর হাঁটুর পক্ষে খুব খারাপ। তবু রিস্ক নিতেই হবে।

বল পায়ে দ্রুত এগিয়ে এল দিয়েগো। বাঁ পায়ের সামনে বলটা লাট্টুর মতো ঘুরছে। পুরু একবার সামনে এগোল একটু। দিয়েগো চট করে বলটা একবার সামনে টেনে নিয়ে আবার পুরুর দু'পায়ের মধ্যে দিয়ে গলিয়ে ওকে সহজেই কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। পুরু ঘুরে দেখল দিয়েগো হাসছে। পুরু মনে মনে বলল, ভাল, খুব ভাল। এরকম স্কিল সত্যি সহজে দেখা যায় না। পুরু বলল, "গুড। ওয়ান্স মোর।" কিন্তু দ্বিতীয়বারও এক অবস্থা। পুরু ট্যাকেল করার আগেই দিয়েগো ওকে কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। আর এবার হাঁটুতে একটু লাগল পুরুর। বড্ড ঝুঁকি নিয়ে ফেলছে ও। পুরু নিজেকেই মনে মনে বলল। তবু টিকে থাকতে হবে। লড়াইটা ছাড়লে হবে না। ও দেখল দিয়েগো হাসছে, বলছে, "দেখলেন তো প্র্যাকটিসে আসি না কেন? আপনার কাছে কিছু শেখার নেই আমার।"

"তাই?" পুরু হাসল, বলল, "বাট আই স্টিল হ্যাভ মাই লাস্ট চান্স। কাম অন দিয়েগো, কাম অন।"

দিয়েগো একবার কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর আবার বল নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। এবার পুরু বেশি এগোল না আর। চট করে একবার দেখে নিল দিয়েগোর চোখ। পুরু জানে দিয়েগো বাঁ পায়ের প্লেয়ার। ওর

মাথার মধ্যে অলোকদাই যেন ওকে বললেন, "বাঁ দিকে চুক্কি দে।" তাই হঠাৎ ওর সামনে গিয়ে বাঁ দিকে ঝুঁকল পুরু। রিফ্লেক্সে দিয়েগো বলটা চট করে ডান পায়ে নিয়ে নিল আর সঙ্গে সঙ্গেই পুরু কড়া ট্যাক্‌ল্ করল দিয়েগোর ডান পায়ে। হতভম্ব দিয়েগো দেখল বলটা ওর পায়ে নেই আর। পুরু বলটা পায়ে নিয়ে এবার গোড়ালি দিয়ে জাগ্‌ল্ করছে। পুরু হাসল, বলল, "শেষ হওয়ার আগে কোনও কিছুই শেষ হয় না দিয়েগো। তুমি খুব ভাল খেলো, কিন্তু জেনো বেস্ট ক্যান বি বেটার। এবার তুমি ঠিক করো কাল থেকে প্র্যাকটিসে আসবে কিনা।"

মাঠ ছাড়ার আগে জ্যাকসন এগিয়ে এল পুরুর কাছে। বলল, "স্যার, আপনি ব্যাপক লোক। আপনি এমন কিছু করুন যাতে আমরা ববিন মেমোরিয়ালকে পিষে দিতে পারি। খুব বজ্জাত স্কুল ওটা।"

"স্কুল কখনও খারাপ হয় না মনোময়। রবিন মেমোরিয়াল ভাল স্কুল, তোমরা ওদের হারাতে চাইলে তোমাদের ওদের চেয়ে ভাল হতে হবে। আর একটা কথা তোমাদের জেনে রাখা ভাল আমি কিন্তু রবিন মেমোরিয়ালে পড়াশুনো করেছি। ওটা আমার স্কুল।" জ্যাকসনের অবাক-হওয়া মুখের দিকে না-তাকিয়ে পুরু হাঁটতে শুরু করল।

এন এস এ মাঠ থেকে বেরিয়ে চ্যাটার্জি পাড়ার রাস্তা ধরে হাঁটছিল পুরু। সন্ধে হয়ে এসেছে প্রায়। এখানে পাড়ার ভেতরের রাস্তায় আলো নেই। পিচও ভাঙাচোরা। এত কম লোক যায় এখান দিয়ে তবু রাস্তার এই হাল কীভাবে হল বোঝা মুশকিল। পুরু বুঝতে পারছিল নঙ্গী স্কুলের এই চাকরিটা খুব কিছু সহজ হবে না। দিয়েগো ওদের সবচেয়ে ভাল প্লেয়ার, কিন্তু ও-ই সবচেয়ে বেশি গন্ডগোল করছে। এমন চললে পুরুকে কোনও স্টেপ নিতেই হবে। টিমে ডিসিপ্লিন না-আনলে কিচ্ছু হবে না। এখনও স্কুল কর্তৃপক্ষ ওকে নিয়মিত স্কুলে যেতে বলেননি। পুরুকে শুধু সপ্তাহে দু'দিন স্কুলে গিয়ে ওর প্র্যাকটিসের প্রগ্রেস রিপোর্ট লিখে দিয়ে আসতে হয়। ছোট ক্লাসগুলোর গেমস্ ক্লাস নিতে হয় না ওকে। পুরু জানে এটাই ওর শেষ সুযোগ। সামনের সরস্বতী পুজোর সময়ের ম্যাচটাই আসল।

পুরু হাতঘড়িটা দেখল একবার। এখনও একটু সময় হাতে আছে। ওর পড়ানো সন্ধে সাড়ে সাতটায়। খিদেও পেয়ে গেছে। একটু বাড়ি যাবে কি? কিন্তু কিছু ঠিক করার সময় পেল না পুরু। একটা মোটরবাইক এসে থামল ওর পাশে। "এই পুরু।" পুরু বিলক্ষণ চেনে গলাটা। ও বলল, "কী রে কুশ, তুই? এত দিন কোথায় ছিলি? কোনও খবর নেই। সেদিন ঝামেলার পর এই তোকে প্রথম দেখলাম। জানিস নিশ্চয়ই আমি নঙ্গী স্কুলকে প্র্যাকটিস করাতে শুরু করেছি।" কুশ মোটরবাইক থেকে নামল। রাস্তার পাশে বাইকটা রেখে একটা কালভার্টে বসল। এই জায়গাটায় সামান্য আলো আছে। কারণ সামনে একটা বিশাল বড় জলের ট্যাঙ্ক আর পাম্প হাউস। তার আলোর ছিটেফোঁটায় অন্ধকার এখানে পাতলা। কুশ চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, "হ্যাঁ রে, পুরো ডাউন হয়ে ছিলাম এই ক'টা দিন। সেদিন তুই না-বাঁচালে পিটিয়ে তক্তাপোশ বানিয়ে ছেড়ে দিত পাবলিক।"

"তুই মেয়েটাকে কী বলেছিলি বল তো?" পুরু ওর পাশে বসে জিজ্ঞেস করল।

"মা কালীর দিব্যি বলছি কিচ্ছু বলিনি। এমনিই মেয়েটার সঙ্গে একটু ঝাড়ি করার চেষ্টা করি। সেদিনও করছিলাম। এমনকী চোখফোকও মারিনি। কিন্তু কেন যে মেয়েটা এসে ধুয়ে ইস্ত্রি করে দিল বুঝলাম না।"

"তুই কিচ্ছু বলিসনি?" পুরু অবিশ্বাস ভরা চোখে কুশের দিকে তাকাল।

"মাইরি, শুধু যখন ও ঝাড়ছিল আমি চাপে পড়ে বলে ফেলেছিলাম যে ওর পিঠটা মন্দিরা বেদীর মতো।"

"মন্দিরা বেদীর মতো পিঠ না বিষান সিং বেদীর মতো পিঠ, তোকে কে বলতে বলেছে? সত্যি এমন ঝামেলা পাকাস না! আর তুই জানিস না যে মেয়েটা সাংঘাতিক? যাক গে, আর ওর পেছনে ঘুরিস না। সবসময় কিন্তু আমি বাঁচাতে যাব না। মাথায় রাখিস।" পুরু বিরক্তির সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

কুশও আর বসল না। উঠে বাইকে স্টার্ট দিল। পুরু জিজ্ঞেস করল, "এখন কোথায় যাচ্ছিস?"

কুশ বাইকের আওয়াজের ওপরে গলা তুলে বলল, "যাই, রাধাকাকুর মেয়েকে সময় দেওয়া আছে।"

পুরু অবাক হয়ে বলল, "এত কিছুর পরেও তোর স্বভাব গেল না?"

কুশ মুচকি হাসল, "জলে থাকলেও মাছের কি গায়ের গন্ধ যায়? ও কে, বাই? কুশের বাইকের টেল লাইটটা দ্রুত রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে গেল।

আজ সঙ্গে সাইকেল নেই পুরুর। ও মেন রোড না-ধরে পাড়ার ভেতর দিয়ে বাড়ি ফিরতে লাগল। এই রাস্তাটা কংক্রিটে বাঁধানো। কিন্তু এখানেও বিশেষ আলো নেই। এর-ওর বাড়ির আলোয় রাস্তাটা আবছা দেখা যায়। পুরু এই আলো আঁধারির মধ্যে কাকে যেন ওর বাড়ির রাস্তার বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। মুখটা স্পষ্ট বুঝতে না পারলেও দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা দেখে পুরুর পিঠ দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল একটা। ও আবার কেন?

পুরুকে দেখে ছায়া থেকে বেরিয়ে এল টাপুর। পুরু দেখল আজ একদম সাজেনি মেয়েটা। আজ শুধু একটা জিনস্ আর জ্যাকেট পরে আছে। তাতেও অসাধারণ লাগছে টাপুরকে। টাপুরের গুণেই বোধহয় ওদের গরিব গলিটা পার্ক স্ট্রিটের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এত সুন্দর একটা মেয়ের মনটা এমন কেন? যাক গে। পুরু নিজেকে সতর্ক করে নিল। টাপুর খুব নিচু স্বরে বলল, "আপনাকে একটা জিনিস দেব বলে দাঁড়িয়ে আছি।"

"আমায়?" পুরু আশ্চর্য হল।

"হ্যাঁ, এটা। আগে আপনি এর কোনও উত্তর দেননি। এবার কিন্তু প্লিজ দেবেন।" টাপুর একটা খাম এগিয়ে দিল পুরুর দিকে।

পুরু হতভম্ব হয়ে যন্ত্রের মতো হাত বাড়িয়ে খামটা নিল, "কী এটা?"

"পড়ে দেখবেন। আমি আমার মোবাইল নম্বর ওতে দিয়ে দিয়েছি। একটা ফোন করলে ভাল লাগবে।" টাপুর চলে যাবে বলে পেছন ফিরল। পুরুর হঠাৎ রাগ চড়ে গেল মাথায়, পেয়েছে কী মেয়েটা? ও

কড়া গলায় বলল, “টাপুর, দাঁড়াও। আবার এসব শুরু করেছ? আবার চিঠি দিয়েছ? কী চাও তুমি? না, কোনও কথা বলবে না। উত্তর চাই তোমার, না? এই নাও উত্তর।” পুরু খামটা চার টুকরো করে ছিঁড়ে টাপুরের হাতে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

মেয়েটা নিশ্চয়ই আবার কোনও গন্ডগোল পাকানোর তালে আছে। একবার শিক্ষা হয়েছে পুরুর। আর নয়। পুরু ফিরেও দেখল না পেছনে। টাপুর থাকুক বা যাক ওর কী? ও কেয়ার করে না। এমনিতেই ওর জীবনে হাজারটা ঝামেলা। তার মধ্যে আর নতুন ঝামেলা ভাল লাগে না। এসব চিন্তা করতে করতে পুরু প্রায় ওর বাড়ির সামনে এসে পড়েছে হঠাৎ একটা সাইকেল পেছন থেকে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। পুরু চমকে উঠে সরে দাঁড়াল। “স্যার!” কবীরের গলা। পুরুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে ওর মাঠে। পুরু জিজ্ঞেস করল, “কী ব্যাপার? তুমি? কিছু বলবে?”

কবীর যেন দম নিল একটু, তারপর ফিসফিসে গলায় বলল, “থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।”

“থ্যাঙ্ক ইউ? কেন? কী ব্যাপারে?” পুরু অবাক হয়ে গেল।

কবীর হাসল, “স্যার, ইউ হ্যাভ মেড মাই ডে। থ্যাঙ্ক ইউ।”

আর দাঁড়াল না কবীর। সাঁ করে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল। পুরু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কী হচ্ছে সব? কিচ্ছু বুঝতে পারছে না ও। কবীর হঠাৎ ওকে থ্যাঙ্কস জানাল কেন?

৯

বিকেলটা এখন বড় তাড়াতাড়ি ঘোলাটে হয়ে আসে। গঙ্গার ও-পাড়ের ইটভাটার রোগা রোগা চিমনিগুলো থেকে সরু সুতোর মতো ধোঁয়া উঠছে এখনও। জলে ভাঁটির টান। নদীটা মরে আসছে ক্রমশ। ছেঁড়া চটি, ঠাকুরের ভাঙা কাঠামো, চাপ চাপ কচুরিপানা, পেট-ফাটা মৃত কুকুর ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছে দক্ষিণে। ওই দিকে সমুদ্র। দিয়েগোদের

ছোটবেলায় নদীটা এমন ছিল না। ও প্রতি মহালয়ায় বাবার সঙ্গে এখানে আসত। বাবা আর বাবার বন্ধুরা স্নান করত আর ও অবাক হয়ে দেখত ভরা একটা নদী। দেখত বড় বড় জাহাজ যাচ্ছে, ভটভটি লাগানো নৌকোগুলো মানুষ নিয়ে এপার ওপার করছে। জাহাজের চিমনিতে লাগানো পতাকা দেখে ও মনে মনে ভাবত কোন দেশ থেকে আসছে জাহাজটা? কিন্তু সেই ছোটবেলার নদীটা কোথায় গেল কে জানে! এখন সামনের নদীটাকে দেখলে কষ্ট হয় দিয়েগোর। মরে যাচ্ছে, বড় দ্রুত মরে যাচ্ছে নদীটা। ঠিক যেন ওর মা।

গ্যাজনখানায় আজ দিয়েগোর সঙ্গে ডুডু আর জ্যাকসন আছে। কবীরটার যে কী হল? দিয়েগো মাঝে মাঝে ভাবে কবীর এভাবে ভুল বুঝল ওকে? অবশ্য কে না ভুল বুঝেছে? সব্বাই ভেবেছে ও বিশ্বাসঘাতক। ওকে নিয়ে ছোট্ট ছড়াও কেউ একটা ছড়িয়ে দিয়েছে সারা বাটানগরে। মাঝে মাঝেই শোনে ওকে দেখলে চেঁচিয়ে কিছু সিক্স-সেভেনের ছেলেরা বলছে, "ম্যাচ ছাড়লি কী নিয়ে? ক্রোনিয়ে, ক্রোনিয়ে।" দিয়েগো জানে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট ক্যাপ্টেন হ্যান্সি ক্রোনিয়ের কথা। ম্যাচ ফিক্সিং করেছিলেন তিনি। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দিয়েগো তো অমন করেনি। তবে?

কে ছড়িয়েছে কথাটা দিয়েগো আকাশ পাতাল ভেবেও বের করতে পারেনি। কিন্তু যেই ছড়াক, সে খুব বুদ্ধি করে কথাটা ছড়িয়েছে। একেতেই বাড়িতে প্রচণ্ড টেনশন চলছে। তার ওপর এই ঝঞ্ঝাট, সামনে টেস্ট পরীক্ষা— দিয়েগোর পাগল পাগল অবস্থা। এখন প্র্যাকটিস বন্ধ। যদিও দিয়েগো প্র্যাকটিসে যাচ্ছে না। আসলে বলা যেতে পারে পুরুর ওপর অভিমান করেই যাচ্ছে না। সবাই না হয় ভুল বুঝল, কিন্তু পুরু নিজে তো হায়ার লেভেলে ফুটবল খেলেছে, ও কী করে অমনভাবে দিয়েগোকে সন্দেহ করছে? কোচ যদি তার প্লেয়ারকে বিশ্বাস না-করতে পারে তা হলে সে-টিমে প্লেয়ারের খেলে লাভ নেই।

"কী রে দিয়েগো, তখন থেকে কী অত ভাবছিস বল তো? কী হয়েছে তোর?" চিনেবাদামের খোসা ছাড়িয়ে মুখে ফেলে প্রশ্নটা করল ডুডু।

"কই কিছু না তো।" দিয়েগো অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল।

"কিছু নয় যখন, তখন অমন লাথ-খাওয়া প্রেমিকের মতো বসে আছিস কেন রে?" এবার জ্যাকসন রুক্ষভাবে জিজ্ঞেস করল। দিয়েগো উত্তর না-দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওরা যেখানে বসে আছে সেটা সবুজ পাড়। দিয়েগো হেঁটে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। জ্যাকসন নাছোড়বান্দা হয়ে ওর সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেল, বলল, "আজ তোকে বলতেই হবে কেন তুই সেই খেলার পর থেকে এমন করছিস। না হয় সেদিন বাজে খেলেছিস। লোকে যা খুশি বলুক, তুই অমন ম্যাদা মেরে গেছিস কেন? তুই এমন করছিস বলেই তো লোকে আরও বেশি তোর পেছনে লাগছে।"

দিয়েগো দাঁত চেপে বলল, "বেশি ফ্যাচফ্যাচ করিস না। যা বুঝিস না তা নিয়ে ভাটের জ্ঞান দিবি না।"

"শালা আমি বুঝি না তো কে বোঝে রে? ঠিক আছে, বোঝা আমায়। ফালতু মটকা গরম করে দিচ্ছিস তুই।" জ্যাকসন দুমদাম করে গিয়ে আবার বসে পড়ল। দিয়েগো একবার ঘড়িটা দেখল। পাঁচটাও বাজেনি তবু কেমন সন্ধে হয়ে আসছে। ভেবেছিল এখানে আসলে একটু ফ্রেশ লাগবে, কিন্তু এরা যা শুরু করেছে আর ভাল লাগছে না। এবার বাড়ি যেতে হবে।

ডুডু বাদামের ঠোঙাটা শেষ করে দূরে ছুড়ে ফেলে বলল, "এই দিয়েগো, তোর 'সান সাইন' মানে রাশি কী রে?"

"আবার রাশি, কাশী, গয়া বৃন্দাবন খুলে বসলি? মাইরি তুই এক পিস জিনিস বটে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে খবর দিলে ওরা এসে জামাই আদর করে নিয়ে যাবে। কথায় কথায় পঞ্জিকা, মাদুলি, তাবিজ, তাগা, পূর্ণিমা, অমাবস্যা সব চটকে চৌত্রিশ করে দেওয়া খালি।" জ্যাকসন খেঁকিয়ে উঠল।

"তুই কী বুঝিস রে? খালি ফটফট। আর তোকে কে জিজ্ঞেস করেছে?" ডুডুও যথাসম্ভব প্রতিবাদ করল।

"আমি বলছি, দেখি আমার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারিস কিনা। আমার রাশি কর্কট।" জ্যাকসন না-দমে আবার বলল।

"ভাগ শালা। তোর মতো মর্কটের প্রেডিকশন করি না আমি।" ডুডু জ্যাকসনকে আর পাত্তা না-দিয়ে আবার দিয়েগোকে জিজ্ঞেস করল, "এই দিয়েগো বল না তোর রাশি কী?"

দিয়েগো অনিচ্ছার সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে জবাব দিল, "জেমেনি মানে মিথুন।"

জ্যাকসন কথাটা যেন লুফে নিল, বলল, "মিঠুন? ভাগ মিঠুন আবার রাশি হল কবে রে? ও তো চক্রবর্তী। ওই যে মিঠুন চক্রবর্তী। এখন সাউথের মোটা মোটা নায়িকাদের সঙ্গে সিনেমা করে। একসময় ডিস্কো ড্যান্সার করেছিল। গানটা মনে নেই? 'আয়ামা ডিস্কো ড্যান্সার দাদুকে দিদিমা দেয় অ্যান্সার, ঢিচু, ঢিচু।' ওর যদি মিঠুন রাশি হয় আমার তবে অমিতাভ রাশি। ওঃ যা ঘ্যামা হবে না। বুড়ো বয়সে মাথায় রঙিন পরচুলা পরে কাজরা রে কাজরা রে বলে কী নাচ। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সবাই ম্যালেরিয়া রুগির মতো কাঁপছে। মাইরি, বচ্চনের চামড়াফামড়া ঝুলে গেলেও এখনও বেশ টান্টু আছে।"

ডুডু আর পারল না, ছুটে গিয়ে ক্যাত করে একটা লাথি মারল জ্যাকসনকে, "তোর টান্টুগিরি বের করছি দাঁড়া। অমিতাভ বচ্চন সম্বন্ধে কিছু বললে কিন্তু এই গঙ্গার তীরে রক্তগঙ্গা বইবে বলে দিলাম।" দিয়েগো জানে অমিতাভ বচ্চন ডুডুর ফেভারিট অ্যাক্টর। কিন্তু জ্যাকসন দমবার পাত্র নয়। ও আবার বলল, "বলব না মানে? একশো বার বলব, হাজার বার বলব। চামড়া ঝুলে মশারি হওয়ার জোগাড় এখনও ইয়ং নায়িকাদের সঙ্গে সিনেমা করা! রানি মুখার্জিকে চুমু পর্যন্ত খেয়েছে, কী সাহস! একে টান্টু বলবি না তো কাকে বলবি? টান্টু, টান্টু, টান্টু, শালা তুইও টান্টু। জানি না ভেবেছিস? সেদিন তোকে আমি দেখিনি? ফরসামতো মেয়েটার সঙ্গে হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিলি?" দিয়েগো দেখল জোঁকের মুখে নুন পড়ল যেন। এই শেষ কথাটাতে চুপসে গিয়ে ডুডু চুপ করে গেল।

দিয়েগো বুঝল কোনও কেস আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে ডুডুকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই হঠাৎ সরসর করে দিয়েগোর পায়ের কাছ দিয়ে

কিছু একটা চলে গেল। দিয়েগো চমকে উঠে স্থির হয়ে গেল। সাপ নয় তো? কিন্তু শীতকালে কি সাপ বেরোয়? দিয়েগো মুখ ঘুরিয়ে দেখল, না সাপ নয়, একটা কাঠবেড়ালি। মাটির রাস্তাটার উলটো দিকে যে হাড়িকাঠ তার পাশে গিয়ে ওটা বসেছে। আর হাড়িকাঠটাতে চোখ পড়তেই চমকে উঠল দিয়েগো। প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে। তার অল্প আলোয় মনে হচ্ছে হাড়িকাঠটার কালো কাঠের ওপর লাল ছোপ! রক্ত!

দিয়েগো পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সেদিকটায়। দেখল, না রক্ত নয়, কেউ বোধহয় খয়েরি রঙের পানের পিক বা ওই জাতীয় কিছু ফেলেছে ওটার ওপর। দিয়েগো আজকাল সবজায়গায় রক্ত দেখছে যেন। এটা কি ফিয়ার সাইকোসিস? দিয়েগো কি ভিতু হয়ে যাচ্ছে? আসলে বাড়ির আবহাওয়াটাই কেমন যেন মৃত্যুর মতো হয়ে গেছে। ওর শ্যামলা, সুন্দর, ছোট্টখাট্টো মা দিনকে দিন কেমন আরও ছোট্ট হয়ে বিছানার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে যেন। সারা সংসার হাতের মুঠোয় থাকত মায়ের। বাবার চশমা খোঁজা থেকে দিয়েগোর পেনসিল কেটে দেওয়া, মা সব করত একা হাতে। দিয়েগো ভাবত ঠাকুর দশটা হাতে যা করতে পারে না মা দুটো হাতে তাই করে দেয়। সারাদিন চরকির মতো ঘুরত মা। দিয়েগোর মনে হত কে যেন মাকে দম দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। আজ সেই মায়ের দম ফুরিয়ে এসেছে যেন। বিষণ্ণ একটা মানুষ শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করছে মৃত্যুর। ওই যে গঙ্গার ওই দিকে সূর্য ডুবে যাচ্ছে। ওই যে লাল রংটা জলে গুলে ক্রমশ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠছে, এই সমস্ত রং চেনে দিয়েগো। ওর মায়ের বিছানায় বালিশে মাঝে মাঝেই এই রংটা লেগে থাকে। সূর্য ডুবে যাচ্ছে, খুব দ্রুত সূর্য ডুবে যাচ্ছে। মায়ের জীবনেও বোধহয় গোধূলি নেমে এল।

কাউকে দিয়েগো এসব বলতে পারে না। জ্যাকসন, ডুডু বা অন্য কাউকে ও কক্ষনও বলে না ওর বাড়ির অবস্থা। ও জানে এসব কথা বললেই লোকে সহানুভূতি জানাবে, প্রচুর জ্ঞান দেবে। বাড়িতে অসুস্থ মানুষকে দেখতে গিয়ে তাকে আরও অসুস্থ করে তোলাই যেন মানুষের কাজ। দিয়েগো এসব চায় না। ও নিজে জানে ওর ইগো বেশি। কেউ

ওকে করুণা করুক ও সেটা সহ্যই করতে পারে না। আর মা ওর সবচেয়ে বড় সেন্টিমেন্টের জায়গা। এটা নিয়ে ওকে কেউ কিছু বলুক সেটা ও চায় না।

মাসখানেক হল মায়ের অবস্থা এরকম। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ওরা দেখেছিল মায়ের কথা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে খুব। প্রায় কিছুই খেতে পারছে না। দিয়েগো আর ওর বাবা হতবাক হয়ে গেছিল। হঠাৎ এ কী হল? তারপর অনেক ডাক্তার বদ্যি করিয়েছে ওরা। দিনে দিনে মায়ের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়েছে, লিকুইড ছাড়া অন্য সব কিছু খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। কোনও ডাক্তার ধরতেই পারেনি কী হয়েছে। তারপর একদিন শুরু হল কাশি। তার সঙ্গে উঠে আসতে লাগল রক্ত। আবার ডাক্তার, আবার নার্সিংহোম, কিন্তু এবারও কেউ বুঝল না কী ব্যাপার। হাজারো টেস্ট করা হল। তাতে শুধু জানা গেল যে শ্বাসনালি আর খাদ্যনালি ফুলে প্রায় বন্ধ হয়ে আছে। কিন্তু কেন এমন হল কেউ ধরতে পারল না। চোখের সামনে মা ক্রমশ নির্জীব হয়ে পড়তে লাগল। অসহায়ের মতো দিয়েগো আর ওর বাবা দেখতে থাকল প্রায় দম ফুরিয়ে আসা একটা পুতুলকে।

দিয়েগো এসব বলবে কাকে? ফুটবল ছাড়া ওর জীবনের বাকি সবটাই তো ওর মা। মায়ের সঙ্গেই ওর সব ঝগড়া, সব বন্ধুত্ব। সব কথা দিয়েগো তো একমাত্র মাকেই বলত। এমনকী রুপাইয়ের কথাও একমাত্র মাকেই বলেছে দিয়েগো। মা কিন্তু একটুও রাগ করেনি। শুধু বলেছে কাউকে ভাল লাগলেই তো হল না, আগে জীবনে যোগ্য হতে হয়। দিয়েগো জানে যোগ্য ওকে হতেই হবে। ফুটবলের যোগ্য, ওর মায়ের যোগ্য আর রুপাইয়ের যোগ্য। আর মায়ের এই অবস্থা! দিয়েগোর আজকাল চারিদিক কেমন সব অন্ধকার লাগে। আর সবচেয়ে মারাত্মক খবরটা এসেছিল সেই ফুটবল ম্যাচটার দিন, দুপুরে। আর সেই খবরটার ঢেউয়ে তছনছ হয়ে গেছে দিয়েগোর জীবন।

ম্যাচের আগের দিনটা খুব যন্ত্রণায় কেটেছিল দিয়েগোর। খালি মনে হচ্ছিল রুদ্রর প্রস্তাবটা—'ম্যাচ ছাড়, রুপাই তোর।' নিজের কাছে এখন

স্বীকার করতে লজ্জা নেই দিয়েগোর যে রুদ্রর প্রস্তাবটা ওর খারাপ লাগেনি। কারণ এই ম্যাচটায় হারলে সামনের ফিরতি ম্যাচটা তো আছেই। রুপাইয়ের জন্য একটা ম্যাচ ছাড়তেই পারে দিয়েগো। আর যেহেতু রবিন মেমোরিয়াল রুপাইয়েরও স্কুল, সেহেতু ওদের স্কুল জিতলে স্বাভাবিক ভাবে রুপাই খুশি হবেই। দিয়েগো মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছিল ম্যাচটা ছেড়েই দেবে। ওর এই মন খারাপের জীবনে রুপাই-ই তো একমাত্র আনন্দ। তাই ভেবেছিল এই সুযোগটা ও ছাড়বে না। একবার, অন্তত একবার নিজের জন্য কিছু করবে ও।

শেষ রাতের দিকে ঘুম এসেছিল দিয়েগোর। কিন্তু কী এক অস্বস্তিতে বেশিক্ষণ ঘুমোতে পারেনি। ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ওর। বিছানা থেকে উঠে জানলায় দাঁড়িয়ে ও দেখেছিল কার্তিক মাসের আবছা ঠান্ডা আর পাতলা কুয়াশার মধ্যে ওদের বাগানে গাছের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মা। ওই প্রচণ্ড অসুস্থ শরীর নিয়েও বাগানে বেরিয়ে শিউলি ফুল জড়ো করছে। সেই শিফনের মতো কুয়াশা, কুসুম রঙের আলো আর এক গাছ শিউলির সামনে দাঁড়ানো মাকে দেখে হঠাৎ খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল দিয়েগোর। মনে পড়ে গিয়েছিল যে, সেদিন ওর ঠাকুরদার মৃত্যুবার্ষিকী। দিয়েগোর মাকে নিজের মেয়ের চেয়েও বোধহয় বেশি ভালবাসতেন ওর ঠাকুরদা। মা এত কিছুর মধ্যেও দিনটা ভোলেনি। ঠাকুরদার ছবি সাজাবে বলে মা শিউলি জড়ো করতে উঠেছে।

দিয়েগোকে দেখে মা কষ্ট করে বলেছিল, "আজ ঠাকুরদার মৃত্যুদিন দয়া। মনে আছে তো? আজ ম্যাচটা কিন্তু ভালভাবে খেলিস।" দিয়েগোর সব কিছু গুলিয়ে গেল যেন। ঠাকুরদার কাছেই ফুটবলের শুরু দিয়েগোর। ঠাকুরদা বলতেন, "দয়া! মা, দেশ আর ফুটবল, এর সঙ্গে কোনওদিন বিশ্বাসঘাতকতা করবি না। ভাল প্লেয়ার সবাই হয় না কিন্তু ভাল স্পোর্টসম্যান কিন্তু হওয়া যায়।" মায়ের কথায় ছোটবেলা, প্রথম তিন নম্বর ফুটবল, প্রথম বুটের গন্ধ, প্রথম গোল করার আনন্দে সারারাত ঘুমোতে না-পারা— সব একসঙ্গে স্রোতের মতো ফিরে এল। রুপাই, রুদ্র, প্রেম সব কেমন কুঁকড়ে গেল যেন। সারারাত ধরে নিজেকে

বোঝানো যুক্তিগুলো ক্রমশ ভেঙে গেল দিয়েগোর। নিজের প্রতি কেমন একটা ঘৃণা হতে শুরু করল। ইস কী করতে যাচ্ছিল ও? একটা• মেয়ের জন্য ও বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছিল? না, সম্ভব নয়। দিয়েগো ঠিক করে নিয়েছিল ও নিজের খেলাই খেলবে। কিন্তু তবু সব গন্ডগোল হয়ে গিয়েছিল। এখন মনে হয় দিনটা ওর ছিল না, এক্কেবারে ছিল না।

ফুল তোলার পরেই মায়ের শরীর হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়ল সেদিন। বাবা খুব বকাবকি করেছিল মাকে অমন অনিয়ম করার জন্য। কিন্তু ততক্ষণে মায়ের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে। মুখ দিয়ে অনবরত রক্ত উঠতে শুরু করল। ওষুধ, ইঞ্জেকশন সব করেও কিছু হল না। ডাক্তারকাকা বললেন, "আমি খুব ভাল বুঝছি না। তোমরা যত তাড়াতাড়ি পারো বায়োপসি করার বন্দোবস্ত করো। ইট মে বি ক্যান্সার।"

ক্যান্সার? কথাটা শুনে দিয়েগোর মনে হয়েছিল ওর পৃথিবীটা কেউ যেন এক ধাক্কায় ভেঙে দিল। অনেক উঁচু নাগরদোলনার থেকে নীচে নামার সময় পেটের ভেতরটা যেমন খালি খালি লাগে, ঠিক তেমনই মনে হয়েছিল দিয়েগোর। ক্যান্সার মানে? মৃত্যু? মা মারা যাবে? মা আর থাকবে না? তা হলে দিয়েগোর কী হবে? মন খারাপ হলে কার কাছে গিয়ে বসবে? সকালে উঠে কার মুখ দেখবে প্রথমে?

মাকে তক্ষুনি বাটা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। কারণ চব্বিশ ঘণ্টা অবজারভেশনে রাখা দরকার। দিয়েগো ঠিক করে নিয়েছিল সেদিনের ম্যাচটা আর খেলবে না। মায়ের এই অবস্থার মধ্যে ও কোনও কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারবে না। কিন্তু মা শোনেনি। এত কিছুর মধ্যেও মা ভোলেনি ম্যাচের কথা। জোর করে দিয়েগোকে মাঠে পাঠিয়েছিল।

মায়ের কথা শুনে মাঠে অবধি চলে গিয়েছিল দিয়েগো, কিন্তু আর পারেনি। এ তো সিনেমা নয় যে এর মধ্যেও নায়ক দারুণ খেলে ম্যাচ জিতে যাবে। দিয়েগো স্যারকে গিয়ে বলেছিল ও ম্যাচটা খেলতে পারবে না। কিন্তু বরণ স্যার শোনেননি। জোর করে নামিয়ে দিয়েছিলেন

মাঠে। দিয়েগো কিছুতেই স্যারকে বলতে পারেনি মায়ের কথা। কারণ এটা দিয়েগো পারে না। নিজের সমস্যা, কষ্ট ও কোনওদিন কাউকে বলতে পারে না। আর ও জানে এই ব্যাপারটা এমন যে লোকে জ্ঞান ছাড়া আর কিচ্ছু ওকে দেবে না।

খেলতে নেমে শুধু মায়ের কথাই মনে পড়ছিল দিয়েগোর। মা কি সত্যি মারা যাবে? মায়ের কি ভাল হওয়ার সম্ভাবনা নেই? এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে একের পর এক মিস পাস হতে লাগল। পায়ের থেকে বল বেরিয়ে যেতে লাগল, কাটাতে গিয়ে বিপক্ষের পায়ে জমা দিতে লাগল বলগুলো। সবাই গালাগালি দিতে শুরু করল। কেউ কেউ বাবা মায়ের নাম তুলেও গালাগাল করল। আর এইসব হট্টগোলের মধ্যে কীভাবে জানি গোলটা খেয়ে গেল ওরা। দিয়েগো সত্যি কবীরকে ইচ্ছে করে ধাক্কা মারেনি। কেন মারবে? কিন্তু ভগবান জানে কীসের থেকে কী হল। ভেসে-আসা বলটা লক্ষ করে লাফিয়েছিল দিয়েগো ক্লিয়ার করবে বলে। কিন্তু কোথা থেকে কবীর লাফিয়ে উঠল বলটা ফিস্ট করবে বলে। আর কেউই ওরা বলটা পেল না। নিজেদের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। কেউ কোনও প্রশ্ন করল না। সবাই একচেটিয়া ভাবে দিয়েগোকে বিশ্বাসঘাতক বলে গালাগালি করতে লাগল। কবীর তো ওর গায়ে পর্যন্ত হাত তুলেছিল। রুদ্রও খেলার শেষে এসে ফিসফিসে গলায় থ্যাঙ্কস দিয়ে গেল ওকে। কেন থ্যাঙ্কস? দিয়েগো রুদ্রকে বলতে গিয়েছিল যে ও ইচ্ছে করে খারাপ খেলেনি। কিন্তু রুদ্র ওকে পাত্তাই দেয়নি। এইসবের মধ্যেও ওকে সেদিন বাড়িতে ফিরে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। এখন রাস্তার লোকেরা পর্যন্ত ওকে ম্যাচ নিয়ে উলটোপালটা প্রশ্ন করে। এ কলঙ্ক কোনও দিনও কি ওর যাবে?

এই প্রায়-সন্ধের গঙ্গার দিকে চুপ করে তাকিয়ে ছিল ও। দূরে একটা মোটরলঞ্চ আসছে। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না সেটা, কিন্তু লঞ্চের মধ্যের হলুদ আলোটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। লঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে আলোটাও এগিয়ে আসছে ঘাটের দিকে। ওই সামান্য আলোটুকুও যদি নিজের জীবনে দেখতে পেত দিয়েগো!

“কী রে দিয়েগো, কী বিড়বিড় করছিস?” ডুডু এসে কাছে দাঁড়িয়েছে।

দিয়েগো মুখ না-ঘুরিয়ে জবাব দিল, “কিছু না এমনি।”

“শুনলাম কাকিমার শরীর খারাপ। কী হয়েছে রে?”

ডুডু জানল কী করে? দিয়েগো তো কাউকে বলেনি। ওর বাড়িতে ও বন্ধুদের যেতে বলে না। ডুডু বোধহয় বুঝতে পারল দিয়েগোর মনের ভাব। ও নিজেই বলল, “কাকুর সঙ্গে দেখা হল আজ। তখনই জানলাম। অবশ্য কাকু ডিটেলে কিছু বলেননি। ওঁর তাড়া ছিল। আচ্ছা ছেলে তো তুই। আমাদের কিছু বলিসনি। কী হয়েছে কী কাকিমার?”

দিয়েগো নিচু স্বরে বলল, “কী বলব বল? সবার জীবনেই নানা সমস্যা থাকে। অসুবিধে থাকে। সেটা বলে লাভ আছে? আর মায়ের শরীর খারাপ হয়েছে। ট্রিটমেন্ট চলছে। এর বেশি কিছু বলার নেই এ ব্যাপারে। যাক গে বাদ দে। চল বাড়ি যাই।”

দিয়েগো আর সময় নষ্ট করল না। সাইকেলটা নিয়ে বাঁধ থেকে নেমে এল। ডুডু আর জ্যাকসনও এল পেছন পেছন। শিবমন্দিরের সামনে থেকে সাইকেলে উঠে পড়ল ওরা। এতক্ষণ চুপ-করে-থাকা জ্যাকসন এবার মুখ খুলল, “আমায় একটু ইকোজিওর কয়েকটা চ্যাপ্টারের নোট দিবি ডুডু? কিচ্ছু বুঝতে পারছি না মাইরি।”

ডুডু বলল, “ঠিক আছে আমাদের বাড়িতে চল।”

“তোদের বাড়ি? মাথা খারাপ না কুমির তাড়া করেছে আমাকে? যা এক পিস ঠাকুরদা বানিয়েছিস না! ঝম্প পুরো।”

ডুডু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, “কেন? আমার ঠাকুরদা তোকে কী করেছে?”

“বল কী করতে বাকি রেখেছে? মাইরি, প্যান্টুলুন খুলে নেবার জোগাড় করে প্রতিবার। দেখা হলেই মান্ধাতার আমলের রেকর্ড বাজায়। ‘মনোময়, তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, গায়ত্রী মন্ত্র জানো? পইতে কই তোমার? আহ্নিক করো তো? আচমন মন্ত্র বলো দেখি।” তারপর আবার শুরু করে কোন গোত্র আমাদের, আমরা কোন শ্রেণির ব্রাহ্মণ, পইতের গ্রন্থি দিতে জানি কিনা। ওফ্! যাই বলিস ভারী বিটকেল বুড়ো। সেদিন

জিজ্ঞেস করেছে আর্যভট্টের একটা বইয়ের নাম কী? ভাবলাম বলি 'জিসম,' তারপর ভাবলাম সেটা তো মহেশ ভট্টের প্রোডাকশনের। ডুডু, ইকোজিওর নোট দিবি না বললেই হয়। ওই ব্রাহ্মণ হিটলারের সামনে আমায় না-নিলেই হচ্ছে না?"

ডুডু প্রতিবাদ জানিয়ে কীসব বলতে শুরু করল। কিন্তু দিয়েগো আর শুনল না। ছ্যাবলামো আর ভাল লাগছে না। জ্যাকসনটা যেখানে থাকবে সেখানে ভুলভাল কথার ডিপো খুলে বসবে। কিন্তু দিয়েগো জানে একটু অদ্ভুত হলেও জ্যাকসন ছেলেটা ভাল। ওর মনে কোনও প্যাঁচ নেই। ওদের সাইকেল সাহেব কলোনির সামনে এসে পড়েছে। দিয়েগো ভাবল এবার জোরে সাইকেল চালিয়ে ও বেরিয়ে যাবে, আর দেরি করবে না। কিন্তু ঠিক সেই সময়ই একটা মেয়েলি গলার চিৎকারে আপনা আপনি তিনটে সাইকেল একসঙ্গে থেমে গেল। দিয়েগো দেখল একটা ফরসা বেশ সুন্দর দেখতে মেয়ে ডুডুর নাম ধরে ডাকছে। ওরা সাইকেল থামাতেই মেয়েটা এগিয়ে এল ওদের দিকে। বলল, "জানতাম তোকে এই রাস্তাতেই পাওয়া যাবে এরকম সময়ে। খুব দরকার আছে তোর সঙ্গে, একটু হেল্প করবি?"

ডুডু একটু অপ্রস্তুত আর নার্ভাস হয়ে বলল, "কী ব্যাপার বল তো পরী?"

"দেখ না সন্ধে হয়ে গেছে তো, আমি একা একা উষা গেটে যেতে ভরসা পাচ্ছি না। আমার সঙ্গে একটু যাবি?"

"এই সন্ধেবেলা উষা গেটে কী দরকার তোর?" ডুডু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"এখানে না। চল, যেতে যেতে বলছি।" ডুডু একবার দিয়েগো আর একবার জ্যাকসনের দিকে করুণ চোখে তাকাল। তারপর যেন ইচ্ছে নেই এমন ভাবে বলল, "চল তা হলে।"

ওরা চলে যেতেই জ্যাকসন দিয়েগোকে বলল, "ওরেব্বাস। এই মেয়েটার হাত ধরেই তো সেদিন দাঁড়িয়ে ছিল ডুডু। শালা নামেও পরী, দেখতেও পরী, আর ফিগার দেখেছিস? মাইরি, আমাদের কপালে পরী

তো দুরের কথা একটা ডাইনিও জোটে না রে। ডুডু মেয়েটাকে তুলে ফেলল?" জ্যাকসন ওর সরু গলায় কথাটা এমন তারস্বরে বলল যে একটু দূরে দাঁড়ানো ফুচকাওলার কাছে ফুচকা খেতে আসা দুটো মেয়ে ঘুরে তাকাল। দিয়েগো ধমক দিয়ে বলল, "কী সবসময় শালাটালা বলে কথা বলিস? চারপাশের লোকজন দেখে কথা বলবি তো।"

জ্যাকসন ফিক করে হেসে বলল, "সরি গুরু, ভুল হয়ে গেছে।"

দিয়েগো প্যাডেল করতে গিয়ে দেখল ফুচকাওলার সামনে দাঁড়ানো দুটো মেয়ের মধ্যে যাকে দেখতে ভীষণ সুন্দর, সে ফুচকার পাতাটা হঠাৎ মাটিতে ছুড়ে সাহেব কলোনির গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করল। অন্য মেয়েটা থতমত খেয়ে জোরে ডাকল, "সায়েকা, এই সায়েকা, কী হল? ফুচকাটা খেয়ে যা। কী রে হঠাৎ কী হল তোর? তুই-ই বললি ফুচকা খাবি। এখন হঠাৎ কী হল? এই সায়েকা।"

দিয়েগো আর দাঁড়াল না। রাস্তার ঘটনা দেখলে ওর হবে না। ওর দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ওর মায়ের বায়োপসির রিপোর্ট আসার কথা আজ সন্ধের সময়। মা এখন বাড়িতেই আছে। দিয়েগো ভাবল মায়ের কি সত্যি ক্যান্সার হয়েছে? দিয়েগো কিচ্ছু ভাবতে পারছে না। ও দ্রুত সাইকেল চালাতে লাগল। যদিও মায়ের কাছে মিনতিদি আছে। মানে মিনতিদি সবসময় মায়ের কাছেই থাকে, মাকে দেখাশুনো করার জন্যে। তবু আজ রিপোর্ট আসবে বলেই যেন ভেতরে একটা চাপ অনুভব করছে দিয়েগো। বাজারে কী দরকার আছে বলে মল্লিকবাজারের মোড় থেকে ডানদিকে চলে গেল জ্যাকসন। আর তার একটু পরে বটতলার কাছে এসে সাইকেলের স্পিড কমিয়ে দিল দিয়েগো। বা বলা যায় কমাতে বাধ্য হল ও। কারণ ও দেখল সামনেই রুপাই আসছে।

ওকে দেখে রুপাইও দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর দিয়েগোকে অবাক করে ওর দিকে এগিয়ে এল। দিয়েগোর গলা শুকিয়ে কাঠ। হাঁটু দুটোও কাঁপছে। মেয়েটা ওর দিকে আসছে! রূপাই ওর সামনে এসে সামান্য হাসল, জিজ্ঞেস করল, "তুমি ক'দিন স্যারের কাছে পড়তে যাওনি কেন?"

কথাটা সত্যি। দিয়েগো স্যারের কাছে ক'দিন যায়নি। ও বলল, "না, মানে এমনি।"

"শরীর ঠিক আছে তো?"

"হ্যাঁ।" ছোট্ট করে উত্তর দিল দিয়েগো। আসলে ও অনেক বড় করে অনেক কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু সেই এক সমস্যা। কে যেন ষড়যন্ত্র করে ওর মুখে ব্লটিং পেপার ঢুকিয়ে দিয়েছে আবার। রুপাই আবার জিজ্ঞেস করল, "তোমায় খুব ডিস্টার্বড দেখাচ্ছে। আর ইউ শিয়োর এভরিথিং ইজ অলরাইট?"

"না, না, সব ঠিক আছে।" দিয়েগো কোনওমতে বলল।

রুপাই শ্রাগ করল। তারপর বলল, "ও কে। যদি ওই ক্লাসের নোটগুলো তোমার লাগে আমায় বোলো, আমি দেব।"

ধন্য হয়ে গেল যেন দিয়োগো। রুপাই নিজের হাতের লেখা নোটস দিয়েগোকে দেবে? মেয়েটা কী ভাল! মনে মনে রুপাইকে একটা লম্বা চুমু খেল দিয়েগো আর বাস্তবে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ। আমার খুব উপকার হবে।"

রুপাই অসাধারণ হাসি দিল একটা। বলল, "বাই দেন। টেক কেয়ার।" রুপাইয়ের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে দিয়েগো ভাবল এবার থেকে সরকারের উচিত নিয়ম করে এই মেয়েটার হাসি বন্ধ করে দেওয়া। আর একবার হাসলেই দিয়েগো মারা পড়ত। কিন্তু আবার মনে পড়ে গেল যে মায়ের রিপোর্ট আসবে আজ। দিয়েগো ঘড়ি দেখল, হয়তো রিপোর্ট এসেও গেছে। ও আবার সাইকেল ছুটিয়ে দিল।

বাড়িটা আজ কেমন যেন অন্ধকার আর চুপচাপ লাগল দিয়েগোর। এমন তো থাকে না! সন্ধেবেলা ওদের বাড়ির সব ঘরের আলোই জ্বালানো থাকে। ব্যাপার কী? সাইকেলটা কোনওরকমে উঠোনে রেখে দ্রুত ঘরে ঢুকল ও। মা বিছানায় শুয়ে। বাবা বসে আছে পাশে। সামনের চেয়ারে ডাক্তারকাকু। আর ডাক্তারকাকুর হাতে ধরা একটা বড় সাদা কাগজ। দিয়েগো দেখেই বুঝল ওটা রিপোর্ট। কিন্তু কী লেখা আছে ওতে? মায়ের কি সত্যি গ্রাসনালির ক্যান্সার ধরা পড়েছে? দিয়েগো

বাবার মুখের দিকে তাকাল। বাবার চোখ দুটো দেখে থমকে গেল ও। ঠিক সেই সময়ে ডাক্তারকাকু হাতের সাদা কাগজটা রেখে গম্ভীর গলায় বললেন, "শুনুন মিস্টার আংরে..." টেনশনে হৃৎপিণ্ডটা মনে হল মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে। দিয়েগো যেন আবার ছোট্ট হয়ে গেল, চোখ বন্ধ করে মনে মনে বলতে লাগল, "ঠাকুর, সব ঠিক করে দাও, প্লিজ মাকে বাঁচিয়ে দাও, প্লিজ... আর কোনওদিন কিচ্ছু চাইব না তোমার কাছে।"

১০

স্কুলের শেষ পরীক্ষা হয়ে গেল। আজ টুয়েলভের টেস্টের শেষ পরীক্ষা ছিল। এখন ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। বেশ ঠান্ডা পড়েছে এবার। স্কুল গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে কবীর দেখল স্টুডেন্টরা স্কুল থেকে একে একে বেরিয়ে আসছে। ওই তো দিয়েগো, ওই যে ডুডু আর সবার পেছনে জ্যাকসন। ওঃ, প্রতিটা পরীক্ষায় গন্ডগোল করেছে ব্যাটা, হয় স্যারদের সঙ্গে, নয় পাশের স্টুডেন্টের সঙ্গে, কোনও না-কোনও ঝামেলা করেছেই ও। জ্যাকসনের এইসব ননসেন্স কাজকর্মের জন্য কবীরের বিরক্তও লাগে, আবার হাসিও পায়। সত্যি ভীষণ উদ্ভট এই ছেলেটা। কখন কী করে ঠিক নেই। হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল ক্লাস সেভেনের একটা ঘটনা।

জিওগ্রাফি পরীক্ষার খাতা বেরোনোর দিন ছিল সেটা। ফাইনাল পরীক্ষা নয়, এমনি টার্মিনাল পরীক্ষা।

জিওগ্রাফিতে জ্যাকসন বরাবর কাঁচা। অবশ্য তখন জ্যাকসন নয়, সবাই মনোময় বলেই ডাকত ওকে। তো, স্যার খাতা নিয়ে ক্লাসে এসে বসে প্রথমেই ডাকলেন জ্যাকসনকে, বললেন, "মনোময়, এদিকে আয়।" সবাই তো অবাক। তবে কি ও-ই হায়েস্ট নম্বর পেল? জ্যাকসন কাছে যাওয়াতে স্যার খাতার বান্ডিল থেকে ওর খাতাটা বের করে বললেন, "তুই জিওগ্রাফির যে উত্তর লিখেছিস এগুলো কোন বইতে আছে?"

জ্যাকসন স্মার্টলি বলল, "কেন স্যার, আমাদের জিওগ্রাফি বইতে।"

"আমাদের জিওগ্রাফি বইতে? ইয়ারকি হচ্ছে?" স্যার সামান্য উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, তারপর ক্লাসের উদ্দেশে বললেন, "তোরা শুনবি ও কী উত্তর লিখেছে? শোন তবে। শর্ট নোট লিখতে দেওয়া ছিল 'জলবিদ্যুৎ'-এর ওপর। আমাদের মনোময় কী লিখেছে শোন।" স্যার জ্যাকসনের খাতা থেকে পড়তে শুরু করলেন, "জল থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাকে জলবিদ্যুৎ বলে। লোকেরা এই বিদ্যুৎ জলে নেমে তুলতে গেলে শক খেয়ে পটাপট মরে যায় তাই প্রচুর বিদ্যুৎ জল থেকে উৎপন্ন হলেও মানুষ তা ব্যবহার করতে পারে না। অর্থাৎ জলবিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হলে বিদ্যুৎকে জল থেকে তোলার জন্য উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থার দরকার।" স্যার যখন থামলেন, জ্যাকসন ছাড়া আর সবাই হাসতে শুরু করেছে।

আজ স্কুলের শেষ পরীক্ষা ছিল বলেই কি সেইসব পুরনো দিনের কথা বেশি মনে পড়ছে? "কী রে কবীর! একা একা দাঁত কেলাচ্ছিস কেন?" জ্যাকসন কাছে এসে প্রশ্ন করল।

"লাথি খাবি শালা।" কবীর খিঁচিয়ে বলল।

ডুডু বলল, "আবার শুরু করলি? লক্কাবাজি না করলেই তোর হয় না, না রে জ্যাকসন?"

"ও তুমি শালা মাগিবাজি করে বেড়াবে আর আমি লক্কাবাজি করছি, না?" জ্যাকসন চোখ টিপে বলল।

"কী বললি তুই?" ডুডু এবার সত্যিই খেপে গেছে। কবীর দু'জনের মাঝে এসে দাঁড়াল, বলল, "আবার শুরু করলি তোরা? আজ পরীক্ষা শেষ হল, আজও ঝগড়া করছিস?"

"তুই জানিস না কবীর, কিছুদিন আগেই পরী বলে একটা মেয়ের সঙ্গে ডুডু ব্যাপক সিন দিয়েছে। দু'জনকেই মাঝে মাঝে এদিক ওদিক যেতে দেখা গেছে। অবশ্য এখন ক'দিন দেখা যাচ্ছে না। আর শালা কী মেয়ে মাইরি। ফ্লুরোসেন্ট কালারের একদম। আর তেমন ফিগার। একেবারে পৃথিবী টাইপ। সারা শরীরে পাহাড় মালভূমি ভরতি। কী মাল তুলেছিস ডুডু।" জ্যাকসন খিকখিক করে হাসতে লাগল। ডুডু প্রচণ্ড

রেগে গেছে, বুঝল কবীর। কিন্তু ছেলেটা ভদ্র, বিশেষ কিছু বলতে পারে না। কবীর ওর হয়ে এক লাথি মারল জ্যাকসনকে, "চুপ শালা, বেশি বললে বিচুটি দিয়ে ক্যালাব কিন্তু।" জ্যাকসন এবার রণে ভঙ্গ দিল।

কবীর দেখল দিয়েগো এইসবের বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দূরে। এবার জ্যাকসন ওর কাছে যাওয়াতে দু'জন ফিরে যেতে লাগল বাড়ির দিকে। ডুডু চিৎকার করে বলল, "দিয়েগো, পরশু থেকে প্রাকটিস, আসবি কিন্তু।" দিয়েগো সাইকেল করে যেতে যেতে পিছনে ফিরে তাকাল একবার, তারপর বুড়ো আঙুলটা তুলল শুধু। ওরা দু'জন গলির মধ্যে মিলিয়ে গেল।

কবীর আশ্চর্য হল, ডুডুকে জিজ্ঞেস করল, "দিয়েগোটা প্র্যাকটিসে জয়েন করবে?"

"হ্যাঁ করবে। ও নিজেই বলল।"

"হঠাৎ মত পরিবর্তন?"

"কে জানে কেন? আসলে ওর খুব টেনশন যাচ্ছে বুঝলি তো। বাড়িতে মা অসুস্থ আরও কীসব প্রবলেম আছে। যাক যখন নিজেই বলেছে যে প্র্যাকটিস করবে, করুক।"

"তা করুক, কিন্তু দেখ কতটা সিরিয়াসলি করে। যা চারদিকে শুনছি গত ম্যাচটা নাকি ইচ্ছে করে ছেড়ে দিয়েছিল ও।"

ডুডু বাধা দিল এবার। বলল, "ফালতু কথা। দিয়েগো অমন ছেলেই নয়।"

"ডুডু, তুই যাই বলিস রবিন মেমোরিয়ালের ছেলেরা কিন্তু তেমনই বলেছে।" কবীর গম্ভীর হয়ে বলল।

"ওরা এমনি বলে আমাদের টিম ভাঙতে চাইছে। ডোন্ট গো বাই দেম কবীর। যাক গে আমি এবার কাটি। আজ পরীক্ষা শেষ বলে মেঘাদিদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছে। জেঠিমা, মানে মেঘাদির মা যা রান্না করে না! কথা হবে না বাঙালি।" বলে ডুডু সাইকেলটা নিয়ে এগিয়ে গিয়েও কিছু মনে পড়াতে থেমে গেল হঠাৎ, তারপর কবীরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁরে, টাপুর তোর কথা জিজ্ঞেস

করছিল। কোনও কেস করিসনি তো? মেয়েটা কিন্তু সুবিধের নয়, আবার বলছি।"

"না না, তুই চিন্তা করিস না।" কবীর স্বাভাবিকভাবে উত্তর দিল।

ডুডু আর ঘাঁটাল না। বলল, ঠিক আছে যা পারিস কর। আমি এলাম।" ডুডু চলে গেল।

'টাপুর' নামটাই কেমন করে দেয় কবীরকে। কবীর কেন এত ভালবাসে টাপুরকে? কত ঝঞ্ঝাটেই না পড়ে এইজন্য। তবু টাপুরের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকে ওর। এইরকম আগুনের মতো একটা মেয়ে, ওকে কবীরের চাই-ই চাই। সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথম যার মুখটা ওর মনে পড়ে সেটা টাপুরের আর রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগের মুহূর্তে যার মুখটা মনে পড়ে সেটাও টাপুরেরই। মনে মনে খুব ভাল হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে কবীরের। মহান হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে। যেদিন টাপুর ওর সঙ্গে কথা বলে সেদিন ও সবাইকে মনে মনে ক্ষমা করে দেয়। রাস্তায় বসা ভিখিরিকে নিজের জামাটাই খুলে দিয়ে দিতে ইচ্ছে করে ওর। কোথায় যেন ও পড়েছিল, "লাভ ব্রিংস দ্য বেস্ট আউট অব ম্যান।" প্রেমে পড়লে সব ছেলেরাই কি মহান হয়ে পড়ে? অবশ্য কবীরকে অপদস্থও কম হতে হয় না টাপুরের জন্য। এই গত দু'দিন আগেও তো বাবার কাছে ব্যাপক ঝাড় খেয়েছে কবীর। টাপুর ওর কষ্টটা বোঝে না কেন কে জানে? ও তো পুরু স্যারের পেছনে পড়েছে। তবে স্যারটা ভাল। টাপুরকে পাত্তা দেন না।

তবে টাপুরের পেছনে যে কবীর পড়েছে সেটা ক্রমশ ছড়িয়ে যাচ্ছে বাটানগরে। এই দু'দিন আগে সেটা নিয়েই তো বাবার কাছে ভীষণ ঝাড় খেয়েছে কবীর।

খবরটা বাবার কানে তুলেছে নারুকাকা। ও লোকটা সর্ব ঘটে কাঁটালি কলা। কোত্থেকে খবর জোগাড় করেছে কে জানে? তবে এটা বলতে হবে যে নারুকাকার পরোপকারী নীতির জন্য ওর নেটওয়ার্ক বিশাল। আর টাপুর যেমন মেয়ে, ওর পেছনে ঘুরলে জানাজানি হয়ে যাওয়ার চান্স আছেই।

দু'দিন আগে ছিল অ্যাকাউন্টেসি পরীক্ষা। পরীক্ষা ভালই হয়েছিল কবীরের। দারুণ মেজাজ নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল ও। বাড়িতে ঢোকার মুখে দেখেছিল নারুকাকা বেরোচ্ছে। ওকে দেখে নারুকাকা বলল, "যাও, ভেতরে যাও, আজ খবর আছে তোমার।" সর্বনাশ! কী হল আবার? ভয় পেয়ে গিয়েছিল কবীর। দোতলায় নিজের ঘরে গিয়ে ব্যাগ রেখে, জামাকাপড় পালটে চুপ করে বসেছিল কবীর। কিছুক্ষণ পরেই মা এসে বলেছিল যে বাবা ওকে ডাকছে। বাবা? এই সময় বাড়িতে? মা বলেছিল যে শরীরটা ভাল নেই বলেই বাবা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছে। বাবা নিজের থেকে সহজে ডেকে পাঠায় না কবীরকে। ভয়ে ভয়ে কবীর গিয়েছিল বাবার কাছে।

একটা রকিং চেয়ারে বাবা বসে ছিল। হাতে মোটা একটা ইংরাজি বই। কবীর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বাবা কোনও কথা না-বলে বই পড়ে যাচ্ছে। কবীর জানে এ ঝড়ের ইঙ্গিত। বাবা এরকমই করে। সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দাঁড় করিয়ে রাখে। বাড়িতে সবাই বাবাকে ভয় পায়। এমনকী বাবার কাকারা, মানে কবীরের দাদু যাঁরা, তাঁরাও কবীরের বাবার সামনে সবসময় একটা হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ ভাব নিয়ে আসে। কবীরের বাবা উকিল মানুষ। সারাদিন বিভিন্ন মক্কেলের সঙ্গে আর কোর্টে প্রচুর কথা বলতে হয়। তাই বোধহয় বাবার কথা ফুরিয়ে যায় আর বাড়িতে চুপ করে থাকে। দশটা কথা বললে একটা কথার উত্তর দেয়। মাঝে মাঝে বাবাকে 'ওরে ব্বাবা' মনে হয় কবীরের।

মিনিট দশেক পরে বাবা বই থেকে মুখ না-সরিয়েই বলল, "পরীক্ষা কেমন হচ্ছে?"

কবীর আমতা আমতা করে বলল, "ভালই তো।"

"এর পর তো হায়ার সেকেন্ডারি, তারপর কী করবে ভাবছ?" বাবা বইয়ের আড়াল থেকে প্রশ্ন করল।

"ভাবছি ফাউন্ডেশন দিয়ে সি এ পড়ব।"

"সি এ পড়বে? আমার ইচ্ছে তুমি ল পড়ো।"

"ল?" কবীর থতমত খেয়ে গেল।

"হ্যাঁ, ল। আমাদের ফ্যামিলি ট্রাডিশনটা তুমি ছাড়া আর কে বজায় রাখবে?"

কবীর ঈষৎ প্রতিবাদ করে বলল, "কিন্তু সি এ তে প্রসপেক্ট ভাল। মানে..."

"কোনও মানে নয়। এখন থেকে সমস্ত ডিসিশন কি তুমিই নেবে তা হলে? দিনকে দিন বাঁদর হয়ে উঠছ।" বাবা এবার বইটা রেখে হুংকার দিল।

"আমি বলছিলাম..." কবীর কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বাবার দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। গুলির মতো চোখের দৃষ্টি গায়ে এসে বিঁধছে ওর। বাবা এবার কেটে কেটে জিজ্ঞেস করল, "তুমি খুব লায়েক হয়েছ না? নিজের ভালমন্দ সব বোঝো তুমি? পাখনা গজিয়েছে? টাপুর কে?" শেষ প্রশ্নটায় প্রায় প্যান্ট খুলে যাওয়ার মতো অবস্থা হল কবীরের। ওর মনে হল ওর পেটের মধ্যে একটা জলহস্তী ঢুকে খুব দাপাদাপি শুরু করেছে। বাবার সঙ্গে বসে টিভি পর্যন্ত দেখে না কবীর পাছে কোনও বিজ্ঞাপনে ছেলেমেয়েরা জড়াজড়ি করছে দেখায়। পাছে কোনও সিনেমায় চুমুটুমু দেখিয়ে ফেলে। সেই বাবা ওকে টাপুর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে! কবীর কী বলবে ভেবে না-পেয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বাবা এবার চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, "ডোন্ট বি আ মিউট পাপ্পি। আনসার মি, হু ইজ টাপুর?"

"টা... টা... টা..." কথা আটকে গেছে কবীরের।

"শোনো, নারু এসেছিল। বেশ ক'দিন ও তোমায় দেখেছে যে তুমি ওই মেয়েটার পেছনে ঘুরঘুর করছ। এসবের মানে কী? একটা ভদ্র বাড়ির মেয়ের পেছনে তুমি অসভ্যের মতো ঘুরছ কেন?" বাবা ভীষণ রেগে গেছে। কবীর কোনও কথা না-বলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তবে রাগও হতে লাগল ভীষণ, ব্যাটা 'গুড় চা', দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি। চুকলি কাটা হয়েছে? চুকলিখোর।

বাবা এবার সম্পূর্ণ নতুন দিক থেকে আক্রমণ করল, বলল, "তুমি জানো না যে টাপুর হিন্দু। সবাই যদি জানে যে তুমি ওর পেছনে ঘুরছ

তবে ফলটা অন্য রকম হবে। তুমি চাও যে তোমার বাবার মাথা লজ্জায় হেঁট হয়? চাও তুমি?" প্রশ্নটা যে উত্তর আশা করছে না কবীর সেটা ভালই জানে। বাবা এবার কঠিন কিন্তু শান্ত গলায় বলল, "আর যেন না-শুনি যে তুমি ওর পেছনে ঘুরঘুর করছ। বুঝেছ? এবার এসো।" বাবা আবার বই তুলে নিল।

সেদিন বাবার ঘর থেকে নিজের ঘরটার দূরত্বটা বিশাল মনে হয়েছিল কবীরের। কিন্তু টাপুরকে ও ভালবাসবে না। হয় নাকি? আর হিন্দু মুসলিম? ধুর ওসব কবীর মানেই না। দু'হাজার পাঁচ সালেও যদি এসব মানতে হয় তা হলে তো হয়েছে। তবে কবীর সেদিন থেকে আরও সতর্ক হয়েছে। আজ তাই ডুডু ওকে টাপুর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করাতেও কিছু বলেনি। ও কাউকে কিছু বলবে না, যা করার নিজেই করবে।

কিন্তু প্রথমে গুড় চায়ের জন্য বাঁশের ব্যবস্থা করতে হবে। আর এর জন্য শ্রেষ্ঠ বাঁশঝাড়টা হল জ্যাকসন। কবীর ইচ্ছে করেই স্কুলে কিছু বলেনি। আজ পরীক্ষা শেষ হল। বেশ ফ্রি লাগছে কবীরের। আজ সন্ধেবেলা কবীর জ্যাকসনের বাড়ি যাবে। 'গুড় চা'কে টাইট করতে জ্যাকসনকে ওর দরকার। ওর বিটকেল মাথা থেকে নিশ্চয়ই কোনও আইডিয়া বেরোবে। কিন্তু টাপুরের কেসটা বলা যাবে না। অন্য কোনও বাহানা করতে হবে।

কবীরের সাইকেলটা বটতলায় এসে থামল। সামনেই জ্যাকসনদের বাড়ি যাওয়ার রাস্তা। কিন্তু কবীর সাইকেলটা ইচ্ছে করে থামায়নি। বটতলায় বটগাছটার নীচে একটা আড্ডা বসে, সেখান থেকে ওর নাম ধরে কেউ ডেকেছে। জায়গাটা এমন অন্ধকার যে কবীর ঠিক দেখতে পেল না কে ওকে ডাকছে। কিন্তু যে ডেকেছে সে এবার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল সামনে। পুরু স্যার! ও, স্যার এখানে আড্ডা মারেন। কবীর একটু সংকুচিত হয়ে গেল মনে মনে। সেদিন জোশের মাথায় স্যারকে থ্যাঙ্কস ট্যাঙ্কস বলে দিয়েছিল। সেদিনের পরে দু'দিন মাত্র প্র্যাকটিস হয়ে

পরীক্ষার জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কবীর দু'দিনই ডুব দিয়েছে। পুরু স্যার সেদিনের পর কবীরকে আর সামনে পাননি। আজ নিশ্চয়ই সেই প্রশ্নটাই তুলবেন।

"কবীর, পরীক্ষা কেমন হল?" পুরু সামান্য হেসে জিজ্ঞেস করল।

"ভাল, স্যার।"

"তুমি পরশু থেকে প্র্যাকটিসে আসছ তো। শেষ দু'দিন কিন্তু আসোনি।"

"হ্যাঁ স্যার, আসব।" কবীর নিচু স্বরে বলল। পুরু নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল ওর দিকে, খুব অস্বস্তি হচ্ছে কবীরের। পুরু স্যার কী বলবেন বলে ফেললেই তো পারেন। পুরু এবার সত্যিই বলল, "কবীর, আমি তোমার চেয়ে ছ'-সাত বছরের বড় হব। তোমার দাদার মতোই ধরতে পারো আমায়। তুমি আমায় বলবে কোথায় তোমার সমস্যা হচ্ছে?"

কবীর বুঝতে না-পারার ভান করে বলল, "মানে?"

পুরু মুচকি হাসল, বলল, "তুমি এত বোকা নও কবীর। শোনো, যা করবে ভেবেচিন্তে করবে। এমন কিছু করবে না যাতে তোমার নিজের জীবনে সমস্যা হয়। সামনে এইচ এস। পড়াশুনোটা খুব ভাল করে করা দরকার। আর হ্যাঁ সঙ্গে ফুটবলটাও আছে। দ্যাখো, আমি খুব সাধারণ মানুষ, আমার একার কিছু করার ক্ষমতা নেই। তোমরা যদি সাহায্য না-করো পরের ম্যাচটা আমরা জিতব কী করে? দিয়েগো প্র্যাকটিসে গন্ডগোল করছে, তুমি শেষের দু'দিন এলে না। কেউ তো মুখ দেখে তোমাদের জেতাবে না।"

"স্যার, আসলে সব কিছু এত টাফ হয়ে যাচ্ছে যে সামলাতে পারছি না।"

"কেন সামলাতে পারছ না? কী কাজ করতে হয় তোমায়? পড়াশুনো আর খেলা। এতেই সামলাতে পারছ না? নাকি এখানেও কোন থার্ড ডাইমেনশন আছে?"

কবীর থমকাল একটু, স্যার কি সেই সন্ধের কথা বলছেন? পুরু আবার বলল, "শোনো কবীর, জানো তো সমস্যা ভাবলেই সমস্যা।

তোমরা ইয়ং, প্রমিসিং, জাস্ট মুভ অন ইন লাইফ। কোনও কিছু করে সেটা নিয়ে রিপেন্ট করে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তার চেয়ে ভুলে যাও। মুভ অন।" কথাটা শেষ করে অর্থপূর্ণ ভাবে হাসল পুরু, "ঠিক আছে তবে, পরশু প্র্যাকটিসে দেখা হচ্ছে কেমন?"

পুরু চলে যাওয়াতে কবীরের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন। পুরু স্যারকে যত দেখছে তত অবাক হচ্ছে কবীর। স্যার আগে ফুটবলার ছিলেন। মানে স্পোর্টসম্যান। নাহ এই মানুষটার কথা শোনা যায়। এর জন্য অনেক কিছুই করা যায়। আর টাপুরের ব্যাপারে স্যার যা করলেন সেটা তো ফেনোমেনন। স্যারের নম্বর অনেক বেড়ে গেছে কবীরের কাছে।

এখন গিয়ে জ্যাকসনের সঙ্গে দেখা করাটা বাকি। কবীর আবার মুগ্ধতার জামা ছেড়ে বাঁশ দেবার কেটারিংয়ের জামা গায়ে চড়াল। এই বটতলার মোড় থেকে জ্যাকসনদের বাড়ি সাইকেলে তিন-চার মিনিটের পথ। সামনেই নেতাজি সঙ্ঘ ক্লাব, তারপরে একটা মাঠ, সেই মাঠ পার হলেই জ্যাকসনদের বাড়ি।

কিন্তু মাঠটা পার করতে পারল না কবীর। তার আগেই একটা বড় ছাতিম গাছের নীচে চার-পাঁচটা ছেলে আচমকাই ওর সাইকেল দাঁড় করিয়ে দিল। কবীর প্রথমে চমকে গেলেও মুহূর্তে সামলে নিল। রুদ্র অ্যান্ড কোং। "কী মজনু কুমার কী খবর?" রুদ্রর গলায় ব্যঙ্গ আর বিষ লক্ষ করল কবীর। "কী মুখে কথা সরছে না? সাইকেল থেকে নাম, নাম শুয়োরের বাচ্চা।" রুদ্র খশখশে গলায় বলল।

"কী বললি? কী বললি তুই?" কবীর চিৎকার করে লাফ দিয়ে নামল সাইকেল থেকে। সাইকেলটা কাত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

রুদ্র কবীরের কলার ধরে দাঁত চেপে বলল, "বললাম শুয়োরের বাচ্চা মাগিবাজ। টাপুরের পেছনে লেগেছিস? একদম ভেঙে দেব শালা।" কবীর কলার ছাড়াবার জন্য ধস্তাধস্তি করতে লাগল। পারল না। অন্য ছেলেগুলো ওকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে ছাতিম গাছের সঙ্গে চেপে ধরল। রুদ্র কবীরের গালে ঠাস করে এক থাপ্পড় মেরে বলল,

"সাবধান করে দিলাম, টাপুরের পেছনে ঘুরবি না। না হলে এই বয়েসে ফলসটিথ পরে ঘুরতে হবে।"

কবীর তেজের সঙ্গে বলল, "কেন রে! টাপুর তোর বাপের সম্পত্তি?"

"শুয়োরের বাচ্চা তোমার পুরকি বেড়েছে, না? যা বলছি শোন। লাস্ট ওয়ার্নিং দিলাম তোকে।" এবার তলপেটে একটা মোক্ষম ঘুষি মারল রুদ্র, কবীরের চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে গেল যেন। হাঁটু দুটো হঠাৎ দুর্বল লাগল খুব। ও মাটিতে বসে পড়ল। রুদ্র এবার একটা লাথি মারল কোমরে। কবীর মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। অন্য ছেলেগুলো অকথ্য খিস্তির সঙ্গে লাথি মারতে শুরু করেছে ওকে। কবীর উঠতে পারছে না। ওর শরীরটার ওপর দিয়ে যেন হাতি হেঁটে চলে গেছে। ছাতিম গাছ, সামনের মাঠ, তার অন্য দিকের বাড়িগুলো ক্রমশ আবছা হয়ে আসছে চোখের সামনে। হঠাৎ গরম জলের মতো কী যেন ওর গায়ে পড়তে লাগল। ফুলে যাওয়া চোখটা কষ্ট করে খুলে দেখল রুদ্র ওর ওপর দাঁড়িয়ে ওর গায়ে পেচ্ছাপ করছে আর সমানে খিস্তি করে যাচ্ছে। শরীর গুলিয়ে উঠল কবীরের। পেটের মধ্যের সব কিছু ওপর দিকে উঠে আসতে লাগল। ভাবল কেউ কি নেই ওকে বাঁচাবে? পাড়াটা এমনিতেই নির্জন, তা বলে এতটা! প্যান্টের জিপার আটকে রুদ্র ওর জুতোটা কবীরের মুখে রাখল, বলল, "এর পরের বার পেচ্ছাপটা খাওয়াব।"

ছাতিম গাছের নীচে একা পড়ে রইল কবীর। গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে অর্ধেক চাঁদ দেখা যাচ্ছে। দু'-চারটে তারাও। কবীর ভাবল এত কিছু ও টাপুরের জন্য সহ্য করছে সেটা কি টাপুর কোনও দিনও বুঝবে না? মেয়েরা কি কোনওদিন ছেলেদের বোঝে না? কিন্তু মাথাটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। কিচ্ছু চিন্তা করতে পারছে না স্পষ্ট করে। কবীর উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু পায়ে জোর পাচ্ছে না একদম। সারা শরীরে ব্যথা। মাথাটা টলে গেল ওর। পড়েই যাচ্ছিল, কিন্তু একটা হাত শক্ত

করে ধরল ওকে। ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছে না কবীর। চোখ ফুলে গেছে, চোখ দিয়ে জলও বেরোচ্ছে। সেই জলের আবছা পরদা ভেদ করে এই আধো অন্ধকারে সেই হাতের মালিকের মুখটা দেখল ও। এই সময়ে এখানে ও কী করছে? এই ঘোলাটে মাথাতেও কবীর টান মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিল। কিন্তু ভারসাম্য রাখতে না-পেরে আবার পড়ে গেল মাটিতে। হাতটা এবার শক্ত করে কবীরকে ধরে টেনে তুলল মাটি থেকে। হাতের মালিক বলল, "কী ছেলেমানুষি করছিস কবীর? কী হয়েছে তোর? কে মেরেছে? আমায় বল।" কবীর আবার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল, অস্ফুটে বলল, "বলব না, তোকে বলব না, বিশ্বাসঘাতক।"

১১

মাঘের শীত বাঘের গায়ে, কিন্তু পৌষের শীত কার গায়ে? মৌষের গায়ে। ধুর মোষকে কি মিল দেবার জন্য মৌষ বলা যায়? কিন্তু যেটা ঘটনা সেটা হল শীত। হ্যাঁ, এবার এই ডিসেম্বরের থার্ড উইকেই হাড় অবধি ঠান্ডা কুরিয়্যর করে পৌঁছে দিচ্ছে পৌষমাস। আশ্চর্য এই, যে পয়লা বৈশাখ এলে বৈশাখ বোঝা যায়, বৃষ্টি শুরু হলে বোঝা যায় আষাঢ়, দুর্গাপুজোর জন্য আশ্বিনের হেভি রং, আর পৌষ-মাঘ বোঝা যায় শীত, পিঠে আর সরস্বতী পুজোর জন্য। অন্য বাংলা মাসগুলো মহাভারতের নকুল সহদেবের মতো ভিড় বাড়াতে আছে, কিন্তু তেমন গুরুত্ব নেই। ছেলেরাও যে উপেক্ষিত হতে পারে নকুল-সহদেব তার প্রমাণ। অবশ্য নকুলদানার মধ্যে দিয়ে হয়তো নকুলকে ইমমরটালাইজ করা গেছে কিন্তু সহদেব বেচারার মরুভূমি অবস্থা। যাঃ বাব্বা শীত থেকে কোথায় সহদেব এসে পৌঁছে গেছে। এই হচ্ছে ডুডুর সমস্যা। একবার চিন্তা করতে শুরু করলে আফ্রিকার আদিবাসীদের সঙ্গে ইগলুর সম্পর্কও স্থাপন করে ফেলতে পারে ও।

“কী রে আবার মাথার পোকাগুলো ছটফট করছে নাকি? নে তাড়াতাড়ি ব্যাগদুটো গাড়িতে তুলে দে।” মেঘাদি লিপস্টিকটা ‘টুইস্ট ইন’ করে ডুডুকে হুকম করল। আজ রবিবার, প্র্যাকটিস বন্ধ। কিন্তু তা বলে ডুডুর ছুটি নেই। ডুডু ভেবেছিল দুপুরে বাড়িতে বসে অঙ্ক করবে। ওদের কমার্সে পঞ্চাশ নম্বরের ম্যাথস্ আছে। আর ডুডু মোটামুটি পারেও সাবজেক্টটা। কিন্তু গোলমাল হয় কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি নিয়ে। কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি এক বিশাল জিনিস। কিছুতেই বাগে আনতে পারে না ডুডু। কিন্তু তা বলে ফেলে পালায় না। এটা ডুডুর একটা ব্যাপার। কেউ কেউ গুণও বলে। ওর যা কঠিন লাগে সেটাকে যতক্ষণ না বাগে আনতে পারে ডুডুর শান্তি হয় না। কিন্তু অঙ্ক করবে কী, কাজ পড়ে গেছে যে, মেঘাদি ডেকে পাঠিয়েছে।

আজ সন্ধেবেলা মেঘাদি আর ওর নাচের ট্রুপের অনুষ্ঠান আছে রবীন্দ্রসদনে। মেঘাদির নাচের ট্রুপ মানে মেঘাদি আর ওর আটজন ছাত্রী। সবাইকে মেঘাদি নাচের অনুষ্ঠানে নিয়ে যায় না। মেঘাদির কথা হল ঠিকমতো নাচ না-শিখে নাচতে গেলে স্টেজ বাঁকা মনে হবে। মেঘাদি যোগ্যতা অনুযায়ী ছাত্রীদের সুযোগ দেয়।

একটা ব্যাপার অবশ্য ডুডুকে আনন্দ দিয়েছে, আজ সায়েকা নেই। কিন্তু ঠিক আনন্দ কি? মানে, আনন্দ নয়, বলা যেতে পারে স্বস্তি। মেয়েটার সামনে এলেই কেন জানি না সব কিছু গোলমাল হয়ে যায় ডুডুর। পেটের মধ্যে কেমন বোলতা উড়তে শুরু করে। মাঝে মাঝে ডুডু ভাবে এটা কি অন্য কিছুর সিগন্যাল? কিন্তু অন্য কিছুটা যে কী সেটা আর নিজের কাছে ভাবসম্প্রসারণ করে না। সায়েকার টাইটেল ‘জানা’ আর ও ‘ব্যানার্জি’ ফলে ভাবসম্প্রসারণ করলে অসবর্ণ কেস আছে। তাই ভাবসম্প্রসারণে একটা বিশাল বড় ‘শূন্য’ দেখতে পায় ডুডু। আর একটু বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই শূন্যটা ক্রমশ ওর ঠাকুরদার মুখের আদল নেয়। তাই ডুডু রিস্ক নেয় না। সায়েকার থেকে পালিয়ে পালিয়ে থাকে।

ডুডু দুটো ব্যাগ নীচে দাঁড়ানো স্করপিও-তে তুলে ফিরে এল। ব্যাগ দুটোয় নাচের ড্রেস আর প্রপ আছে। কিন্তু যা ওজন তাতে পাথরটাথর কিছু থাকাও আশ্চর্য নয়। ব্যাগদুটো রেখে আবার ঘরে এসে দাঁড়াল ডুডু। যতক্ষণ না মেঘাদিরা যায় ওকে এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কখন কী কাজের হুকুম আসবে কে বলতে পারে। তবে দাঁড়িয়ে থাকতে খারাপ লাগছিল না ডুডুর। একঘর মেয়ের মধ্যে দু'পায়ে কেন এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতেও খারাপ লাগে না ছেলেদের। কিন্তু ডুডুর খারাপ না-লাগার পিছনে কারণটা অন্য। ও মুগ্ধ হয়ে দেখছিল আটটা মেয়ের সাজগোজের কম্পিটিশন। মেঘাদির ড্রেসিং টেবিলটার দখল কে নেবে সেই নিয়ে এক খণ্ডযুদ্ধ চলছে সামনে। এ ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে, ও এর হাতের তলা দিয়ে মাথা গলিয়ে দিচ্ছে, কেউ আবার স্ট্রেট কনুই দিয়ে গুঁতিয়ে জায়গা করে নিচ্ছে। একবার বনগাঁ লোকালে ওঠার অভিজ্ঞতা হয়েছিল ডুডুর। ওর সামনে অবিকল বনগাঁ লোকালের সিন চলছে। ডুডু ভাবল একবার ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটা ভেঙে সবার হাতে এক টুকরো করে ধরিয়ে দেবে কিনা। আর মেয়েগুলোরও বলিহারি। এখানে এত সেজেগুজে লাভ কী? এখান থেকে গাড়ি করে রবীন্দ্রসদনে পৌঁছোতে পৌঁছোতে চোখের মাসকারা গলে তো ঠোঁটে নামবে। ওখানে গিয়ে তো অনুষ্ঠানের আগে সাজতেই হবে। এদের ব্যাপার স্যাপার বিশেষ বোঝে না ডুডু। ওর নিজের তো আয়না দেখলেই খালি জেমস বন্ডের মতো নিজের নামটাই শুধু বলতে ইচ্ছে করে। আচ্ছা এটা কি কোনও পাগলামো? ঠিকুজিতে দ্বাদশে চন্দ্র আর শনির কী একটা কেস থাকলে নাকি মাথার তার কাটা হয়। ওর নাকি সেটা আছে। কথাটা মনে পড়াতে ডুডুর অস্বস্তি হতে লাগল। আচ্ছা ডুডুর তো প্রায় আঠারো বছর হল, তবে এমন ছেলেমানুষি চিন্তা আসে কেন? না এবার থেকে গম্ভীর হতে হবে, মনে মনে ঠিক করল ডুডু।

"কী রে এই গুণটা কবে থেকে হল তোর? এখানে কেষ্ট ঠাকুরের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়ে দেখা হচ্ছে। সে যদি জানতে পারে না, কেষ্ট থেকে শিশুপাল করে ছাড়বে।" মেঘাদি কপটভাবে চোখ পাকিয়ে

বলল। ডুডু দেখল মেঘাদির সাজগোজ কমপ্লিট, এবার বেরোবার অপেক্ষা। ডুডু জিজ্ঞেস করল, "মানে? কার কথা বলছ তুমি?"

"ন্যাকা, বোঝে না যেন। তবে যাই বলিস মেয়েটা ভাল। তোর সঙ্গে মানাবেও খুব।" মেঘাদি সবজান্তার মতো হেসে বলল।

"আচ্ছা মুশকিল! কার কথা বলছ তুমি?" ডুডু একটু বোকা সাজবার চেষ্টা করল।

"নামটা না শুনলে হচ্ছে না, না? সায়েকার কথা বলছি। এখানে আসলেই তোর কথা, আমার তো সন্দেহ হয় এখানে ও নাচ শেখার জন্য আসে, না তোকে দেখবে বলে?"

ডুডুর কান লাল হয়ে উঠল। ও বলল, "দূর কী যে বলো না। আমাকে দেখলেই তো হ্যাটা করে।"

"ও-সব অন্য হ্যাটা। তবে রিসেন্টলি তোর ওপর একটু রেগে আছে মনে হচ্ছে, কী রে কিছু করেছিস?" মেঘাদি চোখ সরু করে জিজ্ঞেস করল।

"কই না তো। কিচ্ছু করিনি।" ডুডু ঢোক গিলে বলল।

কথাটার মধ্যে সত্যি মিথ্যের মিক্সচার আছে। ডুডু কিছু করেওনি আবার করেছে। ব্যাপারটা হল ওদের টেস্টের আগে একদিন জ্যাকসন আর দিয়েগোর সঙ্গে গ্যাজনখানার থেকে ফিরছিল ও। সাহেব কলোনির সামনে হঠাৎ পরীর সঙ্গে দেখা। যা হয়, পরী ওকে খুঁজছিল একটা কাজে। ওকে দেখামাত্র পরীর নিজের স্বভাবমতো হামলে পড়ল ওর ওপর। পরীর এই একটাই দোষ। গায়েফায়ে হাত না দিয়ে কথা বলতে পারে না। ব্যস রাস্তায় দেখামাত্র হাত ধরে টানাটানি, ওর সঙ্গে যেতে হবে ওর মায়ের এক্সরে রিপোর্ট আনতে। ডুডু না না করলেও ততক্ষণে যা সর্বনাশ হওয়ার তা হয়ে গেছে। ডুডুর এমনই কপাল ঠিক সেই সময়ই সায়েকা আরেকটা মেয়ের সঙ্গে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাচ্ছিল। ডুডু যেমন ওকে দেখেছিল, ও-ও ডুডুকে দেখেছে। ডুডুর অবস্থা হয়েছিল সাপের ছুঁচো গেলার মতো। পরীর সঙ্গে সাইকেল করে যাওয়ার সময় একবার পেছন ফিরে ডুডু দেখছিল সায়েকা ফুচকাওয়ালার ওখান থেকে

ওর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে আছে। ফুচকাওয়ালার ওপর ভীষণ রাগ হয়েছিল ডুডুর। ক্যালানেটা ফুচকা বিক্রি করার আর জায়গা পেল না।

কিন্তু কেন সেদিন ফুচকাওয়ালার ওপর রাগ হয়েছিল ডুডুর। প্রশ্নটা ওর মনের মধ্যে দু'-একবার উঠলেও ও সেটা নিজেই এড়িয়ে গেছে। কারণ 'প্রশ্নগুলো সহজ আর উত্তরটাও জানা।' এক জ্যোতিষী ডুডুকে বলেছিল ওর ঠিকুজিতে শুক্র গোলমেলে জায়গায় আছে। তাই কি এইসব ঝঞ্ঝাট হচ্ছে? ডুডু নিজে একবার ডান হাতটা মেলে হাতের পাতাটা দেখতে লাগল। 'বেনহাম'-এর হাত দেখার একটা বই মাঝে মাঝে ডুডু পড়ছে এখন। বুড়ো আঙুলের নীচের মাংসল অংশটা শুক্রক্ষেত্র। কিন্তু কই ও তো কোনও গন্ডগোল দেখতে পাচ্ছে না। বেশ গোলাপি, ফোলা ফোলাই তো জায়গাটা। জ্যোতিষীটা ঢপ মারেনি তো?

"কী রে সায়েকার নাম শুনেই তো অন্যমনস্ক হয়ে গেলি। দাঁড়া, কাকিমাকে বলব আমার ছাত্রীর মাথা খাচ্ছিস তুই।" মেঘাদি চোখ পাকিয়ে বলল।

ডুডু হেসে বলল, "মাথা খাব আমি? ও মাথা লোহার তৈরি। আচ্ছা তোমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে না?" ওর কথায় হুঁশ হল মেঘাদির। নিমেষে ঘরের ছাত্রীদের তাড়া দিতে লাগল। ডুডু অবাক হয়ে দেখল ইতিমধ্যে আটজন ছাত্রীই তৈরি হয়ে গেছে। অত বড় যুদ্ধ করে ওদের শাড়ির পিন, মাথার ফুল, শাড়ির কুঁচি সব ঠিকঠাক হয়ে আছে। মেয়েরা পারে, সত্যি, মেয়েরাই পারে। ছেলেগুলো একটুতেই হেদিয়ে বিরক্ত হয়ে যায়। ডুডু দেখল মেয়েগুলোকে দিব্যি ভাল লাগছে। হঠাৎই ওর মনে হল সায়েকা এমন সাজলে কেমন লাগত? ওঃ আবার? নিজেকেই ধমক দিল ডুডু। ওর ভেতরের ছেলেটা দেখছি গন্ডগোল না-পাকিয়ে ছাড়বে না। ডুডু আর দাঁড়াল না। ছাত্রীদের সঙ্গে নীচে নামতে লাগল। মেঘাদিদের যাওয়ার সময় হল।

গাড়ির সামনের সিটে মেঘাদি বসে। গাড়িটা চকচকে মেরুন রঙের।

মেঘাদি নতুন কিনেছে। অবশ্য নিজে চালায় না, ড্রাইভার আছে। মেঘাদি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, "তুই কিন্তু গেলে পারতিস ডুডু।"

"না মেঘাদি। অন্য আরেক দিন যাব।" ছোট্ট করে হেসে ডুডু বলল।

"অবশ্য একজন থাকলে হয়তো যেতিস, না?" বলেই মেঘাদি চোখ টিপল। ডুডু কিছু বলল না, হাসল শুধু। সত্যিই ওয়ান ট্র্যাক মাইন্ড মেঘাদির। অন্যদের প্রেমে কিউপিড হতে কী যে ভাল লাগে মেয়েদের কে জানে! ডুডু মাঝে মাঝে দেখেছে অন্য কেউ প্রেমে পড়লে মেয়েরা অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে পড়ে যেন সে নিজেই প্রেমে পড়েছে। আর সত্যি কথা বলতে কী ছেলেদের একই খবর শুনলে, হিংসে হয়। সেটা তারা উদাসীনতা দিয়ে ম্যানেজ করে। ওঃ আবার ভাবতে শুরু করেছে ডুডু।

মেঘাদিদের গাড়িটাকে ছোট হয়ে মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত দেখল ডুডু। এবার বাড়ি যাওয়ার পালা। সবে তিনটে বাজে। ঘণ্টা দেড়েক অঙ্ক করাই যাবে। ডুডু বাড়ির দিকে চলল। গ্রিলের গেটটা খুলে ভেতরে ঢুকেই দেখে একটা সাইকেল স্ট্যান্ড করা আছে। গিয়ার চেঞ্জিং, লাল রেসিং সাইকেল। এরকম সাইকেল বাটানগরে আর একটাও নেই। ডুডু বুঝল জ্যাকসন এসেছে। বহুদিন ডুডুরও এরকম একটা সাইকেল কেনার শখ, কিন্তু ডুডু জানে বাবা কিনে দিলেও ঠাকুরদা আপত্তি করবেন। ঠাকুরদা অতিরিক্ত খরচ করতে সবসময় বারণ করেন। বলেন পিঁপড়ে যতটা গুড় খেতে পারে তার চেয়ে বেশি নিলে তার মধ্যে আটকে নিজেই মারা পড়ে। ফলে নো গিয়ার চেঞ্জিং সাইকেল।

ডুডু ড্রইংরুমে ঢুকে দেখল সর্বনাশের মাথায় বাড়ি। জ্যাকসন বসে আছে ঠাকুরদার সামনে। ঠাকুরদা ভীষণ সিরিয়াস মানুষ। আর জ্যাকসন সিরিয়াস বানানটা পর্যন্ত ঠিকমতো করতে পারে না। জ্যাকসন একবার ডুডুকে বলেছিল, "তুই ঠাকুরদাকে ঠাকুরদা না-বলে দাদু বলিস না কেন? ঠাকুর কথাটা শুনলেই শোলের সঞ্জীবকুমারকে মনে পড়ে। আর মাইরি তোর দাদু ওরকমই। এমন চেপে কথা বলে, সবসময় সিরিয়াস। কেমন পিকিউলিয়ার না?" সেই জ্যাকসন বসে ঠাকুরদার সামনে।

ডুডু ঠাকুরদার পাশে গিয়ে বসতেই জ্যাকসন ওকে লক্ষ করে বলে

উঠল, "চল ডুডু, খুব ইমপর্ট্যান্ট একটা কাজ আছে।" ঠাকুরদা বললেন, "অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, বসো? গতবার বলেছিলাম সন্ধে আহ্নিক করতে। করছ?"

জ্যাকসন রেললাইনের পাথর গেলার মতো মুখ করে বলল, "হ্যাঁ, রোজ। সকালবেলা আর সন্ধেবেলা।"

"সকালবেলা সন্ধে আহ্নিক মানে?" ঠাকুরদা কড়া গলায় প্রশ্ন করলেন।

"না না, মানে সকালবেলা মুখস্থ করে সন্ধেবেলায় আহ্নিক।"

"মুখস্থ করে মানে?" ঠাকুরদা ভুরু কুঁচকে জ্যাকসনের মুখে ফোকাস ফেলেছেন।

"ওই আচমন মন্ত্র। আসলে আমি তো সংস্কৃততে খুব উইক। তাই রোজ মুখস্থ করি, রোজ ভুলে যাই।"

"ছি ছি ব্রাহ্মণের ছেলে সংস্কৃততে দুর্বল। লজ্জা করে না?"

জ্যাকসন ভীষণ লজ্জিত মুখে বলল, "না।"

ঠাকুবদা এবার অন্য দিক দিয়ে ধরলেন, "তা হলে কীসে স্ট্রং তুমি? কমার্সের কোনও সাবজেক্টে নিশ্চয়ই।"

জ্যাকসন দুম করে বলে দিল, "ফিজিক্সে।" ডুডু চোখ বন্ধ করে ফেলল। একেই বলে 'বাঁশ আছ কেন বনে এসো আমার পিছনে।' জ্যাকসন কমার্সের কোনও সাবজেক্ট বললে পার পেত। এবার ঠেলা বুঝবে। কারণ ঠাকুরদা ফিজিক্সেরই প্রফেসার ছিলেন। ছাগলটা কেন যে ভুলভাল কথা বলে সবসময়। ঠাকুরদা বললেন, "তা হলে কমার্স নিলে কেন? যাক গে বলো তো মহাকর্ষ বল-এর কথা কে প্রথম উল্লেখ করেন?"

জ্যাকসন চিন্তা করল খানিকক্ষণ। ডুডু ঠোঁট নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করল 'নিউটন'। কিন্তু কে সেসব লক্ষ করে? জ্যাকসন বলল, "বিদেশে কে করেছেন বলতে পারব না। তবে ভারতবর্ষে করেছেন রবীন্দ্রনাথ।"

"অ্যাঁ? রবীন্দ্রনাথ? মহাকর্ষ বল?" ঠাকুরদাকে টপ করে ধরে ফেলল ডুডু। এই বয়েসে যদি অবাক হয়ে খাট থেকে পড়ে যান হাড়গোড় ভেঙে

খুব ঝঞ্ঝাট হবে। ঠাকুরদা সামলে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, "কী রকম?"

"কেন ওই যে গানটা 'কী গাব আমি কী শোনাব...' ওখানে আছে না, 'রবি হতে গ্রহে ঝরিছে প্রেম, গ্রহ হতে গ্রহে ছাইছে।' ওটাই তো মহাকর্ষ। ওই যে সূর্য আর গ্রহদের ভালবাসাবাসি, নিজেদের প্রতি টান, সেটাই তো বল। সত্যি, রবীন্দ্রনাথ ঝকাস্টিক কবি ছিলেন।"

"কী স্টিক?" ঠাকুরদা আরও অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন। ডুডু আবার ঠাকুরদাকে ধরে ফেলল।

আর না, ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে ডুডু উঠে দাঁড়াল, বলল, "অনেক করেছিস, কোথায় যেতে বলছিলি চল।"

বলেই জ্যাকসনকে টান মেরে ওঠাল ও। ঠাকুরদার সঙ্গে আর বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখলে জ্যাকসন নির্ঘাত আইনস্টাইনকে শ্রেষ্ঠ ফুটবলার বানিয়ে ছাড়বে।

দু'জনে সাইকেল নিয়ে রাস্তায় নামল। ডুডু জিজ্ঞেস করল, "কোথায় নিয়ে যাবি?"

"কোথায় আবার, আমার বাড়িতে চল।"

"তোর বাড়ি? কেন? হঠাৎ এই বিকেলে তোর বাড়ি যাব কেন?"

"চল না একটা ব্যাপার আছে। গিয়েই বুঝতে পারবি।"

ডুডু আর কথা বাড়াল না। সাইকেলে উঠে পড়ল। ডুডু জানে জ্যাকসন কিছুতেই বলবে না কী ব্যাপার। ও এবার অন্য প্রশ্ন করল, "আচ্ছা জ্যাকসন, মাইরি তুই ঠাকুরদাকে ওসব ভুলভাল বলছিলি কেন?"

জ্যাকসন ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, "এমনি একটু মজা করছিলাম। গ্র্যাভিটি আর নিউটন যে সিনোনিমাস আমাদের বাড়ির রান্নার লোকটাও জানে। জাস্ট মজা করছিলাম।"

ডুডু মাঝে মাঝে ভাবে জ্যাকসন কি একটু খ্যাপাটে, না ইচ্ছে করে এসব করে? হয়তো লোক হাসাবার জন্য এমন করে বা হয়তো সেন্টার অব অ্যাট্রাকশন হতে চায় বলে এমন বিহেভ করে। ঠিক বুঝতে পারে না ডুডু।

ঠান্ডাটা এবার সত্যিই বড় বেশি পড়েছে। ডুডু সাইকেল চালাতে চালাতেই এক হাতে জ্যাকেটের চেন গলা অবধি টেনে দিল। টমাস বাটা অ্যাভিনিউয়ের ধারে ধারে যে গুলমোহর গাছ সেগুলো প্রায় সব পাতা ঝরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ও দেখল এখনও হালকা হাওয়ায় ছোট ছোট হলুদ পাতারা রঙিন কাগজের মতো নেমে আসছে মাটিতে। পাতা ঝরার মরশুম এখন। গোটা রাস্তার পাশে দুটো হলুদ মেরুন পাতায় ঢাকা আছে। লাল-সাদা একতলা কোয়ার্টারের সামনের মাঠগুলোয় কচিকাঁচারা রঙিন সোয়েটার পরে ক্রিকেট খেলছে। পাতিলেবু রঙের একটা রোদ যাই যাই করছে আকাশে। ডুডু বাটানগরকে যত দেখে তত মুগ্ধ হয়। মনে মনে বাটা কোম্পানিকে ধন্যবাদ দেয়। এত সুন্দর গোছানো একটা শহর কে বানাত ওরা ছাড়া।

জ্যাকসনের বাড়িতে পৌঁছে সাইকেল থেকে নামল ওরা। "কী, বউমা নেই?" প্রশ্নটা শুনে ডুডু পেছন ফিরে দেখল, রাধাকাকু। হাতে ইয়াব্বড় একটা লাল পাখির মতো দেখতে ঘুড়ি। দারুণ জিনিসটা। দেখলেই বোঝা যায় এখানে পাওয়া যায় না। ডুডু টিভিতে এরকম ঘুড়ি ওড়াতে দেখেছে মানুষজনকে। কিন্তু সে তো বিদেশে। রাধাকাকু বোধহয় ডুডুর মুখ দেখে কথাটা আঁচ করল। বলল, "কুশেশ্বরকে চেনো? প্রাণবল্লভ মিত্রের ভাইপো। সেই এনে দিয়েছে, ভাল জিনিস না? জানো তো ঘুড়িটা ফোল্ড করা যায়। এটা প্যারাসুট কাপড়ের তৈরি। নাইলনের সুতো দিয়ে ওড়াতে হয়। আজ ছুটির দিন। প্রথম ওড়াব।" সর্বনাশ! রাধাকাকু ঘুড়ির পেডিগ্রি নিয়ে পড়েছে। ডুডু কাতর মুখে জ্যাকসনের দিকে তাকাল। জ্যাকসন বলল, "সেসব বুঝলাম। এখন যাও টেস্ট করে দেখো ঘুড়িটা সত্যিই ওড়ে কিনা।" যেন হুঁশ হল রাধাকাকুর। "হ্যাঁ হাঁ" বলে রাধাকাকু মাঠের দিকে হাঁটতে লাগল।

জ্যাকসনদের বাড়িতে আজ কেউ নেই। ওর মা গেছে বোনের, মানে জ্যাকসনের মাসির বাড়ি ঢাকুরিয়ায়। রান্নার লোকটা আসে সকালে আর সন্ধেয়, ফলে এখন বাড়ি একদম খালি। ডুডু জিজ্ঞেস করল, "এবার বলবি কেসটা কী?"

জ্যাকসন হাসল। তারপর বলল, "একটু দাঁড়া আমি আসছি।" জ্যাকসনদের বাড়িতে বিদেশি জিনিসে ভরতি। সেগুলোকেই ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল ডুডু। সাউন্ড সিস্টেম থেকে হোম থিয়েটার। প্লাজমা স্ক্রিনের মনিটর সমেত কম্পিউটার। বাবা জাহাজের রেডিয়ো অফিসার। প্রচুর রোজগার করেন।

"এই দেখ।" জ্যাকসনের হাতে দুটো সি ডি।

"কীসের সিডি এই দুটো?" ডুডু জিজ্ঞাসা করল।

"পর্নো।" চোখ টিপল জ্যাকসন।

"কোত্থেকে পেলি?" ডুডু চোখ ছানাবড়া করে জিজ্ঞেস করল।

"আছে আছে, সোর্স আছে। দেখবি তো?" জ্যাকসন জিজ্ঞেস করল।

ডুডু ধন্দে পড়ে গেল। দেখতে ইচ্ছে করছে না তা নয়, তবে কেমন একটা বাধোবাধো ঠেকছে। কিন্তু এও জানে যে পর্নো দেখার একটা সাময়িক উত্তেজনা আছে কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই ভীষণ বোরিং লাগে। ডুডু দেখল ওর কথার অপেক্ষা না করেই ডিভিডি প্লেয়ারে সিডি ঢুকিয়ে দিল জ্যাকসন! "ধুর বস না, তোর সবটাতেই এঁড়েমি। শালা লোকে দেখতে পায় না। আমি এনে দেখাচ্ছি আর তুই পেঁয়াজি করছিস। নে তেমন হলে টিভিতে চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে দে দুটো।"

কিন্তু পর্নো কই? কোনও ছবিই আসছে না। "কী হল বল তো? ছেলেটা বলল চামকি জিনিস আছে। এদিকে শালা চলছেই না।"

ডুডু বলল, "দেখ হয়তো সিডিতে গন্ডগোল আছে।" জ্যাকসন সিডিটা খুলে কম্পিউটারে ঢোকাল। সেখানেও ভোঁ ভোঁ। গোটা সিডিটাই ব্ল্যাঙ্ক। অন্য সিডিটা নিয়েও কসরত শুরু করল জ্যাকসন। কিন্তু সেটাও ব্ল্যাঙ্ক। জ্যাকসনের ফরসা মুখ লাল হয়ে উঠেছে। বাছা বাছা খিস্তি করতে শুরু করল এবার। খুব ক্ষার খেয়ে গেছে ব্যাটা। ডুডু হিহি করে হাসতে লাগল।

জ্যাকসনের সঙ্গে এই টাইপের অ্যাডাল্ট অ্যাডভেঞ্চার করতে গেলেই একটা না-একটা কেলো হয়। একবার টেন পাশ করার পর জ্যাকসন ডুডুকে পাকড়াও করে নিয়ে গিয়েছিল নিউ এম্পায়ারের

গলিতে। বহু দরদাম করে একটা 'প্লেবয়' কিনেছিল ওরা। আসলে প্লেবয়-এর নাম প্রচুর শুনেছে ওরা, দেখেনি কখনও। তাই কৌতূহল ছিল খুব। ভারতে প্লেবয় খোলাখুলি বিক্রি হয় না। কিন্তু লুকিয়ে চুরিয়ে এখানে সব হয়। সেই ম্যাগাজিন নিয়েই খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিল ওরা। দোকান থেকে সবে কিছুটা গেছে অমনি লাল গেঞ্জি পরা একটা লোক এসে দাঁড়িয়েছিল ওদের সামনে। আইডেন্টিটি কার্ড দেখিয়ে বলেছিল যে ও পুলিশ। ভগবান জানে সত্যি কিনা। এখন হাসি পায়। কিন্তু বছর খানেক আগের সেই বিকেলে খুব ভয় পেয়েছিল ডুডু। হাতের ঘড়িটা পর্যন্ত খুলে দিতে হয়েছিল ওদের। বাড়িতে কীভাবে ম্যানেজ করেছিল সে ডুডুই জানে।

"চল তো মালটার থোবনায় ছুড়ে মারব সিডিটা। মাজাকি? শালার দোকান বন্ধ করে দেব।" জ্যাকসন বাড়ির বাইরে এসে সাইকেলে উঠল। ডুডু দেখল জ্যাকসন বাড়িতে তালা না-দিয়েই চলে যাচ্ছে। বলল, "কী রে খেপে গেলি নাকি? বাড়িতে কেউ নেই, তালাটা দিয়ে যা।"

সিডির দোকানটা এক নম্বর গেটের কাছে। এক নম্বর গেট গঙ্গার কাছেই। জ্যাকসন মালটার এলেম আছে। দোকানে গিয়ে এসব চাইতেও পারে। ডুডু তো মরে গেলেও পারত না। সাহেব কলোনির গেটের সামনে থেকে বাঁ দিকের রাস্তাটাই এক নম্বর গেটের দিকে গেছে। ডুডু দোকানে যেতে চাইল না, কেউ যদি দেখে ফেলে? আর জ্যাকসন যা, কেউ না দেখলেও চিৎকার চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করবে। জ্যাকসনও ওকে জোর করল না। এমন রেগে আছে যে এসব ও চিন্তাই করছে না এখন। জ্যাকসন টপ গিয়ারে এক নম্বর গেটের দিকে বেরিয়ে গেল। কিছু শুকনো পাতা খানিকটা উড়ে, খানিকটা ছুটে গেল ওর সাইকেলের সঙ্গে।

ডুডু সাইকেলে *ঠেশ* দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রবিবার বলে রাস্তাঘাট ফাঁকা। ওর পেছনেই বাটা কোম্পানির লম্বা পাঁচিল। তাতে নানা রকমের জুতোর ছবি আঁকা, নাম লেখা। কী সুন্দর সব নাম— ব্যালেরিনা, বাবল গামার্স, নটি বয়, নর্থস্টার। ডুডু নঙ্গী স্কুলে ভরতি হওয়ার আগে

এখানেরই বাটা নার্সারি অ্যান্ড কিন্ডারগার্টেন স্কুলে পড়ত। ছবির মতো স্কুল। মার্বেল পাথরের ক্লাসরুম। উঁচু সিলিংয়ে স্কাইলাইট। সারি সারি দেবদারু গাছ। সেই দেবদারু বীথিতে দাঁড়িয়ে ওরা গাইত— "আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর।" আজ এত বছর পরেও সেই ছোট্টবেলার স্কুলের কথা মনে পড়ায় হঠাৎই খুব ভাল লাগল ডুডুর। মনে মনে ও আবার বলল, "বিরাজ সত্য সুন্দর।"

হঠাৎই রাস্তার ওই দিকে চোখ চলে গেল ওর। খেয়েছে! যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়। রাস্তার ওই পারে একটা ছেলের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে আসছে সায়েকা। হাতে ধরা বই। উনিশটা কাঠপিঁপড়ে একসঙ্গে কামড়াল ডুডুকে। ছেলেটা কে? সায়েকা ওর সঙ্গে এত হেসে কথা বলছে কেন? সায়েকার দাঁতগুলো না হয় সুন্দর তা বলে ওই ছেলেটাকে দেখাতে হবে? ডুডু আর পারল না। সাইকেলটা রেখে রাস্তা পার হয়ে ওই দিকে গেল।

আচমকা ডুডুকে দেখে থতমত খেয়ে গেল সায়েকা। সায়েকা থতমত খেল কেন? ডুডুকে কুড়ি নম্বর পিঁপড়েটা এবার কামড়াল। "তুমি?" সায়েকার ভুরু সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মতো হয়ে গেল।

"হ্যাঁ আমি। জানো তো মেঘাদিদের ফাংশন আছে আজ।" কোনও কথা না-পেয়ে আনতাবড়ি বলে দিল ডুডু। সঙ্গের ছেলেটা সায়েকাকে বলল, "তোরা কথা বল। আমি এগোচ্ছি।" বাহ্ পিঁপড়েগুলো নেই তো। ডুডু ভারী আরাম পেল।

সায়েকা জিজ্ঞেস করল, "তুমি এখানে কী করছ?"

ডুডু ইঁয়ারকি মেরে কায়দা করে বলল, "এই ধরো তোমার ওপর গোয়েন্দাগিরি। ছেলেটা কে?"

"মানে?" সায়েকার মুখ দেখে ডুডু বুঝল ভুল করে ফেলেছে। কারণ সায়েকা ইয়ারকিটা বুঝতে পারেনি।

"কী রে ডুডু, বেশ আছিস কী বল?" এই রে। জ্যাকসন এখনই ফিরে এসেছে। জ্যাকসন আবার বলল, "সত্যি, তোর মতো লাক ক'জনের হয় বল? এক বেলা পরীর মতো মেয়ের সঙ্গে হাত ধরে ঘুরছিস অন্য বেলায়

আরেকজনের সঙ্গে গল্প করছিস। মাইরি তোকে দেখে যা হিংসে হয় না।" খুব কৃতিত্বের কথা বলেছে এমন ভান করে জ্যাকসন হাসতে লাগল। ডুডুর ইচ্ছে হল জ্যাকসনের পেছনে এক লাথি মারে। কিন্তু তার উপায় নেই। টেনশন খেয়ে ডুডু লক্ষ করল সায়েকার মুখটা হঠাৎ গম্ভীর থেকে কেমন জানি শান্ত হয়ে গেল। ও ডুডুকে বলল, "তুমি ওই ছেলেটার কথা জিজ্ঞেস করছ? ওই ছেলেটা আমার বয়ফ্রেন্ড। লাভারও বলতে পারো। বুঝেছ?" সায়েকা আর না-দাঁড়িয়ে গটগট করে হাঁটতে লাগল।

সায়েকার লাভার? মানে? ডুডু তা হলে কে? এবার আর কুড়িটা নয়, লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে আক্রমণ করল ডুডুকে। একরাশ ঝরা পাতা, সন্ধে নেমে আসা একটা টাউন আর থতমত জ্যাকসনের পাশে একটা অসবর্ণ মেয়ের জন্য মনখারাপ করে দাঁড়িয়ে রইল ডুডু। আচ্ছা, যৌবনে ঠাকুরদার কি কোনওদিন কোনও অব্রাহ্মণ মেয়েকে ভাল লাগেনি?

১২

ন্যাড়া ক'বার বেলতলা যায়? একবার? উঁহুঁ, না। তার মাথায় যতক্ষণ না বেল পড়ে ততক্ষণ সে বেলতলায় যায়। কিন্তু ওর মাথায় তো দু'-দু'বার বেল পড়েছে তবু ওর বেলতলায় যেতে ইচ্ছা করে কেন? কথাটা ক'দিন ধরেই খুব ভাবাচ্ছে টাপুরকে। তা বলে টাপুর ন্যাড়া নয়। অবশ্য মাঝে মাঝে ও ভাবে ওকে যা দেখতে, ন্যাড়া হলেও বাজারের ডিমান্ড গ্রাফটা নীচের দিকে নামবে না। আর হলিউডের অনেক নায়িকাই তো ন্যাড়া হয়েছেন। সে ডেমি মুর থেকে শুরু করে নাটালিয়া পোর্টম্যান পর্যন্ত। তা বলে টাপুরের ন্যাড়া হওয়ার ইচ্ছে মোটেও নেই। ন্যাড়া আর বেলতলার কনসেপ্টটা সুকুমার রায় ব্যাপক নামিয়েছিলেন। ছোটবেলায় পড়ে টাপুর বুঝত না, কিন্তু এখন বোঝে। বিশেষ করে এই কবিতাটায় একটা লাইন আছে, "ঠোঙা ভরা বাদাম

ভাজা/ খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না।” এইটা একদম খুনখারাপি লাইন। কী করে অত দিন আগে একজন ঠিক টাপুরের মনের কথাটা লিখে দিলেন? এটা কি ম্যাজিক? আসলে এখন টাপুরের ঠিক এই ‘খাচ্ছি কিন্তু গিলছি না’-র দশা। কিচ্ছু ভাল লাগে না ওর। পড়ায় মন নেই, খেতে ইচ্ছা করে না, বন্ধুবান্ধবদের ভাল লাগে না, এমনকী সাজতে যে এত ভাল লাগত, সেটাও এখন বন্ধ। ওর বাবা রিসেন্টলি দু'সপ্তাহের জন্য বেলজিয়াম গিয়েছিল। সেখান থেকে ওকে ম্যাক্স ফ্যাক্টরের কমপ্লিট কসমেটিক কিট এনে দিয়েছে। কিন্তু টাপুর ওসব ছুঁয়েই দেখেনি। দূর, ওর আর ভাল লাগছে না। মা পর্যন্ত টাপুরকে দেখে অবাক। কিন্তু টাপুর পাত্তাই দেয়নি। ওর সারাদিন মাথায় শুধু একটা কথাই ঘোরে, ওর খালি মনে পড়ে যায় আবছা গলির মধ্যে পুরু ওর চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলছে, এই দৃশ্য। একটা অদ্ভুত জ্বালা শুরু করে ওর হাতের আর পায়ের তলায়। মনে হয় কে যেন ক্রমাগত ওর বুকে সরু পিন দিয়ে খুঁচিয়ে চলেছে। কেন এমন হয়? মানুষ যেটা পায় না সেটার জন্যই কেন সবসময় মন খারাপ হয়? টাপুরের মনে পড়ে যায় টেবিল ল্যাম্পের আলোয় বসা শান্ত একটা মুখ। ওই মুখটা নিজের দু'হাতে ধরতে চায় টাপুর। নিজের দুই বুকের মধ্যে ওই মুখটার গরম নিশ্বাস পেতে চায় ও। শীতের ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে টাপুর কোলবালিশটা টেনে নেয় শরীরের মধ্যে। ওর মনে হয় এটাই পুরু। ও ধীরে ধীরে কোলবালিশের সঙ্গে নিজের শরীর ঘষে। প্রাণপণে মনে করতে থাকে সেই শান্ত মুখটার কথা। ক্রমশ শরীরের শীত কেটে যায়। ভেতরে ভেতরে একটা তোলপাড় ঘটতে থাকে। ক্রমশ সিক্ত হয়ে ওঠে ও। এই কম্পন, এই সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠাটুকু টাপুর ভীষণভাবে নিজের করে রাখে। অনেকক্ষণ বালিশে মুখ চেপে শুয়ে থাকে ও। একসময় শরীরের শীত ফিরে আসে। জানলার ফাঁকফোকর দিয়ে দু’-চারটে রোদের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে বিছানায়। টাপুর দেখে রোদ নয়, সেই চিঠির ছেঁড়া টুকরোগুলোই যেন।

আজ কিন্তু টাপুর তৈরি। আজ পুরুর সাধ্য নেই ওকে ফেরায়। একটা

জেদ চেপে গেছে ওর। তার মধ্যে ডিমের কুসুমের মতো থইথই কুয়াশা মাখা জ্যোৎস্না আজ চারিদিকে। এই আলো, এই কুয়াশা... আজ পুরুকে বধ করবেই ও। টাপুরের উত্তেজনা হচ্ছে। ওর দামি ফ্লিসের জ্যাকেটের মধ্যেও সামান্য ঘামছে ও। ঘামের ফোঁটাগুলো চামড়ার ওপর দিয়ে গড়িয়ে নামছে। অল্প শিরশিরানি, অল্প কম্পন। ওর মনে হচ্ছে যেন পুরুর আঙুলগুলোই ওকে হালকা করে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

আজ টুপুরের পড়া নেই তবু বেরোতে হয়েছে। শিমুল কী বিশেষ এক কারণে ওকে ডেকে পাঠিয়েছে। সকালেই শিমুল ফোন করেছিল। কী সব নাকি দরকার আছে ওর সঙ্গে। শিমুল নাকি খুব কষ্টে আছে। কয়েক সপ্তাহ আগে একটা ঘটনা ঘটেছে, সেটা নাকি এখন মহীরুহের আকার নিয়েছে। সেটা নিয়ে টাপুরের সঙ্গে কথা আছে শিমুলের।

টাপুর জানে শিমুলটা একটু পাগলি আছে। তা ছাড়া মুখচোরা, ইন্ট্রোভার্ট টাইপ। কখনও নিজের কথা অন্যকে বলে না। আর সেইজন্যই একটু আশ্চর্য হচ্ছে টাপুর। কী এমন ঘটনা ঘটল যে শিমুল ওর সঙ্গে পরামর্শ করতে চায়।

সন্ধের এই সময়টা এইখানে, মানে এই আশিসদার টাইপ স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে বিরক্ত লাগে টাপুরের। রাজ্যের লোক রাস্তা দিয়ে যাবার সময় এমন করে তাকায় যে গা-ঘিনঘিন করে। এইসব লোকজনের মুখচোখ দেখে টাপুর ভাবে যে ভারতে জনবিস্ফোরণ আশ্চর্য কিছু নয়।

যাক, ওই তো শিমুল আসছে। দূর থেকে শিমুলকে দেখতে পেল টাপুর। চোখে চশমা। চুলটা কোনওমতে বাঁধা। গায়ে একটা পঞ্চো। শিমুলের ড্রেস সেন্সটা আর ঠিক হল না। উনিশশো কুড়ি সালের মতো পঞ্চো গায়ে বেরিয়েছে। ভুলভাল পোশাক দেখলে গা পিত্তি জ্বলে যায় টাপুরের।

শিমুল ওর কাছে এসে দাঁড়াল। ওকে দেরি করার জন্য আর বিটকেল পোশাকের জন্য ঝাড় দিতে গিয়েও দিতে পারল না টাপুর। শিমুলের কী হয়েছে? চশমার ভেতর দিয়েই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চোখদুটো লাল আর

ফোলা ফোলা। খুব কেঁদেছে মেয়েটা। টাপুর আস্তে করে শিমুলের হাত ধরল, "কী হয়েছে, শিমুল?"

সামান্য কথাতেই আবার চোখের লকগেট খুলে গেল। শিমুলের দু'গাল এখন বন্যা কবলিত এলাকা। শিমুল টাপুরকে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কাঁদতে লাগল। মহা মুশকিল। ভর সন্ধেবেলা রাস্তার মধ্যে কেউ এভাবে কাঁদে? আবার বিনা পয়সার সিনেমা দেখার জন্য দর্শক জমে যাবে। টাপুর জোর করে শিমুলকে ছাড়াল, বলল, "রাস্তায় সিন ক্রিয়েট করিস না, চল ওই দোকানটায় বসি।"

সামনেই নামকরা একটা স্ন্যাক্সের দোকান হয়েছে। ওখানে বসে খাওয়াও যায় যেমন, তেমন 'টেকহোম'-ও আছে। ওই দোকানেই ঢুকল ওরা। দোকানে ভিড় নেই তেমন। কোনার দিকে একটা ছেলেমেয়ে বসে প্রেম করছে আর কফি খাচ্ছে। ওদের থেকে কিছুটা দূরত্ব রেখে টাপুর আর শিমুল বসল। যা শীত পড়েছে কফি খাওয়া যেতেই পারে। টাপুর দুটো কফি আর চাইনিজ শিঙাড়া অর্ডার করল। এই শিঙাড়াটা অদ্ভুত। ভেতরের পুরটা নুডুলস্ দিয়ে করা।

এবার ও শিমুলের দিকে মনোযোগ দিল। মেয়েটা কেমন যেন নেতিয়ে রয়েছে। টাপুর জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে এবার গুছিয়ে বল তো।" শিমুল এতক্ষণ মাথা নিচু করে বসে ছিল, এবার টাপুরের কথায় মুখ তুলল। এ কী! টাপুর দেখল শিমুলের দু'চোখে আবার জল টলটল করছে। টাপুর চোয়াল শক্ত করল, তারপর বলল, "আশ্চর্য মেয়ে তো তুই। আবার কাঁদছিস? কী হয়েছে বলবি তো?"

"আমন।" ফোঁপাতে ফোঁপাতে কোনওমতে বলল শিমুল।

"আমন মানে? আমন ধান?" যেন কিছু বুঝতে পারেনি এমনভাবে বলল টাপুর।

ভীষণ আহত হয়েছে এমন মুখ করে টাপুরের দিকে তাকাল শিমুল। যেন বলতে চাইল "এ তু ব্রুত?"

টাপুর বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা, কী হয়েছে বল?"

"আমন আমাকে চিট করেছে।"

"মানে? চিট করেছে মানে?"

"মানে ও আমার দিদিকে পছন্দ করে। আমি ওর লেখা দেখেছি। রঙ্গনাদিকে নিয়ে সেখানে ভীষণ অসভ্য অসভ্য কথা লিখেছে।"

'অসভ্য কথা?"

অবাক হয়ে প্রশ্ন করল টাপুর। তারপর জিজ্ঞেস করল, "কী ধরনের অসভ্য কথা রে?"

শিমুল চোখের জল মুছে বলল, "সে অনেক আছে। দিদির শরীরের পুরো ডেসক্রিপশন আছে। ব্রোঞ্জের মতো বুক, পাহাড়ি ঢালের মতো পেট। গিটারের মতো কোমর। ওঃ আমি আর বলতে পারছি না। আমন এমনটা করবে ভাবতেই পারিনি। ওকে আমি এত ভালবাসি আর ও আমার দিদির পেছনে ঘুরছে। তুই বল টাপুর, ছেলেরা সত্যিই খারাপ হয়।"

টাপুর গম্ভীর হয়ে বলল, "তুই কী বলছিস তুই জানিস? আমন তোকে চিট করেছে? কী করে? তুই কি কখনও তোর ফিলিংস ওকে জানিয়েছিস?"

"না। আমি মেয়ে না? আমি কেন বলব? ও আমায় প্রোপোজ করবে।" শিমুল ঠোঁট ফুলিয়ে বলল।

টাপুর হাসল, "বাঃ কী গুণের কথা! গাধা, তোর ফিলিংস তো আমন জানেই না। ও বুঝবে কী করে যে তুই ওকে ভালবাসিস?"

"কেন ও বোঝে না? ওর ঘর গুছিয়ে দিই, বাড়িতে কোনও ভাল কিছু রান্না হলে ওর জন্য নিয়ে আসি। আমার পকেটমানি বাঁচিয়ে ওকে পেন কিনে দিই, ও তাও বোঝে না? এসব কি আমি রাস্তার ছেলেদের জন্য করি?"

"সে তুই জানিস রাস্তার ছেলেদের জন্য করিস কিনা? আর কোথায় বলা আছে যে মেয়েরা প্রোপোজ করতে পারবে না? যদি আমনকে তোর ভাল লাগে তা হলে সেটা গিয়ে ডাইরেক্ট বল না ওকে। এখানে কেঁদে কেটে ন্যাকামো করছিস কেন?"

ধ্যাতানি খেয়ে শিমুল থমকে গেল। বলল, "কীভাবে বলব?"

"কেন, মুখ নেই তোর? মুখ দিয়ে বলবি।"

"না না, সে তো ঠিক। কিন্তু কীভাবে বলব? আর তুই বল, আমার দিদিকে যার পছন্দ তার আমায় ভাল লাগবে কেন? আমি কি অত সুন্দরী না সেক্সি?"

"এই তো আবার ফালতু কথা বলছিস। শোন, তুই ততটাই সুন্দরী যতটা তুই নিজেকে ভাবিস আর ঠিক ততটাই সেক্সি যতটা তুই নিজেকে হতে অ্যালাউ করবি। শিমুল গ্রো আপ। স্টপ ব্রুডিং। জানিস জীবনে সবচেয়ে লো পয়েন্ট কখন আসে? যখন মানুষ নিজেকে 'পিটি' করে। ডোন্ট ফিল সরি ফর ইয়োরসেলফ। তোর যা ভাল লাগে সেটা তোকেই ছিনিয়ে নিতে হবে। শিমুল, তুই খুব ভাল। শুধু তুই নিজেকে ঠিকমতো প্রেজেন্ট কর, দেখবি আমনের তোকে ভাল লাগবেই। জাস্ট ছোট ছোট জিনিসের অ্যাডভান্টেজ নিতে হয় জীবনে। আর সোজা আঙুলে ঘি না-উঠলে আঙুলটা সামান্য বাঁকাতে হয়। বুঝলি?"

"কীভাবে হবে এসব? তুই বল একবার।"

"ডোন্ট বি অ্যান অ্যাশ শিমুল। সেটা তোকেই চক আউট করতে হবে। শুধু, বি কনফিডেন্ট।" কথা থামিয়ে টাপুর ভাবল, ওঃ অনেকখানি লেকচার দিয়ে ফেলেছে। আসলে ওর ভেতরে যে এত কথা জমে ছিল ও নিজেই জানত না। আজ কীসের থেকে কী যে হল। শিমুলকে অনেক কিছু বলে ফেলল। ও যে আজ ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে আছে এটা কি তারই বহিঃপ্রকাশ?

কিন্তু আর বসে থাকলে চলবে না। ওর একটা কাজ আছে। একবার ঘড়ি দেখল টাপুর। প্রায় আটটা বাজে। আর মিনিট দশেকের মধ্যে ওকে এক জায়গায় পৌঁছোতে হবে। ও উঠে পড়ল। হ্যান্ডব্যাগ থেকে বিলের টাকা টেবিলে রেখে শিমুলকে বলল, 'আজ একটু কাজ আছে, আমি আসি। আর যা বললাম মনে রাখবি। এখন থেকে নো কান্নাকাটি। চোখের জল সস্তা, না?" শিমুল একটু হাসল। যাক মেঘ সামান্য হলেও কেটেছে।

ওরা একসঙ্গে দোকান থেকে বেরোল। সামনের রাস্তায় একটা ফাঁকা

রিকশা দেখে দাঁড় করাল টাপুর। তারপর শিমুলকে বলল, "আজ আসি। কাল স্কুলে দেখা হবে কেমন? চিয়ার্স।" শিমুল অল্প হেসে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেল। টাপুর আর সময় নষ্ট না-করে উঠে বসল রিকশায়। এবার ওর গন্তব্য ডাক্তার ভটচাযের গলি। ও জানে ওখানেই একজন ছাত্র পড়াতে যায় পুরু, সেই পড়ানোর সময় শেষ হয়ে এল প্রায়। কী করে জানল? সেটা 'টাপুরস ওয়ে'। কুশের থেকে দু'দিন আগে কথাটা বের করেছে টাপুর। অবশ্য শুধু এটুকুই নয়, আরও অনেক কথাই বের করেছে।

সেদিনের কথা মনে পড়ায় হেসে ফেলল টাপুর। হয়েছিল কী, বাটার নিজস্ব জুতোর দোকান 'বাটা বাজার' থেকে এক জোড়া জুতো কিনে রিকশা করে ফিরছিল ও। শীতের সন্ধে, টমাস বাটা অ্যাভিনিউয়ের মার্কারি ভেপার ল্যাম্পগুলো জ্বলছিল। উত্তরে, গঙ্গার দিক থেকে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছিল একটা। বাটা কোম্পানির মেন গেট পেরিয়ে রিকশাটা যখন বাটা স্টেডিয়ামের সামনে তখনই হঠাৎ কুশকে দেখতে পেয়েছিল টাপুর। সামনের একটা দোকান থেকে কিছু কিনছে। পাশে রাখা ওর মোটরবাইক। ওকে দেখেই চিড়িক করে মাথায় একটা আইডিয়া এসেছিল টাপুরের। পেয়েছে, ও পুরুর সম্বন্ধে জানার জন্য সোর্স পেয়েছে। টাপুর রিকশাটা থামাতে বলেছিল সঙ্গে সঙ্গে।

কেন জানে না, কিন্তু টাপুরের ভেতরে সেদিন পুরুকে দেখার পর কেমন একটা তোলপাড় চলছে। তাই কি বলে 'ওল্ড ফ্লেমস ডাই হার্ড।' যেন তেন প্রকারে ওর পুরুকে চাই। কিন্তু পুরুও অনড়। ও কিছুতেই সেই চিঠির অপমান ভুলতে পারে না। আর একটা চিঠি ক'দিন আগে ও দিয়েছিল পুরুকে। পুরু সেটা না-পড়েই ছিঁড়ে ওকে ফেরত দিয়েছিল। টাপুরের প্রচণ্ড খারাপ লেগেছিল বলাটা আন্ডার স্টেটমেন্ট হবে।

কুশকে দেখেই তাই মাথায় আইডিয়াটা এসেছিল। একটা হলিউডের সিনেমায় টাপুর দেখেছিল কোনও কিছুকে জিততে হলে তার ইনস অ্যান্ড আউট সম্বন্ধে জানতে হয়। কারণ তা হলেই একমাত্র জয় সম্ভব। এই ইনফরমেশনটাই হল ভাইটাল। এখানে ছোট থেকে ছোট খবরও

অনেক বড় কিছু জানাতে পারে। পুরুর সম্বন্ধে টাপুর প্রায় কিছুই জানে না। ব্যাপারটা অদ্ভুত হলেও সত্যি। তাই পুরুর সম্বন্ধে জানতে হবে।

কুশ ভূত দেখলেও বোধহয় এর চেয়ে কম চমকাত। এমনিতেই শেষ সাক্ষাৎটা ভালই মনে ছিল কুশের। তার ওপর সন্ধেবেলা, স্টেডিয়ামের সামনে হঠাৎ করে চোখের সামনে টাপুর। ভিন গ্রহের প্রাণী এলে বোধহয় এত ভ্যাবাচ্যাকা না-খেয়ে কুশ দু'গেম ক্যারাম খেলে নিত।

কোনও ভণিতা না-করে টাপুর কুশকে বলল, "তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। তোমার সময় হবে?"

ভ্যাবাচ্যাকা ভাব তখনও পুরোটা কাটেনি কুশের, ও বলল, "আমি আজ কিছু করিনি। প্লিজ আমায় ছেড়ে দাও।" টাপুর হাসল, "ভয় পাচ্ছ কেন? তোমার থেকে আমার কিছু কথা জানার আছে। সেইজন্যই বলছি, তোমার সময় হবে?" এতক্ষণে ভরসা পেল কুশ, বলল, 'অফ কোর্স। আয়াম অল ইয়োরস।" অন্য সময় হলে এর একটা মোক্ষম জবাব দিত টাপুর। কিন্তু না, এখন ওর কুশকে দরকার। ফলে টাপুর ওর সবচেয়ে ভাল হাসিটা বের করে আনল আর দেখল এতক্ষণ ভয়ে অর্ধমৃত কুশ এবার ভাললাগার চোটে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

"আচ্ছা, পুরু সম্বন্ধে তুমি যা জানো বলো।" টাপুর কথাটা বলেই ভাবল স্কুলের ইতিহাসের কোয়েশ্চন পেপারের মতো হয়ে গেল ব্যাপারটা। কিন্তু কুশের সেদিকে খেয়াল নেই। ও তখন টাপুরের সামনে ওর জ্ঞান ভাণ্ডার উজাড় করতে ব্যস্ত। এক-এক করে টাপুর জেনে গেল পুরুর আর্থিক অবস্থার কথা, ফ্যামিলির কথা, ওর ফুটবলার না-হতে পারার কথা। এমনকী পুরু ক'টা টিউশন করে সেটাও সবিস্তারে টাপুরকে জানিয়ে দিল কুশ। তারপর নিজের পজিশন হাইলাইট করতে ও টাপুরকে বলল, "আসল কথাটাই তো তোমায় বলা হয়নি। ও যে নঙ্গী হাইস্কুলে টেম্পোরারি গেমস টিচার হয়েছে সেটা তো আমিই করিয়ে দিয়েছি আমার জেঠুকে বলে। আসলে বুঝলে তো আমার মন মার্জারিনের মতো কোলেস্টরল ফ্রি আর নরম। কারও দুঃখই আমি

দেখতে পারি না। আরও একটা খবর দিই তোমায়। পুরুর সম্বন্ধেই খবর, তবে পুরু এখনও জানে না।"

"মানে?" এবার টাপুরকে অবাক হওয়ার পালা।

কুশ একটা সিগারেট ধরাল এবার, তারপর ধোঁয়ার গোল্লা ছাড়ল কয়েকটা। শীতের কুয়াশার মধ্যে নীল ধোঁয়ার গোল্লাগুলো বড় হতে হতে ছড়িয়ে গেল চারিদিকে। এই রাস্তাটায় গাড়িই চলে মূলত। পায়ে হাঁটা মানুষেরা কমই যায় এখান দিয়ে। টাপুরের আর কুশের সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে না। কিন্তু কী করবে? ওর পুরুর সম্বন্ধে তথ্য দরকার। কুশ আবার শুরু করল, "আসলে পরের নঙ্গী হাই আর রবিন মেমোরিয়ালের ফুটবল ম্যাচটা পুরুর পরীক্ষা। নঙ্গী যদি জেতে তবে পুরুর চাকরিটা পাকা হবে। জেঠুই বলল আমায়। অবশ্য পুরুকে বলতে বারণ করেছে ব্যাপারটা। ঠিক সময়েই ওকে জানানো হবে।" কথাটা শেষ করে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে গোপন খবর ফাঁস করে দিয়েছে এমন মুখ করে হাসল কুশ। "পাঁঠা," মনে মনে ভাবল টাপুর। তারপর 'মরার ওপর খাঁড়ার ঘা' টাইপের হাসি ছুড়ে বলল, "আচ্ছা, ওকে বুধবার সন্ধেবেলা কোথায় পাওয়া যায়?"

কুশ খানিক চিন্তা করে বলল, "বুধবার করে ওর পড়ানো থাকে। আটটা-সওয়া আটটা নাগাদ ভট্টাচার্যের গলিতে ওকে পাওয়া যাবে, সে সময় ও পড়িয়ে ফেরে।" তারপরই কী মনে হওয়াতে কুশ জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, এত সব তুমি জিজ্ঞেস করছ কেন বলো তো?" টাপুর এর উত্তরে আলতো করে ঠোঁট মোচড়াল, তারপর কুশের হাতটা হালকা করে ছুঁয়ে বলল, "এমনি।" কুশের মুখ দেখে বুঝল বিদ্যুৎটা ঠিকঠাক পৌঁছে দিতে পেরেছে ও। কুশ আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি সেদিন। ওই হাতের ছোঁয়াটুকুই ওকে চুপ করিয়ে দিয়েছিল। টাপুর শুধু মনে মনে বলেছিল "বুধবার।"

আজ সেই বুধবার। এখন সময় সাতটা আটান্ন। ভট্টাচার্যের গলির সামনে রিকশাটা ছেড়ে দিল টাপুর। তারপর গিয়ে দাঁড়াল একটু অন্ধকার একটা

কোনায়। এই গলিটা সব সময়ই বেশ নির্জন। টাপুর যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশেই নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে একটা। ইট সিমেন্টের হালকা গন্ধ পাচ্ছে টাপুর। বাড়িটা শেষ হতে আরও বেশ কিছু দিন লাগবে। বুড়ো রাক্ষসের মুখের মতো ফাঁকা দরজা জানলা দেখে কেমন গা ছমছম করল টাপুরের। সত্যি বলতে কী ওর একটু ভূতের ভয় আছে। এই গলির ভেতরে একদম অন্য মাথায় একটা স্ট্রিট বালব্ জ্বলছে। তার দরিদ্র আলোয় গলিটা একদম গোয়েন্দা গল্পের থেকে তুলে আনা মনে হচ্ছে। টাপুর ঘড়ি দেখল। আটটা পাঁচ। পুরু কই? তবে কি আজকে পড়াতে আসেনি? সামান্য অধৈর্য হয়ে পড়ল টাপুর। তবে কি ওর সমস্ত আয়োজন মাঠে মারা যাবে? পুরু কি আসবে না? আরেকবার ঘড়ি দেখল টাপুর। আর তারপর মুখ তুলতেই দেখল গলির অন্য প্রান্ত থেকে একজন সাইকেলে আসছে। মানুষটার সাইকেলে বসার ভঙ্গিটা দেখেই শরীরে কাঁটা দিল টাপুরের। এ-ভঙ্গিটা ওর চেনা। সেই ক্লাস নাইনে ওর ঘরের জানলা দিয়ে এই মানুষটাকে দেখত টাপুর। আজ এই দু'বছর বাদেও বুকের মধ্যে নাগরদোলার ঘূর্ণনটা একই রকম লাগল টাপুরের। ও মনে মনে বলল, 'পুরু, আজ আর প্লিজ আগের মতো কোরো না।" সাইকেলটা ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসতে লাগল ওর।

১৩

এন এস এ মাঠে দাঁড়ালে কিছু লম্বা লম্বা তালগাছ দেখা যায়। পুরু জানে তালগাছগুলো যেদিকে সেখানে একটা বড় ভাঙা বাড়ি আছে। অনেক পুরনো সেই বাড়ি। লোকে বলে সারেঙ বাড়ি। বলা হয় অনেক অনেক আগে, যখন গঙ্গার নাব্যতা খুব ভাল ছিল, তখন প্রচুর জাহাজ যেত এই নদী দিয়ে। ঠিক এই গঙ্গার ধারেই নোঙর করত সেসব জাহাজ। সারেঙ বা নাবিক বদল হত এখানে। সেই নোঙর থেকেই নাকি নঙ্গী নামটা এসেছে। আর সেইসব পর্তুগিজ, ফরাসি আর মুসলমান নাবিকদের

বাসস্থান থেকে নাম হয়েছে এই সারেঙ বাড়ি। এর কতটুকু ইতিহাস আর কতটুকু লোকের মনগড়া গল্প তা বলা মুশকিল। আসলে সব মানুষই নিজের ইতিহাস নিয়ে একটু-আধটু বেশি বলে থাকে। ইতিহাসহীন হিসাবে মানুষ নিজেকে ভাবতেই পারে না। এই নঙ্গী অঞ্চলের নাম এখন আর তেমন প্রচলিত নয়, সবাই বাটানগর হিসাবেই এই অঞ্চলকে চেনে।

স্কুলে পড়ার সময় মাঝে মাঝে কুশ আর পুরু ওই ভাঙা বাড়িতে যেত। ভাঙা ফোয়ারা, কালো হয়ে যাওয়া পাথরের ভাঙা মূর্তি, ইট বের করা দেওয়াল দেখে গা ছমছম করত পুরুর। মাঝে মাঝে ওখানে তক্ষকের ডাক শুনত ওরা। গিরগিটি হেঁটে যেত ইটের আলগা দেওয়ালের ওপর দিয়ে। একবার, পুরু খুব সাহস করে বাড়িটার দোতলায় উঠেছিল। কুশ বারবার না করছিল উঠতে। কিন্তু সেদিন পুরুকে নিশিতে পেয়েছিল যেন। অর্ধেক ভেঙে যাওয়া সিঁড়ি দিয়ে খুব হালকা পায়ে ওপরে উঠেছিল পুরু। নড়বড়ে রেলিং, কাঠের প্রায় নেই এমন ঝরোকা আর সিংহের মুখওলা নল। অবাক হয়ে গিয়েছিল পুরু, অর্ধেক ঘরের মেঝেই ভাঙা, নেই। তবু তার মাঝে দূরের একটা দেওয়ালে খোদাই করা একটা লেখা দেখেছিল পুরু। দেখেছিল লেখা আছে—"তোমারে কি আর কোনও কালেই দেখিতে পাইব না? তুমি কি আমারে ক্রমশ ভুলিয়া যাইবে?"

আজ এত দিন পরেও পুরুর মাঝে মাঝে মনে পড়ে সেই কথা। আর সেই কথাগুলো মনে পড়লেই কেন জানে না মনখারাপ হয়ে যায়। ওর কোনও প্রেমিকা নেই তবু এই কথাটা মনে পড়লেই ওর মনে হয় কেউ একজন থাকলে মন্দ হত না।

প্রেমিকা? পুরুর। 'কুঁজোরও শখ হয় চিত হয়ে শোয়?' একেতেই বাড়িতে ঝামেলা, তার ওপর প্রেম? এই তো আজও বাবা প্রচণ্ড কথা শুনিয়েছে। সকালে দিদি রুটি তরকারি করে দিয়েছিল। রুটিগুলো বেশ পুড়িয়ে ফেলেছিল দিদি। খেতে পারছিল না পুরু। শুধু বলেছিল যে রুটিগুলো পুড়ে গেছে। বাবা সদ্য বাজার করে ফিরেছিল। পুরুর কথা শুনেই চিৎকার করে উঠেছিল। বলেছিল, "বাপের পয়সায় খাস, তবু

লজ্জা করে না? রুটি পোড়া, না? অর্ধেক পোড়া রুটি জোগাড় করার মুরোদ আছে তোর? নির্লজ্জ, ক'টা পয়সা সংসারে দিস?"

সামান্য প্রতিবাদ করেছিল পুরু, বলেছিল, "কেন আমি টাকা দিই না? টিউশনি করে সাতশো টাকা আর স্কুলের থেকে হাজার টাকা পাব। বাড়িতে তো হাজার টাকা দেব।"

"দেব। ফিউচার টেন্স। হাজার টাকায় কী হবে? চায়ের জল গরম হয় ওই টাকায়? ভিক্ষে করে মানুষ ওর থেকে বেশি রোজগার করে। রুটি পোড়া, না? উঠে যা আপদ, খেতে হবে না তোকে।"

বাবা সব সময়ই এরকম বলে। অন্য দিন কিছু মনে করে না পুরু। কিন্তু আজ আর পারল না। এমনিতেই গত বুধবার থেকে মাথাটাথা সব গোলমাল হয়ে আছে, তার ওপর বাবার এই খিটির খিটির। কোনওদিন যা করেনি আজ সকালে সেটাই করেছিল পুরু। খাবারের থালাটাকে ঠেলে উঠে গিয়েছিল ও। ঠেলার চোটে তরকারির কিছুটা ছিটকে থালা থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। সেই দেখে বাবা আরও জোরে চেঁচাতে শুরু করেছিল। খুব খারাপ কথাও বলতে শুরু করেছিল। জামাটা গায়ে দিয়ে বাড়ি থেকে বেরোতে বেরোতে পুরু শুনেছিল যে মা বাবাকে এসব বলতে বারণ করাতে বাবা মাকেও যা তা বলছে। জীবনে প্রথমবার পুরুর মনে হয়েছিল লোকটাকে ধরে মারে। মাঝে মাঝে খবর কাগজে পড়ে পুরু যে 'ছেলের হাতে বাবা খুন'। এখন পুরু বোঝে জীবন কোন অবস্থায় গেলে মানুষ অমন কাজ করতে পারে।

সেই যে সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে পুরু, আর ঢোকেনি। এখন ও দাঁড়িয়ে আছে মাঠে। আজ ছেলেদের প্র্যাকটিস ডে। ঘণ্টাখানেক প্র্যাকটিস করিয়ে মিনিট পনেরোর ব্রেক দিয়েছে ও। দূরে ওরা বসে আছে। ঠাট্টা ইয়ারকিও করছে। অবশ্য সবাই নয়। জ্যাকসন আর দিয়েগো নিজেদের মতো চুপ করে বসে আছে।

দিয়েগোটা প্র্যাকটিস করছে কিন্তু নিজের খুশিমতো। দৌড়োতে বললে স্ট্রেচিং করছে। লাফাতে বললে দৌড়োচ্ছে। যা খুশি করছে। পুরু বলাতে বলেছে, "স্যার, আপনি ওদের প্র্যাকটিস করান না। আমায়

আমার মতো থাকতে দিন।" পুরুকে এখনও যেন সহ্য করতে পারছে না দিয়েগো। স্কুলে ওর খারাপ ব্যবহার নিয়ে বলেওছে পুরু। বলেছে যে দিয়েগো থাকলে টিম স্পিরিট নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু হেডস্যার সটান বলে দিয়েছেন যে ভারতের ক্রিকেট টিম যেমন সচিন তেন্ডুলকর ছাড়া হয় না, তেমনি নঙ্গী হাই-এর ফুটবল টিমও দিয়েগো ছাড়া হবে না। পুরু বুঝতে পারছে না ও কী করবে। যখন ও টিম করে খেলায়, অর্ধেক দিন দিয়েগো খেলে না। কোনও বোঝাপড়াই তৈরি হচ্ছে না টিমের। সবদিক থেকেই পুরুর জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। তাই কি সহজেই মাথা গরম করে ফেলছে পুরু? এই তো প্রথম সেশনের প্র্যাকটিসে ভীষণ বকেছে জ্যাকসনকে। ছেলেটা অদ্ভুত। সবসময় ইয়ারকি। আজেবাজে কথার ডিপো। এদিকে ফুটবল খেলতে নামলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে একসা করবে। একটা শট গোলে থাকে না ওর। প্রথমে রানিং বলে শট মারতে বলে দেখেছে। তারপর পেনাল্টি মারতে বলে দেখেছে। শেষে সেন্টার লাইন থেকে ফাঁকা গোলে বল মারতে বলেছে। জ্যাকসন একবারও গোলে বল রাখতে পারেনি। তার ওপর প্রতিটা শট মারার আগে বলছিল, 'এইটা জিদানের শট', 'এইটা মরিয়েন্তেস মারছে,' 'এবার মারছে রোনালডিনহো।' খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল পুরুর। সমস্ত ছেলের সামনে প্রচণ্ড বকেছে জ্যাকসনকে। এমনকী কান ধরে সারামাঠ দৌড়ও করিয়েছে। তাই ছেলেটা এই ব্রেকে ওরকম মনমরা হয়ে বসে আছে। এখন একটু খারাপ লাগছে পুরুর। আসলে ও কাউকে কঠিন কথা বলতে পারে না। বা বলে ফেললেও পরে ওর ভীষণ খারাপ লাগে। এই এখন যেমন লাগছে। পুরু ভাবল অতটা হার্শলি না-বললেও হত। আসলে সত্যি করে ভেবে দেখলে বাবার বকুনিতে নয়, পুরু মেন্টালি আপসেট হয়ে আছে গত বুধবারের ঘটনাটায়। টাপুর অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছিল সেদিন।

ভট্টাচার্যের গলি দিয়ে রোজকার মতো সেদিনও সাইকেল চালিয়ে ফিরছিল পুরু। গোটা গলিটাতে একটাই মাত্র স্ট্রিট বালব্। তার সামান্য আলোয় গলির অন্ধকারটাই যেন আরও প্রকট হয়ে ওঠে। একেতেই

পৌষ মাস। ভীষণ ঠান্ডা। একটু ধীরে সাইকেল চালাচ্ছিল পুরু যাতে ঠান্ডা হাওয়াটা বেশি না-লাগে। আর তাই হয়তো আচমকা সামনে এসে যাওয়া টাপুরকে দেখে ঠিক সময়ে ব্রেক চেপে দাঁড়িয়ে পড়তে পেরেছিল পুরু। অন্ধকারের মধ্যে থেকে হঠাৎ ওর সাইকেলের সামনে কেন এল টাপুর? কী চায় ও? মনে হয়েছিল পুরুর। কিন্তু ওকে কিছু বলতে হয়নি। কারণ টাপুরই প্রথম বলল, "পুরু, তোমার সঙ্গে ভীষণ দরকার আছে আমার।" পুরু? তুমি? কী বলছে টাপুর? স্যার না, আপনি না, একদম নাম ধরে, তুমি করে ডাকছে! পুরুর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে বলল, "সাবধান।" পুরু সাইকেল থেকে নামল, তারপর ঠান্ডা গলায় বলল, "এই সময় তুমি এখানে কেন? আর অন্ধকারেই বা দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

টাপুর সামান্য কাঁপা গলায় বলল, "তোমার জন্য পুরু। এসো এখানে, তোমার সঙ্গে অনেক জরুরি কথা আছে আমার।" বলেই টাপুর টানতে টানতে ওকে ঢুকিয়ে নিয়ে গেল পাশের অর্ধেক তৈরি একটা বাড়ির মধ্যে। ব্যাপারটা এতটাই আকস্মিক হল যে পুরু কিছু বলতে পারল না। শুধু ওই বাড়িটার মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে শুনল শব্দ করে ওর সাইকেলটা মাটিতে পড়ে গেল।

বাড়িটার ভেতরে কাঠের পাটাতন, বালি আর কিছু ছেঁড়া বস্তা রাখা। এই জায়গাটা বেশ অন্ধকার। চোখ সয়ে যাওয়াতে তাও টাপুরের মুখটা দেখতে পাচ্ছিল পুরু। টাপুরকে এরকম চঞ্চল কোনও দিনও দেখেনি পুরু। বাড়িটার ভেতরে ঢুকেই টাপুর দু'হাত দিয়ে পুরুর হাতদুটো চেপে ধরল, বলল, "তোমায় ছাড়া আমি একদম ভাল নেই পুরু। আমার একদম ভাল লাগে না কিছু। দু'বছর ধরে আমি শুধু তোমাকেই চেয়েছি। তুমি আজ আমায় ফিরিয়ে দিয়ো না।"

পুরু যতটা সম্ভব গম্ভীরভাবে বলল, "টাপুর, বিহেভ ইয়োর সেল্ফ। কী হচ্ছে কী? এমন করছ কেন?" কিন্তু টাপুর কোনও কথাই শুনছে না। ও পাগলের মতো বলে যেতে লাগল, "না পুরু, প্লিজ তুমি এমন কোরো না। আজ আমায় ফিরিয়ে দিয়ো না। দেখো, আমার দিকে দেখো তুমি। আমি সুন্দরী না? আমার পিছনে অনেক ছেলে ঘোরে। আমি কাউকে

পাত্তা দিই না। আমি কারও দিকে তাকাই না। আমি তোমার জন্য নিজেকে সামলে রেখেছি। আমি এখনও ভার্জিন। তুমি আমায় ভার্জিনিটি থেকে মুক্ত করবে, পুরু, প্লিজ টেক মি।" প্রলাপের মতো বলতে বলতে টাপুর ঝাঁপিয়ে পড়ল পুরুর ওপর। পুরু কিছু বুঝে ওঠার আগেই টাপুর ওকে এলোপাথাড়ি চুমু খেতে শুরু করেছে। পুরুর হাতদুটো নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরে বলছে, "আমায় তুমি ধরো।" পুরুও মুহূর্তের জন্য কেমন হয়ে গিয়েছিল। টাপুরের নরম শরীর, ভরাট বুক, ওর নিশ্বাস, হালকা শ্যাম্পুর গন্ধ। পুরু কেমন শিথিল হয়ে যাচ্ছিল, আবার দৃঢ়ও হচ্ছিল ক্রমশ। আর ঠিক তখনই টাপুর দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল পুরুর ঠোঁট। ভেজা, মিন্টের গন্ধ, কামড়— শীতের সন্ধে হঠাৎ বদলে গিয়ে প্রচণ্ড বর্ষার বিকেল হয়ে গেল যেন। বহু বছর আগের এক বিকেলের কথা হুহু করে মনে পড়ে গেল পুরুর। অবিকল সেই গন্ধ, সেই ভেজা ঠোঁট। পুরুর হুঁশ ফিরল। দু'হাতে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল টাপুরকে। তারপর আর কথা না-বলে দৌড়ে বেরিয়ে এল বাড়িটার মধ্যে থেকে। সাইকেলে উঠে চলে যাওয়ার সময় ও আবছাভাবে শুনেছিল অন্ধকার বাড়িটার ভেতর থেকে একটা চাপা কান্নার শব্দ আসছে। বাড়ি ফেরার পথে পুরু ঠিক করেছিল আর কোনওদিন টাপুরের সঙ্গে কোনও কথা বলবে না ও।

"স্যার ব্রেক শেষ। আমরা রেডি।" ডুডুর কথায় সংবিৎ ফিরল পুরুর। এই ছেলেটাকে বেশ ভাল লাগে ওর। দোষের মধ্যে একটু সুপারস্টিশস। পুরু নিজে প্লেয়ার ছিল। ও জানে কলকাতা মাঠে অনেক বড় বড় প্লেয়ারের কত সুপারস্টিশন আছে। এমনকী বিশ্ববিখ্যাত প্লেয়ারদেরও অনেক সংস্কার থাকে। স্টিভ ওয়র লাল রুমাল, সচিনের হেলমেট না-খোলা, রোনালডিনহোর গোলের পর দুটো আঙুল দেখানো, এরকম উদাহরণ অজস্র আছে। পুরু সামান্য হাসল, তারপর ডুডুকে বলল, "ঠিক আছে, চলো।"

এরপর খানিকক্ষণ বল নিয়ে প্র্যাকটিস চলল, রিসিভিং, ট্র্যাপিং, শুটিং

করাল পুরু। আর সর্বক্ষণই লক্ষ করে গেল জ্যাকসনকে। কেমন মনমরা নিস্পৃহ ভাব। না, ওকে ওভাবে বকাটা ঠিক হয়নি পুরুর। প্র্যাকটিসের মাঝে আমনকে ডেকে প্র্যাকটিস কনডাক্ট করতে বলল পুরু। তারপর জ্যাকসনকে ডেকে নিয়ে গেল মাঠের আরেক প্রান্তে।

জ্যাকসন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে পুরুর সামনে। পুরু আলতো স্বরে বলল, "মনোময়, প্র্যাকটিসে মন না-দিলে আমি আরও বকব। জানো তো বেশি এদিক ওদিক কথা বললে খেলার থেকে ফোকাসটা সরে যায়। শোনো, যে-কোনও কিছুই প্র্যাকটিস নির্ভর। তুমি তো স্ট্রাইকারে খেলতে চাও। কিন্তু জেনো এর জন্য পরিশ্রম করতে হবে। আমাদের আসল ম্যাচের আর মাসখানেকের একটু বেশি আছে। তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি তুমি যদি নিজেকে এর মধ্যে ইমপ্রুভ করো তোমায় ওই ম্যাচটায় খেলাব। আচ্ছা একটা কথা বলো তো, গোলে শট নেবার সময় তুমি কী দেখো?"

জ্যাকসন মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "কেন, সব দেখি। মাঠ, গোলকিপার, আশেপাশের প্লেয়ার, দর্শক। মানে সব কিছুই।" পুরু বুঝল গন্ডগোলটা কোথায়। বলল, "শোনো, একটা কাজ করবে। যখন গোলে শট নেবে, তখন ঠিক শট নেবার মুহূর্তে একটা চোখ বন্ধ করে নেবে। মানে ডান পায়ে শট নিলে বাঁ চোখ বন্ধ করবে, বাঁ পায়ে শট নিলে ডান চোখ বন্ধ করবে। কেমন?"

"কেন স্যার?"

"কারণ যাতে তোমার ভিশনটা ফোকাসড থাকে তাই একটু অপটিকাল সেন্সর করার কথা বলছি। তোমাকে যা বললাম জাস্ট ডু ইট।" বলেই পুরু মাঠের মাঝখানে দাঁড়ানো কবীরকে হাত তুলে ডাকল। কবীর দৌড়ে এল কাছে।

পুরু বলল, "কবীর, গোলে দাঁড়াও তো। মনোময় পাঁচটা শট মারবে।"

"আবার স্যার? তখন তো মারল। একটা গোলের মধ্যে ছিল না।" কবীর অবাক হয়ে বলল।

"যা, বেশি ভ্যাজর ভ্যাজর করিস না।" জ্যাকসন খেঁকিয়ে উঠল। কবীর চোয়াল চেপে গোলের দিকে যেতে যেতে বলল, "নে মার দেখি।"

পুরু মন দিয়ে পাঁচটা শট নেওয়া দেখল জ্যাকসনের। প্রথম চারটে বাইরে গেল। কিন্তু শেষটা আশ্চর্যভাবে পোস্টে লাগল। পুরু নিজের মনেই হাসল। ও দেখেছে, একমাত্র শেষ শটটা নেওয়ার সময়ই ঠিক মুহূর্তে চোখটা বন্ধ করেছিল জ্যাকসন। পুরু জ্যাকসনের দিকে এগিয়ে গেল। বলল, "এইভাবেই শট মারার প্র্যাকটিস করবে, কেমন?"

আর খানিকক্ষণ প্র্যাকটিসের পর পুরু শেষ করে দিল সেদিনের মতো। বেশ খিদে পেয়েছে ওর। সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। মাঠ থেকে বেরোবার সময় পুরু দেখল ডুডু আর জ্যাকসন এগিয়ে আসছে ওর দিকে। জ্যাকসন বলল, "স্যার, চলুন একসঙ্গে যাওয়া যাক। আপনি তো সারদা পল্লিতে থাকেন, না? আমরাও ওই দিকেই যাব।"

পুরু বলল, "কিন্তু আমি যে একটু খাব মনোময়। খিদে পেয়েছে।"

জ্যাকসন উৎসাহিত হয়ে বলল, "হ্যাঁ স্যার, চলুন তবে। আমাদেরও খিদে পেয়েছে। সামনেই জীবনদার পেটাই পরোটা পাওয়া যায়। একশো গ্রাম ছ'টাকা। দারুণ করে।"

পুরু এক মুহূর্ত চিন্তা করল। তিন ছয়ে আঠারো টাকা। একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্টুডেন্টরা খাবে। ওর পকেটে চল্লিশ টাকা মতো আছে। ঠিক আছে। পুরু বলল, "চলো তবে।" পুরু দেখল অন্যদিন ওরা সাইকেল আনে, আজ আনেনি। পুরু তো আনেইনি। সকালে সেই রাগ করে বেরিয়ে আসার সময় সাইকেলের কথা মাথাতেই ছিল না।

পেটাই পরোটা সত্যিই দারুণ করে জীবনদা। খিদেও জব্বর পেয়েছিল পুরুর। খাওয়াদাওয়া শেষ করে ওরা দোকানের বাইরে এসে দাঁড়াল। আর তখনই ঝপ করে লোডশেডিং হয়ে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকার নেমে এল চারিদিকে। চোখে ধাঁধা লেগে গেল পুরুর। এরই মধ্যে ডুডু হঠাৎ বলল, "জ্যাকসন, আমি ভাল বুঝছি না। সেই গন্ধটা আবার পাচ্ছি। একটা ঝামেলা হবে।"

পুরু অবাক হল, বলে কী ছেলেটা? ঝামেলার গন্ধ হয় নাকি? ডুডু, জ্যাকসন, দিয়েগো, কবীর সবক'টা ছেলেকেই একটু অদ্ভুত লাগে পুরুর। মাঝে মাঝে এদের কীর্তিকলাপে হাসিও পায় ওর। তারপরেই পুরুর মনে পড়ে নিজের এই বয়সটার কথা। আসলে এই টিন এজটাই অদ্ভুত। বিশেষ করে ছেলেদের ক্ষেত্রে। সব সময়ে একটা "To be or not to be"-এর মধ্যে থাকা। সব থাকলেও কী নেই কী নেই মনে হয়। মেয়েদের মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্লভ বস্তু। মনে হয় 'কেউ পাত্তা দিচ্ছে না আমাকে'। এ বড় যন্ত্রণার সময়, আবার বড় আনন্দের সময়ও।

আশেপাশের দোকানগুলোয় কেরোসিনের বাতি আর এমার্জেন্সি লাইট জ্বলে উঠেছে এতক্ষণে। আবছা আলোয় ভরে উঠেছে চারদিক। এই আলোয় ডুডু আর জ্যাকসনকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওরা আবার হাঁটতে শুরু করল। পুরু ভাবল ওদের একটা খবর জানিয়ে দেবে। আসলে কালকের প্র্যাকটিসে বলতই। তবু আজই ওদের বলে দেবে। পুরু বলল, "তোমাদের ছোট্ট একটা খবর দিই। আজ তো বাইশে ডিসেম্বর, আঠাশ তারিখ আমি একটা ম্যাচের আয়োজন করেছি। স্টেশনের কাছে একটা ভাল ক্লাব আছে। ওদের কেউ কেউ কলকাতার ক্লাবে খেলে। ওরা ভাল টিম। তোমরা চেনো ওই 'কে জি বি'।"

"কে জি বি? মানে রাশিয়ান গুপ্তচর সংস্থা?" ডুডু ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল।

জ্যাকসন ভেংচে বলল, "কে জি বি? তোর মাথা। রাশিয়া ভেঙে যাওয়ার পর কে জি বি আর নেই। মাইরি, তোর জন্য কে জি বি খেলতে আসবে? এই কে জি বি হল স্টেশনের কাছে একটা ক্লাব, পুরো নাম 'কাঠ গোলা বয়েজ'।"

ডুডু বলল, "না, মানে স্লিপ অব টাঙ হয়ে গেছে। আসলে গন্ধটা..."

"বাদ দে তো, গত জন্মে ডগ স্কোয়াডে ছিলি নাকি?" এবার খেঁকিয়ে উঠল জ্যাকসন, পুরু দেখল ব্যাপারটা অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে। ও বলল, "শোনো শোনো, ম্যাচটা ভাল করে খেলতে হবে কিন্তু। সেদিন দেখা যাবে তোমরা কতটা ইমপ্রুভ করেছ।"

হাঁটতে হাঁটতে ওরা বাটা সিনেমার পেছনের দিকে চলে এসেছে। এখন সিনেমার ইভনিং শো চলছে। ফলে রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। ডুডু আর জ্যাকসন এখন পিছনে কীসব কথাবার্তা বলছে। পুরু ভাবল ও এখন কোথায় যাবে। বাড়িতে ফেরার ইচ্ছে এখন নেই। তবে কি বটতলার আড্ডায় গিয়ে একটু বসবে? ও পেছনে ঘুরল ডুডুদের চলে যেতে বলবে বলে আর ঠিক সেই সময়ই একটা চিৎকার শুনল ও। "চোর, চোর।" পুরু ফিরে তাকাল। একটা রোগা পাতলা ছেলে সাঁ করে ওদের পাশ দিয়ে গঙ্গার দিকের রাস্তায় ছুটে চলে গেল। ওর পেছনে দুটো-চারটে বয়স্ক লোকও ছুটছে। পুরু জানে গঙ্গার দিকে কিছু অ্যান্টিসোশালের ঠেক হয়েছে। সন্ধে হলে সেখানে নেশা-ভাং শুরু করে ওরা। আর সুযোগ পেলেই ইটখোলার জন্য আসা কয়লার নৌকো লুঠ করে। এরাই মাঝে মাঝে সন্ধেবেলা নির্জন রাস্তায় টুকটাক ছিনতাই করে।

ছিনতাইবাজ ছেলেটাকে তাড়া করা লোকগুলোকে দেখে পুরু বুঝল ওরা ধরতে পারবে না ছেলেটাকে। মুহূর্তের মধ্যে পুরু কর্তব্য স্থির করে নিল। পায়ের চপ্পলটা খুলে রেখে জোরে স্প্রিন্ট টানল। ইস, আজ যদি সাইকেলটা থাকত! কিন্তু সেসব চিন্তার সময় নেই। পুরু তাড়া করল ছেলেটাকে। সামনে প্রায় একশো মিটার দূরে ছেলেটা। পুরু চোয়াল শক্ত করল। নিমেষে ভুলে গেল ওর হাঁটুতে চোট, জোরে দৌড়োনো বারণ। ও দৌড়োতে লাগল। ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে ডুডু আর জ্যাকসনও ওর পিছনে ছুট লাগাল। কিন্তু পুরু ওদের অনেক আগে দৌড়োচ্ছে। ওর সেই বিখ্যাত দৌড়। খেলার মাঠেও আগে, বল ধরে হঠাৎ হঠাৎ দৌড় দিত পুরু। ওদের কোচ অলোকদা বলতেন চোরা গতি। মজিদ বাসকরের পর এরকম চোরা গতি নাকি অলোকদা কলকাতা মাঠে আর কারও দেখেননি। পুরু জানে রাস্তাটা আরও কিছুটা সোজা তারপরই বেশ আঁকাবাঁকা। সেখানে ছেলেটা ঢুকে পড়লে রিএনফোর্সমেন্ট পেয়ে যেতে পারে। পুরু স্পিড বাড়াল। দূরত্ব কমতে লাগল দ্রুত। রোগা ছেলেটাও বেশ বেদম হয়ে পড়েছে। ওর পেছনের তাড়া করা ভিড়টাকে

অনেকটা পেছনে ফেলে এসেছে পুরু। কিন্তু এবার হাঁটুটা মট করে উঠল। আবার সেই ব্যথা। যন্ত্রণায় পুরুর মুখ বেঁকে গেল, কিন্তু গতি কমাল না ও। ছেলেটা এখন পাঁচ গজের মধ্যে চলে এসেছে। পুরু এবার ওকে ধরে ফেলবে। বেগতিক দেখে ছেলেটা ঘুরে দাঁড়াল। পুরু লক্ষ করল ছেলেটার বাঁ হাতে একটা লেডিস পার্স আর ডান হাতে একটা লম্বামতো জিনিস। এই অল্প আলোতেও জিনিসটার ঝিলিক দেখে চিনতে ভুল করল না পুরু। ওটা একটা ক্ষুর। ছেলেটা কাঁপা গলায় বলল, "আয় শুয়োরের বাচ্চা, নীচ থেকে ওপর খুলে দেব।" ছেলেটা এবার হাতের ক্ষুরটা নাচাচ্ছে। পুরু মনে মনে চিন্তা করে নিল। আড় চোখে দেখে নিল বেশ কিছুটা পেছনে ডুডু আর জ্যাকসন ক্ষুর দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ছেলেটা এখনও সমানে গালাগালি দিয়ে যাচ্ছে। নিমেষে মাটিতে বসে পাশে পড়ে থাকা একটা আধলা ইট তুলে ছেলেটার হাঁটু লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল পুরু। ছেলেটা এটা আশা করেনি। খটাং করে পায়ের হাড়ে গিয়ে লাগল ইটটা। "বাবা গো" বলে ব্যাগ আর ক্ষুরটা ফেলে বসে পড়ল ছেলেটা। পুরু দেখল ওর পেছনে থেকে বোঁ করে ডুডু আর জ্যাকসন গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছেলেটার ওপর। পুরু কাছে গিয়ে ক্ষুরটা আর ব্যাগটা তুলে নিল।

ডুডু আর জ্যাকসন এর মধ্যে ছেলেটাকে মারতে শুরু করেছে। পুরু বারণ করল। ছেলেটা এমনিতেই হাঁপাচ্ছে। আর মারলে অজ্ঞান হয়ে যাবে। দু'-চার মিনিটের মধ্যেই একটা ছোটখাটো দল এসে পড়ল ওখানে। মাতব্বর গোছের কিছু লোক, আনাড়ি চ্যাংড়া দু'-চারটে ছেলে আর দুটো মেয়ে। দেখলেই বোঝা যায় বেশ ভাল ঘরের মেয়ে ওরা। ওদের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে পুরুকে বলল, "আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ দেব? আমার দিদির পার্সটা ছেলেটা ছিনতাই করেছিল। সো কাইন্ড অব ইউ।" পুরুর হাঁটু দুটো ভীষণ ব্যথা করছে এখন, তবু তার মধ্যেও সামান্য হাসার চেষ্টা করল ও।

ভিড়টা ততক্ষণে ঘিরে ধরেছে ছেলেটাকে। কয়েকটা টর্চের আলো গিয়ে পড়েছে ছেলেটার মুখে। রোগা, ফ্যাকাশে একটা ছেলে। চোখের

তলায় কালি, নাক আর ঠোঁট দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। হঠাৎ জ্যাকসন ছেলেটাকে বলে উঠল, "এই তুই তিমির না? ও! তুই এখন চুরি ছিনতাই শুরু করেছিস?"

ডুডু বলল, "তাই তো, জানোয়ার।" আবার ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল ডুডু।

তিমির খসখসে গলায় বলল, "শুয়োরের বাচ্চা, তোদের দেখে নেব।" এবার মাতব্বরেরা তাদের চড় থাপ্পড় শুরু করল।

পুরুর আর ভাল লাগছে না। ওর গোটা দিনটাই বরবাদ হয়ে গেছে। ও মেয়েটাকে বলল, "আপনারা চলে যান, আর দাঁড়াবেন না।"

মেয়েটা হাসল, বলল, "হ্যাঁ এবার যাব। বাট থ্যাঙ্কস এগেন। একদিন আমাদের বাড়িতে আসুন না। কাছেই, গঙ্গার ধারে নতুন ম্যানশনটা আমাদের। মাসখানেকও হয়নি এখানে এসেছি। কী দিদি! ওঁর আমাদের বাড়িতে আসা উচিত না? বাই দ্য ওয়ে আমি রাকা আর এই আমার দিদি রোহিণী।" এবার অন্যজনকে লক্ষ করল পুরু। আর সঙ্গে সঙ্গে চার সেকেন্ড হৃৎপিণ্ডটা বন্ধ হয়ে গেল ওর। এই প্রায়-অন্ধকার গলিটা হঠাৎ আলোয় ভরে উঠল যেন, পাশের চোরটাকেও মনে হল দেবশিশু। এ-মেয়ে কোত্থেকে এল? এমন চোখ, এমন ঠোঁট, এ কে? এমন সুন্দরের সামনে দম বন্ধ হয়ে গেল পুরুর। কিন্তু রোহিণী চুপ, মাথা নিচু। রাকা সামান্য হেসে বলল, "আসি তা হলে? ওহো, আপনার নামটাই তো জানা হল না।" পুরু নাম বলল। রাকা হাত নেড়ে বলল, "একদিন আসবেন কিন্তু আমাদের বাড়িতে, কেমন? আসি।"

ফেরার পথে খালি পায়ের তলায় এবার রাস্তার কাঁকরগুলো ফুটছিল পুরুর। চটিটা খুঁজে পেলে হয়! হঠাৎ জ্যাকসন বলল, "যাই বলুন স্যার, মেয়েটা দেখতে ভাল হলেও ভারী অভদ্র। এত ঘটনার পরও কেমন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কোনও কথাই বলল না। একটা থ্যাঙ্কস তো দেবে। ফালতু।"

পুরু খোঁড়াচ্ছে এবার। রাস্তাটাও মনে হচ্ছে কেউ যেন টেনে লম্বা করে দিয়েছে। তবু কোথাও যেন আবছাভাবে ভালও লাগছিল পুরুর।

ওর জীবনে তো হিরোইক কিছু করাই হয় না। আজ সামান্য হলেও কিছু তো করেছে। হঠাৎই, হয়তো অকারণেই, ওর বহু বছর আগে দেখা পুরনো এক বাড়ির দেওয়ালে খোদাই করা লেখার কথা মনে পড়ে গেল। তারা-ভরা ডিসেম্বরের আকাশের তলায় সামান্য খোঁড়াতে খোঁড়াতে বছর চব্বিশের একটা ছেলে অস্ফুটে বলে উঠল, "তোমারে কি আর কোনও কালেই দেখিতে পাইব না? তুমি কি আমারে ক্রমশ ভুলিয়া যাইবে?"

১৪

'My love has made me selfish. I cannot exist without you-I am forgetful of every thing but seeing you again-my life seems to stop there— I see no further.'

শিমুল কখনও কখনও এই লেখাটা খুলে পড়ে। বছর খানেক আগে বেশ কিছু পুরনো কাগজপত্তরের মধ্যে থেকে আধছেঁড়া ডাইরি, আর জীর্ণ একটা বই পেয়েছিল শিমুল। ডাইরির হাতের লেখাটা দেখেই বুঝেছিল এটা ওর বাবার। প্রথমে ভেবেছিল বাবার ব্যক্তিগত ডাইরি, পড়া উচিত হবে না। কিন্তু দু'-তিন দিন পর আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারেনি শিমুল। ভেবেছিল বহুদিন আগের ডাইরি, বাবা এটার কথা নিশ্চয়ই ভুলেও গেছে এতদিনে। একটু পড়লে ক্ষতি কী? তাই খুব সাবধানে, এক রাত্রে ডাইরিটা খুলেছিল শিমুল। প্রথম পৃষ্ঠাতেই একটা কোটেশন—'For god's sake hold your tongue and let me love.' ও দেখল হলদে হয়ে গেছে পৃষ্ঠাগুলো। ফাউন্টেন পেনের কালির রংও ফ্যাকাশে। তারপর পোকারা এদিক ওদিক ছোট্ট ছোট্ট ট্রেঞ্চ কেটে রেখেছে পৃষ্ঠা জুড়ে। ফলে কিছু শব্দ বোঝা যাচ্ছে না। তবু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে পড়েছিল শিমুল। আর যত পড়ছিল, তত অবাক হচ্ছিল ও। ভাবছিল এটা কি সত্যিই ওর বাবার লেখা?

প্রায় শেষরাতে গিয়ে যখন ডাইরিটা পড়া শেষ করেছিল শিমুল, ওর সব কিছুই অদ্ভুত লাগছিল তখন। ভাবছিল বাবার জীবন কি সত্যিই এমন ছিল? বাবার কলেজ জীবনে কি সত্যিই কোনও প্রেম ছিল? এই শান্ত বাবা একসময় একটা মেয়ের জন্য মারামারি করেছে? 'মুমু' বলে কোনও মেয়ের জন্য কি সত্যিই বাবার মনের মধ্যে সারাজীবন কষ্ট থেকে যাবে? শিমুলের কেমন যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। ওর শান্ত, নির্ঝঞ্ঝাটে বাবা মারামারি করতে পারে। এমন অদ্ভুত সুন্দর বাংলা লিখতে পারে। শিমুল নিজে বাবাকে সবসময় শুধু ইংরেজি নিয়েই দেখেছে। শিমুল অবাক হয়ে বসে ছিল সারারাত। শিমুল জানে ওর মা খুব অ্যাগ্রেসিভ, বাবার সঙ্গে সবসময় খিটির খিটির করে। কিন্তু বাবা কখনও পালটা কিছু বলে না। মাঝে মাঝে মা এমন সব কথা বলে যা শুনলে শিমুলের মনে হয় এমন মায়ের থাকার দরকার নেই। কিন্তু বাবা তবু চুপচাপ থাকে। সেই বাবা 'মুমু' বলে কোনও মেয়ের জন্য মারামারি করেছিল! মুমুর বাবা মুমুকে শিমুলের বাবার সঙ্গে মিশতে দেয়নি। পাড়ায় ছেলেদেরও বলে দিয়েছিল যাতে বাবা দেখা করতে গেলে বাবাকে মারে। বাবা একা মারামারি করেছিল ছ'টা ছেলের সঙ্গে। হাসপাতালে ভরতি ছিল দু'সপ্তাহ। পরে মুমুও আর বাবার সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। তখন তো অত টেলিফোন ছিল না। মাঘ মাসে বিয়ে হয়ে যায় মুমুর। বাবা ডাইরিতে লিখে রেখেছে বিশে মাঘ। আর লিখে রেখেছে 'my life seems to stop there-I see no further.' সত্যিই কি বাবার জীবন থেমে আছে সেখানে? এই এত বছর পরও কি বাবা সেইরকম আছে? তাই কি মায়ের কথার কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না বাবার? শিমুল বুঝেছিল এই কোটেশনটা ওই জীর্ণ বইটার থেকে নেওয়া। শিমুল বইটা খুলেছিল তখন। ভেতরের পাতায় সাদা কালোয় আঁকা একটা ছবি। এক তরুণ গালে হাত দিয়ে বসে আছে। সামান্য মেয়েলি চেহারা, ফ্যাকাশে মুখ, কিন্তু অসম্ভব উজ্জ্বল দুটো চোখ। বইটার তলায় লেখা 'Letters of John Keats'।

শিমুল পরে বইটা পড়ে দেখেছে। অন্যান্য অনেক চিঠির সঙ্গে ফ্যানি

ব্রাওনকে লেখা অদ্ভুত সুন্দর প্রেমের সব চিঠি আছে বইটায়। শিমুলকে এত ভাল চিঠি কেউ লিখলে শিমুল তো তার প্রেমে পড়ে যেতই। কিন্তু শিমুলকে কেউ চিঠি লেখে না। শিমুল যার কাছ থেকে চিঠি পেতে চায় সে তো দিদির বুক পেট কোমর নিয়ে লেখার থেকেই ফুরসত পায় না।

আর যাতে ফুরসত পায়, যাতে ঘি ওঠে, তাই আজ সামান্য আঙুল বাঁকাবে শিমুল। টাপুরের সঙ্গে সেই সন্ধেয় দেখা হবার পর থেকে অনেক চিন্তা করেছে শিমুল। ঠিকই বলেছে টাপুর, শিমুলকে ওর পছন্দের জিনিস ছিনিয়ে নিতে হবে। না হলে কেউ ওকে কিচ্ছু হাতে তুলে দেবে না। আর তাই একটা প্ল্যান করেছে ও। দেখা যাক আজ সন্ধের এই প্ল্যান কাজ করে কিনা।

ক্রিসমাস হয়ে গেছে সাত দিন হল। দিন একটু একটু করে বড় হচ্ছে এখন। সঙ্গে ঠান্ডাও পড়েছে খুব। বাটানগরের দক্ষিণ দিকে একটা ছোট্ট ক্রিশ্চান পাড়া আছে। সেখানে দারুণভাবে ক্রিসমাস পালন করা হয়। টাপুর ওখানে বড়দিনে যায়। উলটোনো চেরি ড্রাম, সাদা কাঠের ফেনসিং, নানা রঙের রিবন আর ছোট্ট ছোট্ট ঘণ্টা দিয়ে সারা পাড়াটা সাজানো হয়। বুড়ো ম্যাথিউ দাদু কী দারুণ গিটার বাজায়। আর সবাই দুলে দুলে গায়—

'Oh, the weather outside is frightful,
But the fire is so delightful,
And since we've no place to go,
Let it show, let it snow, let it snow.
It doesn't show signs of stopping,
And I brought some corn for popping.
The lights are turned way down low,
Let it snow, let it snow, let it snow.
When we finally say good night,
How I'll hate going out in the storm;

But if you really hold me tight,
All the way home I'll be warm.
The fire is slowly dying,
And, my dear, we're still good-bye-ing,
But as long as you love me so.
Let it snow, let it snow, let it snow.'

শিমুলও ওদের সঙ্গে গলা মেলায়। আর গানের শেষে সবাই যখন একসঙ্গে গায়— "Let it snow, let it snow, let it snow."

তখন সত্যিই আশেপাশের বাড়ির ছাদ থেকে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা কুচি কুচি থার্মোকল ছড়িয়ে দেয় নীচে গোল করে বসা মানুষগুলোর মাথায়। আর বাটানগরে, মিথ্যে মিথ্যে হলেও, বছরে একবার তুষারপাত হয়।

তারপর সবাই মিলে যায় কাছের কাঠের চার্চে। এটা ক্যাথলিক চার্চ। বিরাট বড় কাঠের ক্রুশে যিশুর মূর্তি। মাথায় লেখা আছে আই. এন. আর. আই। একবার ম্যাথিউ দাদু শিমুলকে বলেছিল এর মানে ইয়েশুস নাজারেনাস রেক্স ইউডিওরাম— নাজারাথের যিশু ইহুদিদের রাজা। সবাই মিলে বাইবেল পড়ে সেখানে। শিমুল চুপ করে শোনে। অদ্ভুত সুন্দর লাগে ওর। তারপর ফাদার সবাইকে একটা করে 'ওয়েফার' দেন ওয়াইনে ডুবিয়ে।

চার্চের 'মাস' শেষ হলে শুরু হয় নাচ গান। তারই মধ্যে রেড ওয়াইনে ডুবিয়ে সবাই একটু করে রুটি খায়। এটাকে বলা হয় ব্লাড অ্যান্ড ফ্লেশ অব জেসাস। শিমুলের সবটাই ভাল লাগে খুব। বাটানগরে যেমন ফাটাফাটি দুর্গাপুজো হয়, তেমনি ক্রিসমাসও দারুণ। বছরে এই দুটো সময় খুব সুন্দর।

এবারও শিমুল যিশুর কাছে, আমন যাতে ওকে পছন্দ করে, সেটাই চেয়েছে। চার্চের বাইরে বেরোতেই ম্যাথিউ দাদু বলেছিল, "কী সোনা, কী চাইলে তুমি?"

"কিছু না।" কেন জানে না লজ্জায় লাল হয়ে উত্তর দিয়েছিল শিমুল।

ম্যাথিউ দাদু বলেছিল, "হোয়েন আ গার্ল ব্লাশ, শি মাস্ট হ্যাভ আ ক্রাশ। হু ইজ হি?" শিমুল কোনও উত্তর দেয়নি। শুধু হেসেছিল। একটা জিনিস ক্রমশ শিমুল বুঝছে যে ওর যাকে পছন্দ তাকে পেতে গেলে ওকেই উদ্যোগ নিতে হবে। তাই এই ক'দিনে একটা ছোট্ট প্ল্যান তৈরি করেছে ও। এটা ও কাউকেই বলেনি। এমনকী টাপুরকেও না। কারণ প্ল্যান বললেও আসলে তাতে আদৌ কোনও কাজ হবে কিনা কে বলতে পারে? এখন, শিমুল শুধু অপেক্ষা করছে সেই সময়ের যখন আমন আসবে ওদের বাড়িতে। তবে বেশি দেরি করলে সব ভেস্তে যাবে। কারণ বাবা মা, দাদু, ঠাকুমা সবাই বাড়িতে ফিরে আসবে।

গত পরশু আমনকে ওদের বাড়িতে গিয়ে ধরেছিল শিমুল। আমন তখন কম্পিউটারে 'ফিফা ১৯০৪' খেলছিল। শিমুলকে দেখেই জিজ্ঞেস করল "কী রে? ঠাকুরমার সঙ্গে গল্প শেষ হল?" ওর উত্তরের পরোয়া না করেই আবার জিজ্ঞেস করল, "আমার বায়োলজি প্র্যাকটিকালের খাতাটা কোথায় রেখেছিস রে খুঁজে পাচ্ছি না। তোর গোছানোর ঠেলায় নিজেকেই খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে একদিন। তুই পুরো 'গিভ আপ' একটা।" 'গিভ আপ' কথাটা আমন খুব ব্যবহার করে। শিমুল কিছু না-বলে খাতাটা বের করে দিয়েছিল। আমন আবার ডুবে গিয়েছিল ওর ফুটবলে। শিমুল পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ওর চেয়ারের পেছনে। তারপর ধীরে ধীরে বলেছিল, "দিদি তোকে একবার দেখা করতে বলেছে।" দিদি মানে রঙ্গনা। যেন শক খেল এমনভাবে ঘুরে বসেছিল আমন, তারপর শিমুলের হাত ধরে বলেছিল, "সত্যিই? কবে? এক্ষুনি?" ভাল আর খারাপ একসঙ্গে লাগলে কেমন লাগে প্রথম বুঝেছিল শিমুল। ওর হাত ধরে বসে থাকা আমন, আর দিদির কথায় উত্তেজিত আমন। শিমুল তবু যথাসম্ভব শান্ত মাথায় বলেছিল, "না আজ নয়, পরশু। দিদি বলেছে সন্ধে ছ'টা নাগাদ তোকে যেতে। আগে নয় কিন্তু। তখন বাড়িতে কেউ থাকবে না। তোকে দিদির কীসব কথা বলার আছে প্রাইভেটলি।"

"কী কথা?" আমনের মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছিল। শিমুল বলেছিল, "আমি জানি না। পরশুদিন আসবি কেমন? তার আগে নয়। দিদি কিন্তু স্ট্রিক্টলি বলে দিয়েছে।"

শিমুল একবার উঠে জানলার কাছে গেল। আমন এখনও আসছে না তো? কী ব্যাপার? শিমুল ঘড়ির দিকে তাকাল, প্রায় ছ'টা বাজে। জলজ দিদির কাছে এসেছে এখন। সাতটা নাগাদ ও চলে যাবে কারণ সাড়ে সাতটায় বাড়ির সবাই নেমন্তন্ন থেকে ফিরে আসবে। শিমুল চায় জলজ থাকতে থাকতে আমন আসুক। কারণ, তা হলেই ওর প্ল্যানটা খাটবে।

শিমুল জানলার পরদা সরিয়ে নীচে দেখল। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাস্তা। ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠেছে শিমুল, আমন কোথায়? ও জানে অমূল্য সময় চলে যাচ্ছে। ওর সমস্ত আয়োজন মাঠে মারা যাচ্ছে। বাড়ির বড়রা যখন নেমন্তন্নে যাচ্ছিল সবাই শিমুলকে যেতে বলেছিল, শিমুল জেদ করে যায়নি। কারণ ও জানে রঙ্গনা যেহেতু যাচ্ছে না সেহেতু জলজ নিশ্চয়ই আসবে। আর সেটাকেই এক্সপ্লয়েট করবে ও।

জলজ দিদির বন্ধু না বয়ফ্রেন্ড সেটা প্রথমে বুঝত না শিমুল। কখনও ভাবত বয়ফ্রেন্ড আবার কখনও ভাবত বন্ধু। কিন্তু একবার জলজ আর রঙ্গনাকে একসঙ্গে জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে দেখে সব ধারণা কেমন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল শিমুলের। এখনও সেই দৃশ্যের কথা চিন্তা করলে গায়ে কাঁটা দেয় শিমুলের। আর কেন কে জানে তার সঙ্গে সঙ্গেই ওর মনে পড়ে যায় বছর দেড়েক আগের এক দুপুর। শিমুলের সবসময়ই দুটো আলাদা আলাদা ঘটনা একসঙ্গে মনে পড়ে যায়।

বছর দেড়েক আগের সেই দুপুরে শিমুল ছিল টাপুরের বাড়ি। ভগবান জানে কোত্থেকে লুকিয়ে একটা সিডি নিয়ে এসেছিল টাপুর। সেটা চালাতেই দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল শিমুলের। অতগুলো শরীর কী করছে একসঙ্গে? ঘটনাটা বুঝতেই কিছুটা সময় লেগেছিল ওর। কিন্তু বুঝতে পেরেই ওয়াক উঠে এসেছিল শিমুলের। কিন্তু টাপুরও ছাড়বে না, দেখতেই হবে। খানিকটা ধস্তাধস্তি হয়েছিল ওদের। তারপর টাপুর

সোফার সঙ্গে ওকে চেপে ধরে বলেছিল, "ন্যাকামো হচ্ছে? তুই সাধু, না? ঘেন্না লাগছে? হিপোক্রেসির জায়গা পাস না? তুই অ্যারওসড্ হচ্ছিস না? জানিস না কীভাবে তুই পৃথিবীতে এসেছিস? তোর ইচ্ছে করে না এসব করতে? তুই নিজেকে স্টিমুলেট করিস না?" কোনও উত্তর না-দিতে পেরে কেঁদে ফেলেছিল শিমুল। অবাক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাও শিরশির করছিল শিমুলের। রুদ্রর ভেজা ঠোঁট, টাপুরের বাড়ির সেই ছবি, সব একসঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছিল।

সাইকেলের আলোটা অন্ধকার গলিটাকে আধাআধি করে দিল যেন। শিমুল চমকে উঠল— আমন। খুব দ্রুত, বলতে গেলে প্রায় উড়েই নীচে নেমে গেল শিমুল। আমন কলিং বেল বাজাবার আগেই দরজা খুলে দিল শিমুল। ও চায় না রঙ্গনা কলিং বেলের আওয়াজ শুনুক।

দরজা খুলতেই আমন বোকার মতো মুখ করে হাসল, বলল, "আসলে ফুল কিনতে একটু দেরি হয়ে গেল। রঙ্গনাদি কই? ওপরে?"

আমনের হাতে একগুচ্ছ হলুদ ফুল। শিমুল দম নিল একটু, এবার ওর খেলা শুরু হবে। তবে খেলাটা রিস্কি, সাবধানে খেলতে হবে। শিমুল বলল, "দেরি করে ফেলেছিস রে, দিদির সঙ্গে একজন আছে। দিদি এখন অন্য কারও সঙ্গে দেখা করবে না।"

"মানে? অন্য কারও সঙ্গে আছে? দেখা করবে না? তা হলে আমাকে ডেকে পাঠাল কেন? ইয়ারকি? সর, আমি গিয়ে দেখছি।" আমন প্রায় শিমুলকে ঠেলে সরিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। শিমুল পেছনে "শোন শোন" বলে যেতে লাগল। কিন্তু আমনকে আটকাল না। শিমুল জানে ঠিক কখন আমনকে আটকাতে হবে।

শিমুল যা ভেবেছিল ঠিক তাই, রঙ্গনার ঘরের দরজা বন্ধ। আমন হাত তুলল দরজায় ধাক্কা দেবে বলে আর ঠিক সেই মুহূর্তে শিমুল ওর হাতটা চেপে ধরল। বলল, "দাঁড়া, ধাক্কা দিস না। একটা জিনিস দেখি।" আমন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। শিমুল পা টিপে টিপে গিয়ে জানলার খড়খড়ি তুলে রঙ্গনার ঘরের ভিতরে উঁকি দিল। দেখাদেখি আমনও

এগিয়ে এল। কিন্তু শিমুল দ্রুত, শব্দ না-করে খড়খড়ি নামিয়ে আমনকে বলল, "তুই ভেতরে দেখিস না, তোর ভাল লাগবে না।"

"কেন?" আমন শিমুলকে ঠেলে এগিয়ে গেল জানলার দিকে। শিমুল আর আমনকে বাধা দিল না। ও ঠিক এটাই চাইছিল। মানুষের এটাই প্রবৃত্তি, যেটা তাকে দেখতে বারণ করা হয় সে সেটাই দেখবে। আমন গিয়ে জানলার খড়খড়িটা ফাঁক করল। ভাগ্যও এমন যে ভেতরের পরদাটাও আজ সরানো আছে। শিমুলও আমনের পাশ দিয়ে উঁকি দিল।

ঘরের ভেতরে নরম আলো জ্বলছে একটা। জানলার দিকে পিঠ করে বসে আছে রঙ্গনা। গায়ে একটা সুতোও নেই। মাটির মূর্তির মতো লাগছে ঠিক। আর রঙ্গনার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে পাগলের মতো ছটফট করছে জলজ। ওর হাতদুটো রঙ্গনার কোমর খামচে ধরে আছে। জলজ কিছু একটা বলছেও কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। ধীরে ধীরে জলজ রঙ্গনাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। বুক থেকে চুমু খেতে খেতে নীচে নামতে লাগল জলজ। রঙ্গনা ছটফট করছে। হাত দিয়ে খামচে ধরছে বিছানার চাদর। জলজ গিয়ে থামল রঙ্গনার তলপেটে আর তারপরই মুখ ঘষতে শুরু করল। রঙ্গনার অস্ফুট শব্দ এবার চিৎকারে পরিণত হল। শিমুল স্পষ্ট শুনল রঙ্গনা বলছে, "জোরে আরও জোরে জলজ। আর পারছি না, মা গো। আর না, এবার করো, এবার করো প্লিজ, ওঃ!" শিমুল দেখল মুখ তুলে নিয়ে জলজ হাঁটু গেড়ে বসল রঙ্গনার দু'পায়ের মধ্যে, তারপর রঙ্গনার কোমর দু'হাতে চেপে ধরে নিজেকে প্রবেশ করাল রঙ্গনার মধ্যে। আবছা আলোয় দুটো শরীর দুলতে লাগল অদ্ভুত ছন্দে।

পাশে ধপ করে শব্দ হওয়াতে শিমুল ঘরের থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকাল। আমন থেবড়ে বসে পড়েছে মাটিতে। হাতের হলুদ ফুলগুলো পাশে পড়ে আছে ছড়িয়ে। আমনের ফরসা মুখ লাল, চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে, কিছু বলতে চেষ্টা করছে আমন, কিন্তু কিছুতেই যেন পারছে না। শিমুল কোনওমতে দাঁড় করাল আমনকে। তারপর কষ্ট করে একরকম টানতে টানতেই ওকে নিয়ে গেল নিজের ঘরে, শিমুলের ঘরটা রঙ্গনার ঘরের উলটোদিকে বারান্দার আরেক মাথায়।

শিমুলের খাটে ধপ করে বসে পড়ল আমন। শিমুল দেখল রীতিমতো কাঁপছে ও। মুখ এখনও লাল, চোখ দিয়ে এখনও জল পড়ছে। আমন যে ভীষণ শকড্, বুঝতে অসুবিধা হল না শিমুলের। শিমুল ধীরে ধীরে বসল আমনের পাশে। ওর হাতটা নিজের হাতে নিয়ে শিমুল বলল, "তখনই বলেছিলাম দেখিস না, ভাল লাগবে না।"

আমন হেঁচকি তুলে বলল, 'এসব কী করছে? ছেলেটা কে? ওরা সেক্স করছে কেন? আমায় এও দেখতে হল? আমি..." শিমুল বুঝল আমন কথার খেই হারিয়ে ফেলেছে। ও বলল, "কান ডাউন আমন। ছেলেটা দিদির বয়ফ্রেন্ড। বাড়ি ফাঁকা থাকলেই দে হ্যাভ সেক্স। তুই দুঃখ পাস না।"

"দুঃখ পাব না? আমার যে কোথায় কষ্ট হচ্ছে... শিমুল আমি... আমি কী করব? রঙ্গনাদি এমন করল কেন?" আমনের কথা ক্রমশ প্রলাপের আকার নিচ্ছে।

শিমুলের এবার কষ্ট হল। এমনটা ও হয়তো না করলেই পারত। এভাবে আমনকে ডেকে এনে শক দেওয়াটা বোধহয় ঠিক হয়নি ওর। শিমুল তো জানত রঙ্গনা ফাঁকা বাড়ির অ্যাডভান্টেজ নেবেই। আর এও জানত আমন এসব দেখলে কষ্ট পাবেই। তবু কোথাও যেন সূক্ষ্মভাবে একটা আনন্দও হচ্ছে ওর, আমন ওকে জিজ্ঞেস করছে, "আমি কী করব?" তবে কি আর অদৃশ্য নয় শিমুল?

শিমুল চোখ মুছিয়ে দিল আমনের। ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, "সব ঠিক হয়ে যাবে দেখিস। আর দিদির কথা চিন্তা করিস না। খারাপ কথা ভাবলে নিজেরই মন খারাপ হয়।" আমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। শিমুল নিজের কথায় নিজেই অবাক হচ্ছে। এসব কথা বলতে পারছে কী করে ও? এসব কে বলাচ্ছে ওকে দিয়ে? শিমুল আবার বলল, "আর কাঁদিস না। তোকে কাঁদতে দেখলে আমার কষ্ট হয়।" কথাটা সত্যি, কারণ শিমুলের চোখের কোণেও জল চিকচিক করছে। আমন শিমুলের হাতটা ধরে ওর দিকে তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে ওর কাঁধে মাথা রাখল। আমনের নিশ্বাস লাগছে শিমুলের গলায়, মাথার চুল

থেকে হালকা শ্যাম্পুর গন্ধ পাচ্ছে ও। ভাল লাগায় শিমুলের শরীর অবশ হয়ে আসছে। আমন আস্তে আস্তে বলল, "শিমুল, তুই সবসময় আমায় এভাবে সামলাবি তো?"

শিমুলের হঠাৎ মনে পড়ে গেল হলদে হয়ে আসা কিছু পৃষ্ঠা, ফ্যাকাশে নীল কালি, মারামারি করে ছেঁড়া শার্ট আর ঠোঁটের কোনায় রক্ত নিয়ে ফেরা এক যুবক। যুবকটাকে কেউ কোনওদিন এভাবে সামলায়নি। শিমুলের গলার কাছে হঠাৎ ব্যথা করে উঠল, মনে হল কী যেন আটকে আছে। ওর বলতে ইচ্ছে হল, "সামলাব, তোকে আমিই সামলাব।" কিন্তু পারল না, শুধু নাক থেকে পিছলে নেমে আসা চশমাটা ঠিক করতে করতে বলল, "সবসময় কথা বলতে নেই, একটু চুপ কর।"

১৫

কাঠ গোলা বয়েজ। এখন পরের ম্যাচটুকু নিয়েই শুধু চিন্তা করছে কবীর। পুরু এদের সঙ্গে যে এতদিন খাটাখাটনি করল তার ফলাফলের কিছুটা এই ম্যাচ থেকে পাওয়া যাবে। দেখা যাক কাঠ গোলা বয়েজকে ওরা সামলাতে পারে কিনা। টিমটার সবার বয়সই চব্বিশ-পঁচিশ বছর, অর্থাৎ ওদের চেয়ে অনেকটাই বড়। পুরু চায় ওদের এমন প্রতিপক্ষের মুখোমুখি ফেলতে যাতে কম্পিটিশনটা টের পায় ওরা। পুরুর এই প্রস্তাবে প্রথমে কিছু ছেলে আপত্তি করেছিল। তখন পুরু বলেছিল— "হোয়েন দ্য গোয়িং গেটস্ টাফ, দ্য টাফ গেটস্ গোয়িং। দেখব হাউ টাফ ইউ পিপল্ আর।"

টাফ। ওকে হতেই হবে টাফ। কবীর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোয়াল চিপল। সেদিন সন্ধের মারের দাগগুলো শরীর থেকে চলে গেলেও ওর মন থেকে যায়নি। প্রতিটা কথা ওর মনে কাঁটার মতো গেঁথে আছে। ওকে 'শুয়োরের বাচ্চা' বলেছিল রুদ্র, ওকে 'লাস্ট ওয়ার্নিং' দিয়েছিল। ওর গায়ে পেচ্ছাপ করেছিল রুদ্র। প্রতিটি অংশের হিসেব বুঝে নেবে কবীর। আর টাপুর? টাপুর কবীরেরই হবে। যার ক্ষমতা থাকে

আটকাক। টেস্টের রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে। ওরা সবাই ভালভাবে পাশ করেছে। ফলে পড়াশুনোর টেনশনটা এখন একটু কম। বাবাও রেজাল্ট দেখে খানিকটা শান্ত। কবীর চুলটা আঁচড়ে নিল দ্রুত। এমনিতেই প্র্যাকটিস থেকে ফিরতে দেরি হয়ে গেছে আজ। ওদিকে বেশি দেরি হলে নাচের স্কুলের পরে টাপুরকে মিস করবে ও। টাপুরকে মিস করতে চায় না আজ। ও আজ আরেকবার টাপুরের কাছে ট্রাই নিয়ে দেখবে। গানের স্কুলে তো আর দেখা হবার চান্স নেই।

মাঝে মাঝে ভাবলে ভীষণ খারাপ লাগে কবীরের। সোমাদির গানের ক্লাসে টাপুরের একদম কাছে আসার সুযোগ হত কবীরের। সেটা আর সম্ভব নয়। আর তার জন্য কিছুটা দায়ী ও নিজে। রুদ্রের কাছে বেদম মার খেয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল কবীর। দিয়েগো বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায় ওকে। প্রায় তিন-চারদিন জ্বরে বেহুঁশ ছিল কবীর। তার মধ্যে প্রলাপ বকেছিল। বারবার 'টাপুর', 'গানের গ্লাস' 'রুদ্র', 'সোমাদি'র কথা বলেছে ও। বাড়ির লোকেরা সবটা বুঝতে না-পারলেও টাপুর আর গানের ক্লাসটা সহজেই ইকুয়েট করে ফেলেছিল। বাবা তো আগেই ওয়ার্নিং দিয়ে দিয়েছিল টাপুরের বিষয়ে। ফলে একটু সুস্থ হতেই বাবা প্রথমে জিজ্ঞেস করেছিল, "তোকে কে মেরেছে বল।" কবীর কিছুতেই বলেনি। যত বারই জিজ্ঞেস করা হয়েছে প্রশ্নটা, কবীর চুপ করে থেকেছে। শেষে বলেছে, "অন্ধকার ছিল, তার ওপর সব বেপাড়ার ছেলেরা, ঠিক দেখতে পাইনি।" বাবা কি অত বোকা? এরপরই সেই প্রশ্নে না-গিয়ে বাবা আচমকা বলেছিল, "খুব তো রবীন্দ্রনাথের গান শিখিস। 'দীপ নিভে গেছে মম' গানটা শোনা দেখি।" এই খেয়েছে এই গানটা কবে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন? আর কেনই বা লিখলেন। কবীর আমতা আমতা করছে দেখে বাবা বলেছিল, "তোমার আর গান শিখে কাজ নেই। খেলছ, পড়ছ, এনাফ। গান একদম বন্ধ।" কবীর তীব্র প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল কিন্তু বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে তীব্র প্রতিবাদের বদলে তীব্র ঢোক গিলেছিল ও। মনে মনে ভেবেছিল টাপুর এভাবে ফসকে গেল? এবার তো অন্য কোনও ছেলে ওকে নিয়ে নাকের ডগা দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে চলে যাবে, এ সহ্য করা যায়?

তাই বেশ ক'দিন ধরে অনেক সাহস জুটিয়ে আজকের দিনটাকে ঠিক করেছে কবীর। আজ হয় এসপার ওয় ওসপার। আর নাচের ক্লাসের আশেপাশে বখাটের মতো ঘুরঘুর করতে হবে না। কবীর যাবে ডুডুর কাছে, যেন ডুডুর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছে।

কবীর হলুদ পুলওভার আর নীল জিনস্ পরেছে একটা। এতে ওকে বেশ স্মার্ট দেখায়, মা বলে। চুলটাকেও সামনের দিকে জেল দিয়ে স্পাইক করে নিয়েছে। আজ ওকে দারুণ দেখতে লাগতেই হবে। কোনও গ্যাপ রাখবে না আজ। এরই মাঝে কলকাতায় গিয়ে আর্চিস থেকে একটা মিউজিকাল কার্ড কিনে নিয়ে এসেছে কবীর, সঙ্গে রিবন-বাঁধা বিদেশি টফির বাক্স। ইন্টারনেট ঘেঁটে রাজ্যের 'কবীর' নামের লোকেদের তথ্য জোগাড় করেছে। আজ আর টাপুর ওকে কাবু করতে পারবে না। আর একবার নিজেকে আয়নায় দেখে নিল কবীর। সানগ্লাসটা পরলে আরও ভাল লাগত, পরবে? একবার ভাবল। তারপরেই ভাবল বিকেল প্রায় শেষের দিকে, সানগ্লাস পরলে যা প্যাঁক খাবে, আজ রাত্রে আর খেতে হবে না তা হলে। ইস যদি একটা মুনগ্লাস থাকত ওর!

কবীর আর একটুও দেরি না-করে গিফট্গুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি ডুডুর ওখানে পৌঁছোতে হবে। হিসেবমতো আর বেশি দেরি নেই নাচের ক্লাস শেষ হতে। আজ আর সাইকেল নিল না কবীর। পাড়ার ভেতর দিয়ে শর্টকাট মেরে দেবে।

কবীর রাস্তায় বেরিয়ে দেখল একটা দুটো করে আশেপাশের দোকানের আলো জ্বলতে শুরু করেছে। বেশ ঠান্ডা পড়েছে এবার। গত কয়েকবার এত ঠান্ডা পড়েনি। কবীরের শীত খুব ভাল লাগে। তবে আজ যেন একটু বেশিই ঠান্ডা লাগছে ওর। ও হাঁটতে লাগল। চারপাশের হইচই, দোকানের আলো, গাড়ির আওয়াজ, কিচ্ছু পৌঁছোচ্ছে না ওর কানে। নিজেকে খুব মহান মনে হচ্ছে আজ ওর। কেমন একটা চোরা কনফিডেন্স টের পাচ্ছে ও। পেতেই হবে। ওকে টাফ হতে হবে যে। টাপুরকে নিয়ে আসতে চলেছে ওর জীবনে। এর

জন্য ওকে যোগ্য হয়ে উঠতে হবেই। কবীর শর্টকাটের জন্য পাশের গলিটাতে ঢুকে গেল।

"কী রে, জীতেন্দ্রর ট্যারা ব্যাঁকা জেরক্স, হনহনিয়ে কোথায় যাচ্ছিস?" গলাটা শুনে কবীর দাঁড়িয়ে পড়ল। সেরেছে! এই জোকারটা এখানেও? জ্যাকসন এগিয়ে এল, "ওঃ নিজেকে একেবারে রঙের দোকানের শেড কার্ড বানিয়ে ফেলেছিস। হলুদ পুলওভার, নীল প্যান্ট, লাল জুতো। কী রে ফাঁসাতে যাচ্ছিস, না ফাঁসতে?"

"ভাগ শালা। ডুডুর কাছে যাচ্ছি।" কবীর জবাব দিল।

"ডুডুর কাছে? এত সাজুগুজু, হাতে মনে হচ্ছে গিফট্ও আছে, এইসব নিয়ে ডুডুর কাছে? কী রে ডুডুর সঙ্গে প্রেম করছিস নাকি? এত উন্নতি তোর কবে হল?" হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল জ্যাকসন।

"এবার তোকে ক্যালাবই। খালি আনসান কথা, না?" কবীরের মাথা গরম হয়ে গেল।

"আমায় ক্যালাবি? দম আছে? সেদিন তো অমন ক্যালানি খেলি আমাদের বাড়ির সামনে, তখন মনে ছিল না এইসব ডায়লগ?" জ্যাকসন পালটা জবাব দিল।

সেই মারটার কথা ওঠাতে কবীর চুপ করে গেল। জ্যাকসনও বোধহয় বুঝল একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। ও বলল, "তোকে তো সেদিন রুদ্ররা মেরেছে, না? দাঁড়া শুয়োরের বাচ্চাগুলোকে পাই। এমন প্যাঁদাব না হাসপাতালের বেডের প্রেমে পড়ে যাবে।"

কবীর বলল, "ছাড় ওসব, আমি যাই।"

জ্যাকসন উৎসাহিত হয়ে উঠল। বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ চল, চল। ডুডুদের ওখানের নাচের স্কুলটায় শালা যা সব পিস আসে না। এই শীতের মধ্যে শরীরটা বেশ গরম হবে।" এই রে! জ্যাকসন গেলেই যে কেলো। কী বলতে কী বলবে, খেলা শুরুর আগেই লাল কার্ড হয়ে যাবে। ও বলল, "জ্যাকসন, তুই গিয়ে কী করবি? তার চেয়ে বাড়িতে গিয়ে পড়াশুনো কর। ইকো জিয়োতে যা উইক তুই।"

জ্যাকসন বলল, "মানে? আমি উইক তো তোর কী? আর ডুডুর

কাছে তুই যেতে পারিস আমি যেতে পারি না? আমি যাবই যাব।"

"শোন না, ফালতু এই শীতের মধ্যে যাবি কেন বল? তার চেয়ে অন্য কোথাও যা।"

"মানে? কেসটা কী বল তো! তুই আমাকে প্রস্ফুটিত হতে বলছিস কেন রে? হুম, নন ভেজ গন্ধ পাচ্ছি। তুই কি ওখানে কারও পেছনে লাইন মারতে যাচ্ছিস?"

"লাইন? ভাগ। তোর ভালই জন্যই বলছি।"

"আমার ভাল? শালা মাজাকি? আমি যাবই ডুডুর বাড়ি। চল।" ধ্যাত্তেরি, ছেলেটা কিছুতেই শুনবে না। কবীর মুহূর্তে স্থির করে নিল ব্যাপারটা। ভাবল আর দেরি করা ঠিক হবে না। এবার যেতেই হবে। জ্যাকসন এখন চলুক, ওখানে গিয়ে না হয় কোনওক্রমে কাটিয়ে দেব ওকে। কবীর ভালমানুষের মতো মুখ করে বলল, "চল তা হলে। তোর মরজি"। জ্যাকসনের সাইকেলের সামনের রডে বসে পড়ল কবীর। সাইকেল চলতে শুরু করল।

নাচের স্কুলের সামনে পৌঁছে কবীর দেখল বেশ কিছু মেয়ে জটলা করছে। মানে আগের ব্যাচ, অর্থাৎ টাপুরদের ব্যাচটা শেষ হয়নি এখনও। বাঁচা গেল। কবীর ভাবল তবে কি ডুডুদের বাড়িতে গিয়ে একটু বসবে? মানে ওর এখানে আসাটা জাস্টিফাই করতে হবে তো। কিন্তু তার আগেই ওর হাতে খোঁচা দিল জ্যাকসন, "কবীর, ওই দ্যাখ মালটা ওই গাছটার পাশে একটা মেয়ের সঙ্গে গুজগুজ করছে। শালা ডুডুটা পুরো ঝাড় কেস। আজকাল খালি মেয়েদের সঙ্গে গল্প করে।" কবীর অবাক হয়ে দেখল মেয়েদের জটলার থেকে একটু দূরে ডুডু একটা মেয়ের সঙ্গে হাত নেড়ে উত্তেজিতভাবে কথা বলছে। কী কেস কে জানে? কবীর জ্যাকসনের সঙ্গে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ওদের দিকে। "আই বাপ, এ যে সেই মেয়েটা।" জ্যাকসন বলে উঠল।

"সেই মেয়েটা মানে? কোন মেয়েটা?"

"আরে কিছুদিন আগেও ওর সঙ্গে কথা বলছিল ডুডু। তবে মেয়েটা বলেছিল ওর লাভার আছে।"

"লাভার থাকতেই পারে, হয়তো ডুডুর সঙ্গে এমনি কথা বলছে।" কবির বলল।

"কী জানি। তবে যাই বলিস মেয়েটাকে দেখতে সলিড। থুতনির টোলটা দেখেছিস?"

কবীর আর কথা না-বাড়িয়ে এগিয়ে গেল ডুডুর দিকে। কাছে গিয়ে দেখল সুন্দরমতো মেয়েটার চোখটা কেমন ছলছল করছে। ওদের দেখেই মেয়েটা চট করে চোখের কোণে রুমাল চেপে ধরে মেয়েদের জটলার দিকে চলে গেল। কবীর বুঝল সেন্টুতে আবহাওয়া পাথরের মতো ভারী। ও ডুডুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল ডুডুর ভুরুটায় সমস্ত পৃথিবীর যন্ত্রণা এসে জড়ো হয়ে, সেটা কোলপসিবল গেটের মতো কুঁচকে আছে।

"কী রে ডুডু, মুখে সুনামিকম্পের পরের অবস্থা কেন তোর? মেয়েটা হেভি চেটেছে তোকে, না?" জ্যাকসন বলল।

ডুডু দাঁত চেপে বলল, "শালা তোর জন্য, তোর জন্য আজ এই কেস। সবসময় তোকে বকবক করতে হবে, না?"

"যা কলা, আমি কী করলাম? একটা মেয়ে তোকে বাঁশ দিয়েছে আর তার কন্টিনিউয়েশনটা আমায় ফরোয়ার্ড করবি নাকি?"

"তোমায় মেরে শালা ফাটিয়ে দেব জানোয়ার। সব জায়গায় নাক গলিয়ে দেবে।"

এবার কবীর আর থাকতে না-পেরে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপারটা কী? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না?"

ডুডু বলল, "এই শালা জ্যাকসনের বাচ্চা এমন উলটোপালটা বলেছে যে সায়েকা পুরো ফোরফরটি হয়ে আছে। আমার সঙ্গে কথা বলতেই রাজি নয়।"

"তো? কথা না-বললে বলবে না। তুই হেদিয়ে মরছিস কেন?" কবীর জিজ্ঞেস করল।

"মানে?" উত্তেজিত হয়ে ডুডু বলল, "আমার রাগ হবে না? কথা না-বললে, আমার ইয়ে..."

"কী রে? এখন তোতলাচ্ছিস কেন? শালা একবেলা পরী আরেকবেলা সায়েকা, আমি বুঝব কী করে?" জ্যাকসন ঝাঁঝিয়ে বলল।

কবীর আবার বলল, "আয়াম স্টিল নট গেটিং ইট। কেসটা কী?"

ডুডু গাছের পাশের নিচু পাঁচিলটার ওপর বসে পড়ল। মুখের ভাব ওয়াটারলুর পরের নেপোলিয়নের মতো। কবীর ভাবল ওরা তো কবীরের বুকের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে না। মনে হচ্ছে কলকাতার রেসকোর্সের পুরোটা ওর ভেতরে ঢুকে পড়েছে আর সেখানে সমস্ত লেন দিয়ে হাজারে হাজারে ঘোড়া ছুটে চলেছে। কবীর ঘড়ি দেখল, এতক্ষণে তো নাচের ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। আজ কি একস্ট্রা ক্লাস হচ্ছে? কবীরের আর দেরি ভাল লাগছে না। ও ধপ করে বসে পড়ল ডুডুর পাশে। ভাবল একটু জল পেলে ভাল হত। জিভ শুকিয়ে কাঠ। ডুডু ধীর স্বরে বলল, "সায়েকা আজ বলেছে আমার সঙ্গে আর কোনও দিনও কথা বলবে না। আগে একদিন জ্যাকসন বলেছিল যে পরীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে, তারপর থেকে ও আর আমার সঙ্গে কথা বলছিল না। আজ সেটা জিজ্ঞেস করতে গেছি, আর আমায় বলেছে যে, আমার এই পোড়া মুখ যেন ওকে না-দেখাই। শালা জ্যাকসন, আমি তোর বন্ধু আর আমাকেই বাঁশ দিলি? সেদিন বিকেলে সায়েকার সামনে ওই কথা না-বললেই চলছিল না?"

'আচ্ছা সায়েকাকে যে তোর ভাল লাগে তুই ওকে বলেছিস?" জ্যাকসন জিজ্ঞেস করল।

ডুডু বলল, "না চান্স পাইনি। আর সব ওরকম বলতেও হয় না। কিছু জিনিস আছে যেগুলো বেস্ট সেড বাই সাইলেন্স। কিন্তু সেই সাইলেন্সটুকুই আর নেই। তবু অনেক চিন্তা করে মন ঠিক করেছিলাম। জানিসই তো আমাদের বাড়ি কেমন অর্থোডক্স। জ্যাকসন মাইরি যা করলি না!"

"ও-ও! যত দোষ নন্দ ঘোষ, না? তোমার ম্যাও তুমি সামলাতে পারবে না আমায় দোষ দেবে? আর ওরা 'জানা' তোরা 'ব্যানার্জি'। তোদের বাড়ি অর্থোডক্স, তোর ঠাকুরদা গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে মাংস খায়,

একটা মেয়েকে ভাল লাগার পর এত হিসেব করিস কেন? আমি সায়েকা হলে তোকে এমনিই লাথ মারতাম।" জ্যাকসন খ্যাঁক খ্যাঁক করে বলল।

কবীর ঝুম হয়ে বসে রইল। সব কথাই ওর কানে যাচ্ছে কিন্তু কোনও কিছুই যেন মাথায় ঢুকছে না। আসলে টাপুরের ব্যাপারটা যতক্ষণ না কোনও ফয়সলা হচ্ছে কবীরের কিছুই ঠিক হবে না। ওর কি আর এখন ডুডুর ঝামেলা শোনার সময় আছে? এদিকে নাচের ক্লাসটাও শেষ হচ্ছে না। ওর মনে হচ্ছে বোমা মেরে পুরো স্কুলটাই উড়িয়ে দেয়। 'টাপুর, আর কত সময় নেবে তুমি?"

কবীর শুনল জ্যাকসন ডুডুকে জিজ্ঞেস করছে, "সায়েকা মেয়েটা কোথায় থাকে রে?"

"কেন? তোর কী দরকার? এবার ক্যুরিয়র সার্ভিস করে ওদের বাড়িতে বাঁশ পৌঁছে দিবি নাকি?" ডুডু রেগে গিয়ে বলল।

এবার জ্যাকসন সামান্য হাসল, "আহা, রাগছিস কেন? জাস্ট আউট অব কিউরিওসিটি জিজ্ঞেস করছি।"

প্রচণ্ড অনিচ্ছার সঙ্গে ডুডু বলল, "সাহেব কলোনিতে থাকে সায়েকা।"

"বাংলো নম্বরটা কত?" জ্যাকসন আবার জিজ্ঞেস করল।

"অত জানি না, ভাগ। এবার শোয়ার ঘর ক'টা, বাথরুম ক'টা, কমোড না বাংলা সিস্টেম সব জিজ্ঞেস করবি।" ডুডু খিঁচিয়ে উঠল।

জ্যাকসন কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বাধা পড়ায় পারল না। আজকেও রাধাকাকু হন্তদন্ত হয়ে এসেছে। বলল, "অ্যাই বাঁদর, তুই এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস? ওদিকে তোর মা হন্যে হয়ে তোকে খুঁজছে। ঠাকুরের জন্য মিষ্টি কিনতে বেরিয়ে তো আর টিকির দেখা নেই তোর। ভাবলাম মিষ্টি বানাতে বসে গেলি নাকি? একটা কাজ যদি তোকে দিয়ে হয়। গোরু খোঁজা খুঁজে তবে তোকে এখানে পেলাম। যা করিস না তুই! চল বাড়ি চল।"

ডুডু বলল, "ঠিকই তো! গোরুকে গোরুর মতোই খুঁজতে হবে। ভাগ তো ভাগ তুই। অপয়া।"

জ্যাকসন একটু রেগে গিয়ে বলল, "আবার পয়া অপয়া শুরু করেছিস। তোর ব্রেনের ম্যালফাংশনটা এবার কাটাবার বন্দোবস্ত কর। নিজে ভুলভাল করবে আর দোষ দেবে অন্যদের। আর পারিসও তুই লেবু তেতো করতে। কোথায় ভাবলাম এখানে এসে মজা হবে, না তুই ঝামেলা শুরু করলি। ধুর।"

কবীর দেখল রাধাকাকু কিছু না-বুঝে এর ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। তারপর রাধাকাকু বলল, "কী রে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছিস কেন? একসঙ্গে পড়িস, একসঙ্গে খেলিস, এরকম করলে তো টিম স্পিরিটে প্রভাব পড়বে। তোদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ হয়ে যাবে। তোদের টিমের থিঙ্ক ট্যাঙ্কের ব্যাপারে কিছু করা উচিত। নঙ্গী হাই যদি হেরে যায় তবে তো রাস্তায় মুখ দেখাতে পারব না আমরা। এবার জিততেই হবে তোদের। তোদের টিম ম্যানেজমেন্টের এক্ষুনি এ ব্যাপারে স্টেপ নেওয়া উচিত। নিজেদের মধ্যে এত খেয়োখেয়ি থাকলে চলে?"

কবীরের এবার অসহ্য লাগছে সব কিছু। একেতেই নাচের টিউশন শেষ হচ্ছে না, তার ওপর ডুডু-জ্যাকসনের ঝামেলা আর সব শেষে রাধাকাকু। আজকাল একটা প্রবণতা খুব দেখা দিয়েছে। ভ্যানওলা থেকে টপ একজিকিউটিভ সবাই এইসব 'বডি ল্যাঙ্গুয়েজ', 'টিম স্পিরিট', 'থিঙ্ক ট্যাঙ্ক', 'কথাগুলো সবসময় বলে। যেন তাতে সবটাই খুব গ্র্যাভিটি পায়। এসব ক্রিকেটের ফল। আর সবচেয়ে হাইট হল রাধাকাকুর শেষ কথাটা, 'টিম ম্যানেজমেন্ট'। যেন ন্যাংটো খোকার গলায় টাই। একটা মফস্‌সলের স্কুল, তার একটা সামান্য ফুটবল টিম আর তার আবার টিম ম্যানেজমেন্ট! কবীর ভাবল এ আর নেওয়া যাচ্ছে না। এবার একটা কিছু বলতেই হয়। পাঁচিলের থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কী রে জ্যাকসন, বাড়িতে কাকিমা ডাকছে, যা। রাধাকাকু এত কষ্ট করে তোকে খুঁজে বের করল আর তুই এখানে হ্যাজাচ্ছিস?"

রাধাকাকু বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ চল চল। আর দেরি করা ঠিক নয়। তবে আমার কথাগুলো কিন্তু মাথায় রাখিস।" কবীর হ্যাঁ হ্যাঁ করে জ্যাকসনকে সামান্য ঠেলল যাওয়ার জন্য কারণ ও দেখতে পেয়েছে নাচের স্কুল

থেকে একটা দুটো করে মেয়ে বেরোচ্ছে। টাপুরও যে-কোনও সময় বেরিয়ে আসবে। ও চায় না জ্যাকসন আর থাকুক। ডুডুকে যে কী বিপদে ফেলেছে ও। কিন্তু জ্যাকসন সত্যিই আর দাঁড়াল না। রাধাকাকু আর ও চলে গেল। ডুডুও বসল না আর। একদঙ্গল মেয়ের সঙ্গে সায়েকা নাচের স্কুলে ঢুকে গেল দেখেই বোধহয়। কবীরের ভারী ভাল লাগল। সব ঠিকঠাক চলছে আজ। ঠিক সময়মতো সবাই ওকে সুযোগ করে দিচ্ছে। আজ টাপুর রাজি না-হয়ে পারবে না। তা ছাড়া, কবীরের মনে হল, ওর রাজি হয়ে যাওয়াও উচিত। এতদিন টাপুরের পেছনে খাটছে ও। পরিশ্রমের তো একটা দাম আছে নাকি? হাতে গিফট্ আর রংচঙে জামাকাপড় পরে সামান্য দুর্বল হাঁটু নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কবীর। মাথার ওপর পৌষের আকাশ, অদৃশ্য হিম পড়ছে। জীবনের সমস্ত ভালবাসা জড়ো হয়ে আছে কবীরের চোখে। আর সেই চোখ গেট দিয়ে বেরিয়ে আসা একটা একটা করে মেয়ের মধ্যে খুঁজছে টাপুরকে। অবশেষে চোখ খুঁজে পেল। হঠাৎ কামিনী ফুলের গন্ধ কোত্থেকে এসে যেন ঝাপটা মারল মুখে, আর সমস্ত দৃশ্যই তুচ্ছ, ঝাপসা হয়ে গেল ক্রমশ। কবীর দেখল ছোট একটা ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে আসছে টাপুর।

কবীর তক্ষুনি ওর সামনে গেল না। ও দেখল টাপুর দুটো-চারটে মেয়ের সঙ্গে সামান্য একটু কথা বলল। তারপর একবার হাতঘড়িটা দেখল। কবীর ঠিক এইখানে টাপুরের সঙ্গে কথা বলতে চায় না। ও চায়, টাপুর যখন এখান থেকে বেরিয়ে পাড়ার ভেতরে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা রাস্তায় যাবে, সেখানে ওকে ধরতে।

টাপুর আর দাঁড়াল না। পাড়ার ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগল। কবীর জানে ওই রাস্তাটা টাপুরের বাড়িতে যাওয়ার জন্য শর্টকাট। কবীর তবু যেন নড়তে পারছে না। কে যেন ওর পা-টা মাটির সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে। তবু টাপুরের পেছনে তো ওকে যেতে হবেই। কবীর ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল।

পাড়ার ভেতরের রাস্তাটা এই শীতেও কেমন স্যাঁতস্যাঁতে। রাস্তাটা মিউনিসিপ্যালিটি কংক্রিটের করে দিয়েছে। তবু কোথাও কোথাও

ভাঙাচোরা। এর ওর বাড়ির আলো এসে পড়েছে পথে। একটু কুয়াশাও আছে। বাটানগরের এই দিকটায় এখনও খানিকটা বাঁশঝাড়, কলাবন, কচুপাতার জঙ্গল ঘেরা পুকুর আছে। এই জায়গাটা পেরোলেই একটা পাম্প হাউস, তার আলোয় আশেপাশের অন্ধকার কিছুটা কেটেছে। ঠিক তার সামনেই টাপুরকে ধরল কবীর। কার্ড, ফুল আর থরথরে বুক নিয়ে টাপুরের চোখে চোখ রাখল ও। এ-মুহূর্তগুলোর জন্যই বোধহয় বেঁচে থাকে মানুষ। টাপুর অদ্ভুতভাবে তাকাল কবীরের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, "তোমার ক্লান্ত লাগে না? এই যে বারবার আমার কাছে আসো? কেন আসো? যাও, চলে যাও।"

এ কী বলছে টাপুর? কবীরের ধাক্কা লাগল। টাপুরের কি মন খারাপ? কবীর বলল, "টাপুর, তুমি বোঝো না আমি কত ভালবাসি তোমায়? তোমায় ছাড়া আমি এক মুহূর্তও কিছু চিন্তা করতে পারি না। তোমার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি। তুমি জানো কত কিছু ছেড়ে, কত বাধা টপকে আমাকে তোমার কাছে আসতে হয়? আমি এত কষ্ট পাই, তুমি বোঝো না? আমায় কী ভাবো তুমি?"

টাপুর বলল, "কাকু।"

"কাকু? মানে? আমি তোমার কাকু?" কবির হতবুদ্ধির মতো তাকিয়ে রইল। টাপুর ভুরু দিয়ে কবীরের পেছনে ইঙ্গিত করল, কবীর নিমেষে পেছনে ঘুরল। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত থেকে কার্ড, টফির প্যাকেট আর ফুল সব পড়ে গেল মাটিতে। কুয়াশা জড়ানো পাম্প হাউসের ভুতুড়ে হলুদ আলোয় কবীর দেখল নারুকাকার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে বাবা।

১৬

অনেক উঁচুতে ঘুড়িটা উড়েছে। লাল চিলের মতো একটা ঘুড়ি। একটা লাল পাখি আকাশের থেকে যেন নিষ্পলক তাকিয়ে আছে নীচে। আকাশের থেকে মাটি দেখতে কেমন লাগে জ্যাকসন জানে। একবার ব্যাঙ্গালোর থেকে জেট এয়ারওয়েজের প্লেনে করে কলকাতায় এসেছিল জ্যাকসন। সেটা ছিল ইভিনিং ফ্লাইট। হায়দ্রাবাদে প্লেনটা দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ। জানলার পাশে সিট নিয়েছিল জ্যাকসন। প্লেনটা যখন রানওয়েতে নামার জন্য অনেকটা নীচে নেমে এসেছিল, জ্যাকসন অবাক হয়ে দেখেছিল আলোর এক শহর। যেন দীপাবলির রাত। সেরকম দৃশ্য আর কোনওদিন দেখেনি ও। এখনও মাঝে মাঝে রাতের বেলায় ওদের বাড়ির ছাদে গিয়ে দাঁড়ালে ওর মাথার ওপর যেন সেই রাতটাই ফিরে আসে। অসংখ্য তারার আলো দেখে মনে হয় কে যেন সারা আকাশটায় একটা একটা করে প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে।

আজ লাল ঘুড়িটা দেখে হঠাৎ সেই কথাগুলো মনে পড়ে গেল জ্যাকসনের। কিন্তু কেস কী? এরকম তো হয় না। এত ফিলজফির লক্ষণ তো ভাল নয়। এসব রোগ তো ডুডু, কবীরদের আছে। তবে কি সঙ্গদোষ? অবশ্য হবে নাই বা কেন! ফিলজফিক আঁতলামি শুনতে শুনতে তো কানের খোলের প্রোডাকশন রেট বেড়ে গেছে। আর হেডস্যারও পারেন বটে। কে যে ওঁকে ফুটবল ম্যাচটা দেখতে আসতে বলেছিল। আরে বাবা পড়াশুনোর মানুষ পড়াশুনোয় থাকুন না। শুধুমুধু খেলা দেখতে এসে ঝামেলা পাকানো কেন?

আসলে আজ খেলা ছিল। কাঠ গোলা বয়েস ভার্সেস নঙ্গী হাই স্কুল। পুরু এই খেলাটা আয়োজনের কথা বলেছিল। খেলাটা হওয়ার কথা ছিল ডিসেম্বরের শেষে কিন্তু খেলাটা হল আজ এগারোই জানুয়ারি। আজ ইদ বলে স্কুল বন্ধ আর ব্যস, হেডস্যার চলে এসেছেন মাঠে খেলা দেখতে। আর এমনই কেলো যে আজই ম্যাচটা এক গোলে হেরে গেছে জ্যাকসনরা। স্বভাবতই বেশ মন খারাপ হয়ে আছে ওদের। পুরু একটু

বেশি বিষণ্ণ। কে জি বি ওদের সব প্লেয়ার নামায়নি, আর খেলায় বিশেষ গা-ও লাগায়নি। তবু বোঝা গেছে যে টিমটা ছন্দে নেই নঙ্গী হাই স্কুলের। কে জি বি অনেকগুলো ওপেন করেছিল। কিন্তু কবীর একা আটকেছে সব। দিয়েগো মাঠে এসেও এ-ম্যাচটায় খেলেনি। তবে দিয়েগো প্র্যাকটিসে যা ফর্ম দেখাচ্ছে, জ্যাকসন জানে দিয়েগো খেললেও স্কোর লাইন একই হত। নেহাত কবীর ছিল। জান প্রাণ দিয়ে অবিশ্বাস্য সব সেভ করেছে। কোনওটা পেছন দিকে উড়ে, কোনওটায় ফুল স্ট্রেচ করে, আবার কোনওটা বিপক্ষের প্লেয়ারের পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে দিয়েছে। তবে কতক্ষণ আর কুম্ভ একা রক্ষা করবে? ফলে এক গোল খেতেই হয়েছে।

জ্যাকসন নিজে কম ছড়ায়নি। পুরু পইপই করে জ্যাকসনকে বলেছিল শট গোলে মারতে যাওয়ার সময় এক চোখ বন্ধ রাখতে। কিন্তু প্রতিবারই শট মারার পর জ্যাকসনের মনে হয়, যাঃ চোখ বন্ধ করতে তো ভুলেই গেলাম। ডুডু হাফটাইমে জিজ্ঞেস করেছিল, "কী রে জ্যাকসন, স্যার তোকে এক চোখ বন্ধ করে শট মারতে বলেছেন না? ঠিক তাই করছিস তো?"

জ্যাকসন বলেছিল, "ওসব চোখ ফোক বন্ধ করতে পারব না। তারপর খেলার সময় অমন করব আর সাইড লাইন থেকে রবিন মেমোরিয়ালের মেয়েরা এসে জুতো পেটা করুক আর কী।"

"জুতো পেটা?" ডুডু অবাক।

"ওরা যদি ভাবে ওদের চোখ মারছি? পুরু স্যার ডেঞ্জারাস জিনিস। ওঁর কথা আমি শুনব না বাবা।"

ম্যাচের শেষে এখন ওরা মাঠে বসে আছে। সামনে পুরু আর হেডস্যার। খেলার শেষে পুরু সামান্য একটু বলেছে। প্রথমে কার কোথায় ভুল হয়েছে সংক্ষেপে বলে পুরু বলেছে, "তোমাদের খেলতে দেখে আজ আমার কষ্ট হয়েছে খুব। কারণ তোমরা সবাই ফুটবলটা জানো, কিন্তু কেউ ফুটবলটা খেলছ না। সবাই যে যার মতো একটা খেলা খেলছ।

ফুটবল অর্কেস্ট্রার মতো। সবাই ঠিক বাজালে তবেই মিউজিক একটা জায়গায় পৌঁছোয়। আমি এই ক'দিন তোমাদের মধ্যে থেকে বুঝেছি যে তোমাদের সবার মধ্যেই নানা টেনশন আছে। 'এক্স'-এর সঙ্গে 'ওয়াই'-এর গন্ডগোল, 'বি'-এর সঙ্গে 'সি'-এর মুখ দেখাদেখি বন্ধ। কিন্তু ফুটবলের মাঠে নামলে সব ভুলে যেতে হয়। মারাদোনা গোলের সামনে বল সাজিয়ে দিত কিন্তু বুরুচাগা বা ভালদানোকে গোল দিতে হত। তোমরা শোনোনি সেই গল্পটা? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একটা কনসেনট্রেশন কাম্পে নাতসিরা বন্দিদের সঙ্গে একটা ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করেছিল। নাতসিদের কয়েকজন অফিসার বন্দিদের বলেছিল যে বন্দিরা যদি ম্যাচটা ইচ্ছে করে হেরে যায় তবে বন্দিদের আর মেরে ফেলা হবে না। আর নাতসিদের সম্মানও বাঁচবে। বন্দিদের দিয়ে ম্যাচের আগেই তাদের কবর খুঁড়িয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু বন্দিরা ভয় পায়নি, তারা এককাট্টা হয়ে নাতসিদের দুরমুশ করে জিতেছিল ম্যাচটা। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও খেলা ছেড়ে পালায়নি। যে পালায় না সেই শেষ পর্যন্ত জেতে। তোমরা কি ভেবেছ বন্দিদের নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল না? ছিল, খুব ছিল। কিন্তু যখন একসঙ্গে কোনও কিছু করতে হয় ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টিটাই প্রধান তখন। সম্মান আর খেলার চেয়ে বড় কিছু হয় না। ইট ইজ নট জাস্ট গেম ইট ইজ স্পোর্টস। তোমরা আরও প্র্যাকটিসে মন দাও। প্রায় সপ্তাহ তিনেক সময় আছে এখনও। আয়াম শিয়োর উই ক্যান পুল ইট আপ টুগেদার। চিয়ার্স।"

গোটাটা শুনে জ্যাকসনের ভেতরে একটা চনমনে ভাব এসেছে। পুরু স্যার ব্যাপক বলে তো! এটাই কি সেই 'ভোকাল টনিক' বা 'পেপ টক'? সে যত টক মিষ্টি ঝালই হোক না কেন জ্যাকসনের রক্ত গরম হয়ে উঠেছে। অবশ্য ঠান্ডা হতেও বিশেষ সময় লাগল না। এবার হেডস্যার উঠলেন বলতে, "তোমরা সব পড়াশুনো ঠিকঠাক করছ তো? মনে থাকে যেন সামনেই পরীক্ষা কিন্তু। আজ তোমাদের খেলা দেখে আমার বিশেষ ভাল লাগল না। আর তোমাদের পুরু স্যার ইনডাইরেক্টলি বলেছিলেন তোমাদের মধ্যে পারসোনাল ডিফারেন্সের কথা। এর মানে কি টিমের

মধ্যে তোমরা ঝগড়া করছ? আমার কানে কিছু কথা এসেছে গত ম্যাচে আমাদের হার নিয়ে। শোনো, কোনওরকম অসভ্যতামো আমি বরদাস্ত করব না। পুরু তোমাদের চেয়ে বেশি বড় নয়, তোমরা তাকে তাই বলে অগ্রাহ্য করবে না। যদি আমি উলটোপালটা কিছু দেখি বা শুনি আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্টেপ নেব। আর ফুটবল একটা খেলাই শুধু নয়, আমাদের নঙ্গী হাইস্কুলের ঐতিহ্য। এটা সবসময় মাথায় রাখবে, বুঝেছ?"

হেডস্যার যে ভীষণ রেগে আছেন সেটা বিলক্ষণ বুঝল জ্যাকসন, ওর পাশে বসে আমন ফিসফিস করে বলল, "একদম 'গিভ আপ' স্যার। স্কুলেও হাবিজাবি বকেন এখানেও হাবিজাবি বকছেন। ম্যাচ হেরেছি ঠিক আছে, তা বলে এভাবে 'গিভ আপ' স্পিচ দিতে হবে?"

জ্যাকসন বলল, "চেপে যা, না হলে তোকে 'গিভ ডাউন' করতে সময় লাগবে না।"

কিন্তু হেডস্যার ভালমানুষ। বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারেন না। কথাগুলো বলার পর গোঁজ হয়ে রইলেন মিনিট দুয়েক তারপর বললেন, "অনেক খেলাধুলো হয়েছে, তোমাদের খিদে পায়নি? চলো সার্ভিস মার্কেটে, লুচি আলুরদম খাবে।" খিদে পায়নি মানে? জ্যাকসনের পেটে হাউহাউ করছে খিদে। মনে হচ্ছে গোটা শরীরটাই পেট হয়ে গেছে। ঘণ্টা দেড়েক খাটুনির পর জ্যাকসনের মনে হচ্ছে মাঠের ঘাসগুলোই এখন খেতে শুরু করে। এত খিদে কোথায় লুকিয়ে থাকে কে জানে। আর হেডস্যারের প্রস্তাবটাও মোক্ষম। সার্ভিস মার্কেটে যাওয়া। বাটানগরে এখন অনেক পিৎজার দোকান হয়েছে, পেস্ট্রির দোকান হয়েছে, কিন্তু জ্যাকসনের কেন জানে না এসব খেতে ভাল লাগে না। ফ্যাশন করে অন্যদের সঙ্গে খেতে গিয়ে দেখেছে ওর তেমন ভাল লাগছে না। অন্যরা যদিও 'খুব ভাল', 'খুব ভাল' বলছিল তবু ওর জানি কেন মনে হচ্ছিল সবাই গণ ঢপ মারছে। আসলে কারওই ভাল লাগছে না। জাস্ট নিজেকে স্টাইলিস দেখাবার জন্য এই মরার হাতের চামড়ার মতো পিৎজা চিবোচ্ছে।

লুচি তরকারি জ্যাকসনের ফেভারিট। আর সার্ভিস মার্কেটে এটা

বানায়ও দারুণ। জ্যাকসনের বাবাদের আমল থেকে সার্ভিস মার্কেট বাটানগরে বিখ্যাত। কাটলেট, লুচি তরকারি বা মোগলাই পরোটা সব কিছুই এখানে দারুণ বানায়। আর কী আশ্চর্য! খাবারের কোয়ালিটিও সেই পুরনো দিনের মতোই আছে। সাহেব কলোনিতে ঢোকার যে-গেট তার উলটোদিকে একটু দূরেই 'বাটাবাজার' নামে বাটার জুতোর দোকান আর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। এর পেছনেই বিখ্যাত সার্ভিস মার্কেট। ছেলেবেলা থেকে এখানে খেতে এসে ওপরের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থাকত জ্যাকসন। কম সে কম তিনতলা অবধি উঁচু একতলার সিলিং। সেখান থেকে লম্বা রড দিয়ে ঝোলানো পুরনো ডি সি পাখা। অত উঁচু একতলা বাড়ি জ্যাকসন শুধু সার্ভিস মার্কেটে এলেই দেখতে পেত। সেই উঁচু সিলিং থেকে ঝোলা পাখা, খাবারের হালকা গন্ধ, স্টিলের কাঁটা চামচ! সত্যিই ছোটবেলা আর ফিরে আসে না।

ডুডু বলল, "কী কেস বল তো? হেডস্যার খাওয়াচ্ছেন কেন?"

জ্যাকসন বলল, "সবাই তোর ঠাকুরদার মতো কিপটে নাকি যে দেখা হলেই খাওয়ার কথা বাদ দিয়ে আহ্নিক করো, মঙ্গলবার লাল জামা পরো, শুক্রবার সিনেমা দেখো না, এসব বলবে।"

ডুডু বলল, "তোর সঙ্গে কথা বলাটাই ঠিক নয়। আমায় বাঁশ দিয়ে এখন আমার ঠাকুরদার নিন্দে করছিস?"

মাঠ থেকে বেরিয়ে একসঙ্গে দল বেঁধে হাঁটতে শুরু করল ওরা। যেন মিছিল চলেছে। জ্যাকসন দেখল পুরু হঠাৎ হেডস্যারের কাছে গেল। কী? না পুরু যেতে পারবে না। ওর খুব দরকারি একটা কাজ আছে। হেডস্যার কিন্তু কিন্তু করেও পুরুকে ছেড়ে দিলেন। জ্যাকসন মনে মনে হাসল। ও জানে পুরুর জরুরি কাজটা কী। জ্যাকসন দেখেছে।

সেই সন্ধেয়, যেদিন পুরু সেই ছিনতাইবাজ তিমিরকে ধরেছিল, সেদিনই পুরুর চোখ দেখে বুঝেছিল জ্যাকসন যে স্যার এবার গেছেন। ওই চুপ-করে-থাকা মেয়েটা স্যারকে একদম শুইয়ে দিয়েছে। তারপর বেশ কয়েকদিন দেখেছে জ্যাকসন। মেয়েটা বিকেলের দিকে একটা নির্দিষ্ট

সময়ে বাটা সিনেমার সামনে দিয়ে যায়। জ্যাকসন যাতায়াতের পথে দেখেছে যে, সে-সময়টা পুরু সিনেমা হলের সামনে একটা চায়ের দোকানে বসে থাকে। প্রথমে ব্যাপারটাকে অতটা গুরুত্ব দেয়নি ও। কিন্তু তিন-চার দিন একই ঘটনা চোখে পড়ায় একদিন নিজের থেকে লুকিয়ে দেখতে গিয়েছিল জ্যাকসন। আর হ্যাঁ যা ভেবেছে তাই। মেয়েটা রাস্তা দিয়ে গেল আর পুরু ড্যাবড্যাব করে দেখল। আর মেয়েটা চলে যেতেই পুরু সাইকেল নিয়ে অন্যদিকে চলে গেল। জ্যাকসন অবাক হয়ে দেখেছিল, পুরু কিন্তু মেয়েটাকে ফলো করল না।

এখনও যে সেই একই কেস, জ্যাকসন জানে। ও দেখল পুরু দ্রুত চলে গেল সিনেমা হলের রাস্তায়। 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে' আশ্চর্য জীবন। এই যে চারিদিকে সবাই ধপাধপ প্রেমে পড়ছে সেটা কি বাটানগরের এত সুন্দর পরিবেশের গুণ, না এরই আরও গ্রেটার কোনও কসমিক ডিজাইন আছে? আশপাশের লোকেরা বাটানগরকে বৃন্দাবন নগর বলেই ডাকে। এমনকী নঙ্গী স্টেশন থেকে সকাল ন'টা তেত্রিশ আর সকাল দশটা চব্বিশের আপ ট্রেনকে বলা হয় 'প্রজাপতি এক্সপ্রেস'।

জ্যাকসনের জীবনে কোনও প্রেম নেই। কেন নেই অনেকবার চিন্তা করেছে ও। দু'-একবার তো প্রোপোজও করেছিল দু'-একজনকে। অবশ্য কেউ ওকে সিরিয়াসলি নেয়নি। নেবেই বা কেমন করে?

ক্লাস নাইনে পড়ার সময়ে একটা ভীষণ বড়লোকের মেয়েকে ও বলেছিল, "তোকে আমি খুব ভালবাসি। বিশেষ করে তোরা টয়োটা করোলা গাড়িটা কেনার পর তোকে আমার আরও ভাল লাগছে।" মেয়েটার উত্তর কী ছিল বলার জন্য কোনও পুরস্কার নেই। এর পরেরবার এতটা কাঁচা খেলেনি ও। একটা সহজ সরল মেয়ের সঙ্গে কয়েকদিন ঘুরেও ছিল। কিন্তু মেয়েটার বাবা জানতে পেরে মেয়েটাকে মারে। মেয়েটা, সেটা এসে জ্যাকসনকে বলায় জ্যাকসন ঘ্যাম দেখাতে ও ইমপ্রেস করতে গিয়ে কুত্তে, কামিনে বলে মেয়েটার বাবাকে খুব গাল দিয়েছিল। মেয়েটা পরের দিন থেকে আর কোনও যোগাযোগই

রাখেনি। কিন্তু জ্যাকসনের কোনও কষ্ট হয়নি। এখন ও বোঝে সেসব প্রেম ছিল না একদম। চারিদিকে দু'-একজন প্রেম করছে দেখে ওরও ওরকম কিছু মাথায় ঢুকেছিল। এখন ভাবলে হাসি পায় ওর।

"কী রে আজ এত চুপচাপ?" দিয়েগো পাশে এসে জিজ্ঞেস করল।

"ও তুই? আজ খেললি না কেন?" জ্যাকসন প্রশ্ন করল।

"এমনি। মন বিশেষ ভাল নেই।"

"বাড়িতে কোনও টেনশন?"

"সে তো আছেই। ছাড় ওসব কথা। আজ এত কী ভাবছিস? তোকে এই রোগে কবে থেকে পেল?"

"না, এমনি। সার্ভিস মার্কেট শুনে ক'টা কথা মনে পড়ে গেল।"

দিয়েগো ঠোঁট উলটে বলল, "বাবা, তোর এসব হয় নাকি?"

জ্যাকসন উত্তর না-দিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। পাশেই একটা ক্যাসেট সিডির দোকান। সেখানে একটা গান বাজছে। হিন্দি। "কাজরা রে কাজরা রে তেরে কারে কারে নয়না।" "গুরু কী গান দিয়েছে।" হঠাৎ চিৎকার করে উঠল জ্যাকসন। ঐশ্বর্য রাইকে ওর একঘর লাগে। আর গানটাও ফাটাফাটি। স্থান কাল ভুলে ও হঠাৎ গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চিৎকার করে গেয়ে উঠল। ওর আচমকা চিৎকারে সবাই থতমত খেয়ে গেল। একটা নেড়ি কুকুর ঘুমোচ্ছিল। সে ছিটকে উঠে রাস্তার অন্যদিকে চলে গেল। কিন্তু জ্যাকসনের সেসব হুঁশ নেই, ও নেচে যাচ্ছে। ওর হুঁশ হল হেডস্যার ওর কান ধরাতে। এক রাস্তা লোক, যার পঁচাত্তর শতাংশ ওকে চেনে, তাদের সামনে হেডস্যার ওর কান ধরলেন! তারপর কড়া গলায় বললেন, "রাস্তার মধ্যে এ কী অসভ্যতা? স্কুলের নাম সব দিক দিয়ে না-ডোবালেই হচ্ছে না? এই তোমার রুচি? রুচি উন্নত করো, বুঝেছ? রুচি উন্নত করো।"

প্রায় সার্ভিস মার্কেট এসে গেল। একদিকে সেখানকার লুচি আলুরদম, অন্যদিকে হেডস্যারের কানমলা। জ্যাকসন একবার ভাবল না-খেয়ে চলে যাবে। কিন্তু লুচিটা খুব টানছে ওকে। ও চুপচাপ দোকানে ঢুকে গেল। ও দেখল হেডস্যারকে দোকানে খুব খাতির করছে। কারণ

এক, উনি নঙ্গী হাই-এর হেডমাস্টার; দুই, উনি এই দোকানের নিয়মিত খদ্দের আর তিন, সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল দোকানটা স্যারের ভাই কিছুদিন হল কিনেছেন। স্যার ওদের বসিয়ে কাউন্টারে গিয়ে বললেন, “এই চোদ্দোজনকে চারটে করে লুচি আর আলুরদম দাও। স্পেশালভাবে তৈরি করবে, এরা সব আমার ছাত্র কিন্তু।”

জ্যাকসন মাথার ওপর তাকাল। সেই অনেক উঁচু সিলিং। লম্বা রড দিয়ে ঝোলানো ডি সি পাখা। শুধু শীতকাল বলে পাখাগুলো বন্ধ। এরই মধ্যে লুচি আলুরদম এসে গেছে। এদের সব কিছুই ফটাফট। কিন্তু লুচিতে কামড় দিয়ে নাক কুঁচকে গেল জ্যাকসনের। এ কী তৈরি করেছে আজ? তেলচিটে গন্ধ, তার ওপর রবারের মতো লুচি। ও বুঝল হুড়োহুড়ি করে ঠান্ডা লুচিই গরম করে ওদের দিয়েছে। সব স্টুডেন্টরা এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। জ্যাকসন অবাক হয়ে দেখল স্যার দিব্যি ওগুলো খেয়ে চলেছেন। একবার মুখ তুলে বললেনও, “কী চমৎকার হয়েছে না?” জ্যাকসন আর পারল না, দুম করে প্লেট সরিয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল, “স্যার, এগুলো লুচি? ভাল লুচি? আপনার তো ভাইয়ের দোকান স্যার, বলুন লুচি উন্নত করতে।” জ্যাকসন আর দাঁড়াল না। দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। নাও! আরও রাস্তার মধ্যে ওর কান ধরে ওর রুচি উন্নত করতে বলে ঠ্যালা সামলাও!

জ্যাকসন জানে ওর একটা কাজ করার আছে। আর সেটা ওকে করতে হবে একদম একা। কেউ সেটা জানুক ও চায় না। ওর ঘটানো গন্ডগোল ওকেই মেটাতে হবে। জ্যাকসন হাঁটতে লাগল সাহেব কলোনির গেটের দিকে। ওকে দেখে সাহেব কলোনির গেটের দারোয়ানটা বেরিয়ে এল গুমটির বাইরে। জ্যাকসনকে জিজ্ঞেস করল, “তুমি কোথায় যাবে?” লোকটার নেহাত বয়স হয়েছে তাই ‘তুমি’ বলাটা জ্যাকসন মনে মনে ক্ষমা করে দিল। জ্যাকসন চুপ করে আছে দেখে লোকটা আবার একই প্রশ্ন করল। জ্যাকসন এবার বলল, “সায়েকার বাড়ি যাব। ওকে বলুন মেঘাদি আমায় পাঠিয়েছে।”

“সায়েকা? মানে জানাবাবুর মেয়ে? দাঁড়াও ওদের ফোন করে

একবার জিজ্ঞেস করে নিই।” লোকটা সায়েকাদের বাড়িতে সিকিউরিটি ফোন থেকে ডায়াল শুরু করল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে গেট দিয়ে বেরিয়ে এল সায়েকা। আজ সামনে থেকে ভাল করে দেখে বুঝল ডুডু কেন অত আপসেট হয়ে আছে। এ-মেয়েগুলোর জন্যই ট্রয়ের যুদ্ধ ফুদ্ধ হয়। জ্যাকসনের মনে হল ভগবানের উচিত এক্ষুনি এই টাইপের মেয়ে তৈরি করা বন্ধ করে দেওয়া। সায়েকা গম্ভীর আর বিস্ময় মেশানো গলায় বলল, “মেঘাদি তোমায় পাঠিয়েছে?” জ্যাকসন দেখল দারোয়ানটা আবার গুমটিতে ঢুকে গেছে। আশেপাশে কেউ নেই। ও বলল, “না, মেঘাদি পাঠায়নি, ওটা না-বললে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে না।”

সায়েকা বিরক্ত গলায় বলল, “তবে কী চাও তুমি? দেখো আমি জানি তুমি ওই বাজে ছেলেটার বন্ধু। আমি তোমার সঙ্গে কোনও কথা বলতে চাই না। তা ছাড়া আমার প্যাকিং করার আছে।”

“প্যাকিং? কেন?” জ্যাকসন এবার অবাক হল।

“কাল আমরা দিল্লি যাচ্ছি। আমার দিদা খুব অসুস্থ। দু'-তিন সপ্তাহের আগে ফিরব না।”

জ্যাকসন ভাবল কথাগুলো সায়েকা ওকে বলছে কেন? যাতে ঠিক জায়গায় কথাগুলো পৌঁছে যায় তাই? জ্যাকসন বলল, “তবে আর কী, আমি আসলে বলতে এসেছিলাম যে ডুডু খুব কষ্টে আছে।”

“খারাপ ছেলেরা কষ্টেই থাকে।” সায়েকার গলায় ঝাঁঝ।

“না মানে তোমাদের ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে একটা।”

“ভুল বোঝাবুঝি? কেন কীসের ব্যাপারে? ও পরীর সঙ্গে যেখানে খুশি ঘুরতে পারে। আই কেয়ার আ ড্যাম।”

“নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, কিন্তু তোমার জানা দরকার পরী ওর গার্লফ্রেন্ড নয়।”

সায়েকার ভুরু এবার বিরক্ত থেকে অবাকে মোড় নিল, “তবে সেদিন যে তুমি বললে এই বেলা পরী, ওই বেলা আর একজন। সেটা?”

“ওঃ ইয়ারকিও বোঝো না?” জ্যাকসন হালকা গলায় বলল।

"ইয়ারকি?" সায়েকার গলায় এবার দ্বিধা। জ্যাকসন বুঝল সায়েকার জ্যাকসনের কথা বিশ্বাস করতে খুব ইচ্ছে করছে কিন্তু করতে পারছে না। ও এবার সায়েকাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল, "হ্যাঁ ইয়ারকিই তো। পরীর অন্য প্রেমিক আছে। ডুডু জাস্ট ফ্রেন্ড।"

"অন্য প্রেমিক? মানে? তুমি শিয়োর?" সায়েকা উদগ্রীব হয়ে উঠেছে।

"টু হান্ড্রেড পারসেন্ট।" জ্যাকসন স্মার্টলি বলল।

"কে সে? পরীর প্রেমিক কে?" কী সাংঘাতিক প্রশ্ন করে রে বাবা মেয়েটা। এর তো সি বি আই-এ চাকরি করা উচিত।

জ্যাকসন বুঝল ও ভালই ফেঁসে গেছে। সায়েকা জ্যাকসনকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার প্রশ্ন করল, "কে বলো? যদি তুমি দুশো পারসেন্ট শিয়োর হও, তবে তো তুমি জানবেই।"

জ্যাকসন ঢোঁক গিলল। এই রে একটা নামও মনে আসছে না। কী বলবে ও? সায়েকার ভুরু আবার সন্দেহজনকভাবে বাঁকতে শুরু করেছে। জ্যাকসন দেখল কেস এবার বিগড়ে যাবে। তাই কেস যাতে না-বিগড়োয় ও তাড়াতাড়ি বলল, "আমি।"

১৭

'মোর দিবস রজনী
হায় গো সজনী
জাগিয়া জাগিয়া যেত
তবু স্বপ্ন যে মনে হত
সেই মগন স্বপন সহসা কখনো ভাঙিয়া ভাঙিয়া গেল
সেই পথ দিয়ে বধূবেশে সেজে যেদিন গেল সে হারিয়ে
সেদিন আমার সজল হৃদয় দু'পায়ে গিয়েছে মাড়িয়ে
যাক যা গেছে তা যাক, যাক যা গেছে তা যাক'

দূরের কোয়ার্টারগুলোর থেকে ভেসে আসছে গান। বটতলার কাছটা আজ ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে আছে। দূরে কোয়ার্টারগুলোর আবছা আলো এই অন্ধকারটাকে যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। বটতলাতেই তপনের পানের দোকান। যেটার আলোয় বটতলা কিছুটা উজ্জ্বল থাকে। কিন্তু তপন এমন, যে রোজ দোকানটা খোলেই না। আজ সেরকমই একটা দিন। অন্ধকারে, মাফলারে কান মাথা ঢেকে বসে থাকতে নিজেকে ভূতের মতো লাগছিল পুরুব। তার ওপর এই গান। কী সহজেই সলিল চৌধুরী বলছেন 'যা গেছে তা যাক'। কিন্তু অত সহজে কি যেতে দেওয়া যায়? অন্তত পুরু তো অত সহজে কিছু ছেড়ে দিতে পারে না। কুশ এতক্ষণ পাশেই ছিল, কিন্তু ওর সিগারেট ফুরিয়ে যাওয়ায় মল্লিকবাজারের মোড়ে গেছে কিনতে। যাওয়ার আগে গালাগালি করছিল তপনের দোকানটা বন্ধ থাকায়।

এবার শীতটা জব্বর পড়েছে। নিশ্বাস ফেললেই নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। পুরু একটু কুঁকড়ে বসল। হাতদুটো গরম করার জন্য উইন্ড চিটারের পকেটে ঢুকিয়ে দিল। এই ঠান্ডা আর সহ্য হচ্ছে না পুরুর। এমনিতেই শীতকালটা ওর ভাল লাগে না, তার ওপর এবারের শীতটা তো অসহ্য। একটা মেয়ে, মাত্র একটা সরল চোখের মেয়ে গোটা শীতকালটা বিষাক্ত করে দিয়েছে। ওঃ রোহিণী, তুমি কেন এমন করলে?

এমনিতেই সারা পৃথিবী যেন পুরুর বিরুদ্ধে। সে বাড়িতে বাবাই হোক আর স্কুলের লোকজনই হোক। বাবা তো উঠতে বসতে গালাগালি দেয়। দিনকে দিন যেন সেটা আরও বাড়ছে। পুরু কী করবে? চাকরি কি বাগানে ফলে যে গিয়ে টুক করে পেড়ে আনবে? বাবাকে কে বোঝাবে সেটা? বাবা ভেবেছিল নিজে ভি আর এস নিয়ে পুরুকে চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবে। কিন্তু কোম্পানিতে আর নতুন লোক নেওয়া হচ্ছে না। সেই ঘটনাই বোধহয় বাবাকে আরও খিটখিটে করে তুলেছে। মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয় পুরুর। বাবা তো এরকম ছিল না। তবে কি ওর নিজের অপদার্থতাটাই বাবাকে এমন করে দিল?

ওদিকে প্রাণবল্লভ মিত্রও শত্রুর মতো আচরণ করে রেখেছেন। পুরুকে একদিন ডেকে পাঠিয়েছিলেন উনি। কোনও ভণিতা না-করে সোজা বলেছিলেন, "কে জি বি-র সঙ্গে ম্যাচটা হারলে তবে? এই জন্যই কি তোমায় রেখেছি আমরা? শুনেছি টিমের ভেতর খুব গন্ডগোল চলছে? দিয়েগো নাকি তোমায় মানছে না? শোনো, তোমার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, তুমি ফুটবলার ছিলে, তাই তোমায় এই সুযোগটা আমি দিয়েছি। না হলে হাড় হাভাতেদের প্রতি আমার কোনও সিমপ্যাথি নেই। সামনের সেকেন্ড ফেব্রুয়ারির ম্যাচটা যদি টিম জিততে না-পারে তবে তোমায় আর আমাদের স্কুলমুখো হতে হবে না। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?" একটা বিখ্যাত সিনেমার অনুকরণে পুরুর বলতে ইচ্ছা করেছিল, "ক্রিস্টাল।" কিন্তু পারেনি। এরকম অর্ধেক বাঘ, অর্ধেক মানুষের সামনে কথা বলা খুব শক্ত।

সেদিন থেকে পুরু একটু তেবড়ে আছে। কী যে হবে কে জানে? এই বটতলাটাই যেন ওর জীবনের পোয়েটিক ইন্টারপ্রিটেশন। ঘুটঘুটে অন্ধকার আর জব্বর ঠান্ডায় জমে থাকা এক সময়খণ্ড। আর এই পরিস্থিতির মধ্যে রোহিণী! মেয়েটা পুরুকে পুরো শেষ করে দিয়েছে। এই ঠান্ডাতেও রোহিণীর কথা মনে পড়ায় কান গরম হয়ে উঠল পুরুর। সেই সন্ধ্যায় ছিনতাইয়ের ঘটনার পর থেকে পুরু কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি রোহিণীকে। কোনও মেয়ে কোনওদিন পুরুকে এরকম নাড়া দেয়নি। তারপর থেকে পুরু বিভিন্ন রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে রোহিণীর যাতায়াতের পথটা মোটামুটি জেনে নিয়েছে। বিকেলের একটা নির্দিষ্ট সময়ে সিনেমা হলের সামনে দিয়ে হেঁটে যায় রোহিণী। তারপর থেকেই পুরু সেই সিনেমা হলের সামনে একটা চায়ের দোকানে বসে থেকেছে। শুধু বসেই থাকেনি, অকথ্য বাজে চা-ও খেয়েছে কয়েক ভাঁড়। রোহিণী কি ওকে দেখেনি? দেখেছে। না হলে কেন্নই বা রোহিণী রাস্তার ঠিক ওই জায়গাতে এসেই ধীরে ধীরে হাঁটবে? অনর্থক চুল ঠিক করবে? কেন্নই বা সম্পূর্ণ অকারণে বাঁ হাতের ঘড়িটা দেখে একবার আলতো করে তাকাবে চায়ের দোকানটার দিকে? পুরু জানে রোহিণী ওকে দেখে। তবে

সেটা কি পছন্দ করে বলে দেখে? ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে খুব ইচ্ছা করলেও পুরু বিশ্বাস করে না। ওর জীবনে সুন্দর ঘটনাগুলো খুব কম ঘটেছে কিনা।

ওই রোজ রোজ বসে থাকা আর একটু দেখা দিয়ে আর কাঁহাতক পারা যায়? পুরুও পারছিল না। এর উপায় একটাই। রোহিণীকে সরাসরি বলা। কিন্তু তার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানা দরকার। দুম করে তো কাউকে প্রপোজ করে দেওয়া যায় না। আর, এর জন্য শ্রেষ্ঠ লোক হল কুশ। সব মেয়ের নাড়িনক্ষত্র যার জানা। কোনও উপায় না-দেখে একদিন কুশকে ধরল পুরু। বলল, "কুশ, একটা মুশকিলে পড়েছি। তোর হেল্প দরকার।"

"এনি টাইম। বল কী দরকার।"

"একটা মেয়ে। মানে... মেয়েটাকে আমার ভাল লাগে..."

" তাই? দারুণ খবর। কে? মেয়েটা কে?" কুশ উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"রোহিণী। গঙ্গার ধারে ম্যানশনটায় নতুন এসেছে।"

"রোহিণী? গঙ্গার ধারে? আশ্চর্য আমি দেখিনি তো!" কুশের মুখে অবিশ্বাস আর যন্ত্রণা। একটা মেয়ে বাটানগরে নতুন এসেছে আর ও জানে না? হতে পারে? পুরু মুখ চুন করে বিস্তারিত ভাবে কুশকে বলল সেই ছিনতাইয়ের ঘটনা। রোহিণীর কথা, ওর বোনের কথা। এও বলল যে ওরা ওকে নেমন্তন্ন করে রেখেছে ওদের বাড়ি যেতে। সব শুনেটুনে কুশ বলল, "তবে তো হয়েই আছে। একদিন ওদের বাড়ি চলে যা। ভালই হবে।"

"চলে যা মানে? মামার বাড়ি নাকি যে দুর্গাপুজোয় ঘুরতে যাব?" পুরু তেতো মুখে বলল।

"কেন নেমন্তন্ন তো করেই রেখেছে। একবার গিয়ে পড়তে পারলেই তো হয়।" কুশ নির্বিকারভাবে জবাব দিল। পুরু চটে গিয়ে বলল "ফালতু বকিস না। সে তো ভদ্রতা করে যেতে বলেছে। ওতে কারও বাড়ি যাওয়া যায় নাকি?"

"যায় না? তবে কি শালা তোমাকে নেমন্তন্নের কার্ড ছাপিয়ে নেমন্তন্ন করবে? শোন, পেটে খিদে মুখে লাজ নিয়ে প্রেম করতে নেমেছিস? পেছনে দম নেই দমকল সাজতে গেছে।" কুশও গরম হয়ে জবাব দিল। পুরু দেখল ব্যাপারটা হাতের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। ও কুশকে খোশামোদ করার গলায় বলল, "আহা খচে যাচ্ছিস কেন? প্লিজ একটু খবর নে না মেয়েটা সম্বন্ধে। তোকে তো ওর হোয়্যারঅ্যাবাউটস সবই বললাম।" পুরুর গলায় এমন কিছু ছিল যে কুশ আর ফেলতে পারল না ওর অনুরোধ। শুধু মুচকি হেসে বলল, "শালা পথে এসো। মেয়ের নামে নাল পড়ছে। ঠিক আছে যা, খবর দিয়ে দেব।"

কুশ খবর দিতে পারেনি। কয়েক দিন আগে এরকমই এক সন্ধ্যায় এসেছিল কুশ। মুখের ভাবটা একটু নিরাশাজনক। ও এসেই বলল, "শালা কোন বাড়ির মেয়ে পছন্দ করেছিস তুই? ওঃ বাড়ি না স্তালিনের আয়রন ওয়াল? গঙ্গার কাছে যে ব্যাপক ম্যানশনটা না? ওরকম খণ্ডহর টাইপের আর্ট ফিল্ম মার্কা বাড়িকে পুরো পেন্ট হাউজ বানিয়ে ছেড়েছে। অবশ্য ভেতরে ঢুকতে পারিনি, বাইরে থেকে উঁকিঝুঁকি মেরেই বুঝেছি দারুণ বাড়ি। আর তোর রোহিণী, গুরু, দারুণ জিনিস। ওরকম ফিগার, অমন স্কিনটোন, শালা শোকেসই এত, গোডাউনে না জানি কত দারুণ জিনিস আছে। দারুণ বাড়িতে ছিপ ফেলেছিস। তবে এটুকুই। এর বেশি কিচ্ছু খবর পাইনি। একেতেই ওরা নতুন এসেছে তার ওপর প্রচুর বড়লোক। ঠাকুর চাকরে বাড়ি ভরতি। আর সে-মালগুলো হেভি ঢ্যাটা। কিছুতেই কোনও কথা বলে না। বাইরের কোনও লোকও যায় না ওদের বাড়িতে। জানি না গুরু এ-মেয়েকে তুই কীভাবে তুলবি। আর সত্যি বলতে কী মেয়েটার মধ্যে এমন একটা পারসোনালিটি আছে না যে ওকে ডেকে যে কথা বলব তাতে ব্রহ্মতালু অবধি শুকিয়ে যায়। মাইরি, ওদের ফ্যামিলির কী এত গোপন কেস আছে জানি না, তবে যাই হোক যা করার তোকেই করতে হবে। আমি এর মধ্যে নেই।"

একটাও কথা না-বলে চুপ করে পুরোটা শুনেছিল পুরু। অবশ্য কী-ই বা বলবে। অত বড়লোকের একজন মেয়ে আর ও নিজে চালচুলোহীন।

একদম বাংলা মেলোড্রামাটিক সিনেমার প্লট। তবে কি সত্যি আর্ট ইমিটেট লাইফ? কিন্তু একটা ব্যাপার ঠিক, যা করতে হবে ওকেই করতে হবে। কেউ হেল্প করবে না। আর যা করতে হবে তাড়াতাড়ি করতে হবে। পুরু কোনওদিন ভাবেনি একটা মেয়ের জন্য এমন মন খারাপ হতে পারে ওর। গত ক'দিন ধরে যেন কিছুই করতে পারছে না। ও ভেবেছিল কুশ কোনও খবর আনবে। কিন্তু না, সে-গুড়েও বালি।

এর দু'দিন পর ছিল সেই দিন যার কষ্টটা ওকে এখনও ভোগাচ্ছে বা হয়তো সারাজীবন ভোগাবে। একটা অত সুন্দর চোখের মেয়ে অমন নিষ্ঠুর হতে পারে? কী চেয়েছিল পুরু? সামান্য একটু কথা বলতে? সামান্য একটু নিজের কথাটা জানাতে?

সেদিনও বিকেলে পুরু চায়ের দোকানে বসে ছিল। সেই একঘেয়ে শীত, অকথ্য চা আর রুক্ষ একটা সূর্যাস্ত। রোহিণীর আসতে একটু দেহি হয়েছিল সেদিন। পুরু সেদিন আর শুধু দেখেই চলে যায়নি। ও পিছু নিয়েছিল মেয়েটার। বাটা সিনেমার পর সামান্য এগোলে মল্লিক বাজারের মোড়। তার ডানদিকের রাস্তা দিয়ে সোজা যেতে হয় গঙ্গার পাড়ে। রোহিণীর যাওয়ার পথও সেটা। এই পথের দু'পাশে সবুজ মাঠ। তাতে নানারকম বড় বড় গাছ। সন্ধে হলেই এই গাছগুলোর আশেপাশে কুঞ্জবন গড়ে ওঠে। এখন থেকেই সেখানে জোড়া ছেলেমেয়েদের ভিড় বাড়তে লেগেছে। কিন্তু পুরুর সেদিকে কোনও খেয়ালই হয়নি। ও শুধু মেয়েটাকে নিজের মনের কথা বলতে চেয়েছিল। আর তাই বহুব্রীহি ক্লাবের কাছে রাস্তা একটু ফাঁকা পেতেই রোহিণীর একদম সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল পুরু।

চমকে গেলেও কি মেয়েদের সুন্দর লাগে? সব মেয়েদের কথা বলতে পারবে না পুরু, কিন্তু এ-মেয়ের ব্যাপারটা সেরকমই। পুরু লক্ষ করেছিল রোহিণীর মধ্যে একটা অপ্রস্তুত ভাব, খানিক বিরক্তিও কি? কে জানে। পুরু থরথর করে কাঁপছিল। ওর মনে হচ্ছিল পায়ে বুঝি একদম জোর নেই। কুশের কথামতো সত্যিই ব্রহ্মতালু শুকিয়ে গিয়েছিল ওর। তবু জীবনের সমস্ত সাহস আর ভালবাসা এক জায়গায় এনে বলেই

ফেলেছিল পুরু। পাতা খসে পড়ার মতো শান্ত কিন্তু নরম শব্দের মতো শুরু করেছিল পুরু, "রোহিণী তুমি কি আমায় চিনতে পেরেছ? আমি পুরু। অনেক দিনের সাহস জমিয়ে নিয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি। তুমি জানো যে তোমায় একদিন না-দেখলে আমার মন খারাপ হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে তোমার মুখটাই মনে পড়ে। আমি জানি না এর কোনও অর্থ হয় কিনা। জানি না তোমার কাছে এর কোনও গুরুত্বও আছে কিনা। কিন্তু এই কথাগুলো তোমায় না-বলে আমি থাকতে পারছিলাম না। তুমি কি একটু ভাববে ব্যাপারটা নিয়ে? দেখো, আমি খুব সাধারণ বাড়ির ছেলে। চাকরিবাকরিও তেমন কিছু করি না। জানি আমার মতো ছেলেদের প্রেমটেমের কোনও অধিকারই নেই। তবু তুমি কি একটু ভেবে দেখবে? আমি তোমাকে খুব ভালবাসব রোহিণী। তুমি কি আমায় তোমাকে ভালবাসতে দেবে?"

পুরুর ভেতরে যে এতটা আবেগ ছিল ও নিজেও কল্পনা করতে পারেনি। কিন্তু পুরু যতক্ষণ কথা বলছিল রোহিণী একবারও ওর দিকে তাকায়নি। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। এমনকী একটা কথাও বলেনি। পুরুর কথা শেষ হওয়ার পর বড় বড় চোখ তুলে ওর দিকে তাকিয়েছিল একবার, তারপর পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল ওর বাড়ির পথে।

ওই বড় বড় চোখ, ওই শান্তভাবে হেঁটে চলে যাওয়া, একটা কথাও না-বলা, এসবের কী মানে করবে পুরু? কিন্তু এর যা-ই মানে হোক, প্রচণ্ড খারাপ লেগেছিল পুরুর। ভেবেছিল একটা কথাও বলল না? এত অহংকার। এই অপমান কি প্রাপ্য ছিল পুরুর? সেদিনের পর থেকে প্রচণ্ড খারাপ লাগছে পুরুর। নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে। ভাবছে, কথাগুলো ওভাবে না-বললেই পারত ও। কী দরকার ছিল গাল বাড়িয়ে থাপ্পড় খাওয়ার?

বটতলার এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে বসে এইসব কথাই এখন মনে পড়ছে পুরুর। আর যত ভাবছে ততই মন মেজাজ তেতো হয়ে যাচ্ছে। হয়তো কাউকে বলতে পারলে ভাল হত। কিন্তু বলবেই বা কাকে? বলার মধ্যে

এক কুশ। কিন্তু সে ব্যাটাও অপদার্থ। জিনিসের গুরুত্ব না-বুঝেই হাবিজাবি বকতে শুরু করবে।

মাফলারটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে বসল পুরু। ওঃ শীতকাল কী অসহ্য। আর কুশটাই বা কোথায় গেল? সিগারেট কিনতে তো এত সময় লাগে না। তবে কি বাড়ি চলে যাবে পুরু? কিন্তু তাও ইচ্ছে করছে না। চুপ করে বসে থাকল পুরু। নাহ্, কুশ আসুক। যেমনই হোক কুশ ওর বন্ধু তো।

দূর থেকে চাপা একটা মোটরবাইকের আওয়াজ পেল পুরু। চিনতে পারল। এ হল কুশের মোটরবাইক। যাক ছেলেটা আসছে তা হলে শেষ পর্যন্ত।

বাইকটা গাছের সামনে দাঁড় করিয়ে কুশ চিৎকারের ভঙ্গিতে বলে উঠল, "পুরু কি এম এল এ, কি এম এল এ। প্রায় ফরটি ফাইভ হল তবু শালা ডাঁসা পেয়ারা যেন। মাইরি ওই জন্যই দেরি হয়ে গেল। ডোন্ট মাইন্ড।"

এম এল এ? ডাঁসা পেয়ারা? ফরটি ফাইভ? কী বলছে কুশ? এর মানে কী? কুশ কিন্তু পুরুর পাশে বসল না। সামনেই হাত পা ছুড়ে কীসব বলার চেষ্টা করতে লাগল, পুরু এক লাইনও বুঝল না কী বলছে কুশ কিন্তু এটুকু বুঝল যে কোনও কারণে কুশ খুব একসাইটেড। ও ধীর ভাবে বলল, "কাম ডাউন কুশ। কী হয়েছে? এত উত্তেজিত কেন? আর এম এল এ মানে?"

কুশ লম্বা শ্বাস নিল একটা, বোধহয় নিজেকে শান্ত করার জন্যই। তারপর বলল, "তুই ক্যালানেই রয়ে গেলি রে পুরু। এম এল এ মানে হল 'মারনে লায়েক আন্টি'।" বলে ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে হাতের ইশারা করল কুশ। ব্যাপারটার মধ্যে যে অশ্লীল ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে তা বুঝতে একটু সময় লাগল পুরুর। তারপর ও বলল, "আবার অসভ্যতা শুরু করেছিস?"

"অসভ্যতা? মানে?" কুশ অবাক হয়ে গেল, "নো অসভ্যতা। আরে সিগারেট কিনে ফিরছি হঠাৎ মালা আন্টির সঙ্গে দেখা। মানে আন্টি বলছি বিপাকে পড়ে। কারণ মালার সঙ্গে দি বলতে খারাপ লাগে। যাক

গে। বহু দিন পর ওকে দেখলাম, বুঝলি। ওঃ, আমায় চিনতে পেরে গাল টিপে হাত ধরে কত আদর করলেন। শালা কী বলব আমার মায়ের বান্ধবী, আন্টি বলে ডাকতে হয়, কিন্তু অমন কোমর পাছা, বুক, শালা আমার যা অবস্থা হচ্ছিল না। পুরু, মনে হচ্ছিল ওর সঙ্গে ওর বাড়িতেই চলে যাই। কী বলব তোকে, পৃথিবীতে যে চন্দ্র সূর্য এখনও ওঠে এইসব মহিলারাই তার প্রমাণ।"

বিরক্তি কী বিরক্তি! কুশ মহিলা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। নিজের মায়ের বান্ধবী, তারও শরীর দেখে বেড়াচ্ছে। ও কি সেক্স স্টার্ভড না যৌন ম্যানিয়াক? ধ্যাত্তেরি, আর বসে থাকবে না পুরু। বাড়িতেই ফিরবে। কুশের সঙ্গে থাকলে মেজাজ আরও খারাপ হয়ে যাবে। আর দেরি না-করে উঠে পড়ল পুরু। কুশ জিজ্ঞেস করল, "আরে চললি কোথায়? এত ইন্টারেস্টিং গল্প বলছিলাম।"

পুরু বলল, "না রে বাড়ি যাই। খুব দরকারি একটা কাজ মনে পড়ল। ভুলেই গেছিলাম।" কুশকে আর কথা বলার সুযোগ না-দিয়ে বটতলার অন্ধকার থেকে সামনের রাস্তায় উঠল পুরু আর তখনই ঘটল বিপত্তিটা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক ধাক্কায় মাটিতে ছিটকে পড়ল পুরু। কিছুক্ষণের জন্য সব কিছু কালো হয়ে গেল চারদিক। তারপর ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফিরে এল যখন, দেখল কুশ ওর ওপর ঝুঁকে আছে। তার পাশে আরেকটা মুখ। পুরুর মুখটা চিনতে সামান্য সময় লাগল। কিন্তু চিনতে পেরেই বলল, "দিয়েগো না?"

"স্যার, আপনার লাগেনি তো? আসলে সাইকেলটা নিয়ে তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলাম তো, আর আপনি হঠাৎ বটতলার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আমার সামনে এসে পড়ায় আমি সাইকেলটা ব্রেক মারতে পারিনি। খুব লেগেছে স্যার?" পুরু ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। ডান হাতের কনুইটার কাছটা টনটন করছে। সঙ্গে জ্বলছেও খুব। কেটে গেছে নিশ্চয়ই। পুরু বলল, "না না আমি ঠিক আছি। তুমি এত হুড়োহুড়ি করে কোথায় যাচ্ছ?" দিয়েগো খানিক চুপ করে থাকল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, "স্যার, খুব বিপদে পড়েছি। কী করব বুঝতে পারছি না।"

"কেন?" পুরু জিজ্ঞেস করল।

কথা বলতে গিয়ে দিয়েগোর গলাটা সামান্য কেঁপে গেল, "স্যার, মা। মায়ের দুই বোতল রক্ত লাগবে। বাটা হসপিটাল দিতে পারছে না। ব্লাড গ্রুপটাও রেয়ার। কী করব ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"কোন গ্রুপ তোমার মায়ের?"

"এ বি নেগেটিভ।"

পুরু থমকে গেল মুহূর্তের জন্য, তারপর শান্ত গলায় বলল, "দেন দ্য অ্যাক্সিডেন্ট প্রুভস টু বি আ গুড ওয়ান।"

১৮

"বল তো কোন জিনিস লাল আর ট্রিং ট্রিং ট্রিং শব্দ করে?"

"লাল? ট্রিং ট্রিং ট্রিং করে? কে জানে।"

"পারলি না তো? টমেটো।" জ্যাকসন চিকলেট মুখে পুরে বলল।

"টমেটো? ভাগ, টমেটো ট্রিং ট্রিং ট্রিং করে কোথায়?" কবীর খিঁচিয়ে বলল।

"আরে ট্রিং ট্রিং ট্রিং ব্যাপারটা তো তোকে মিসগাইড করার জন্য বলা।"

কবীর থতমত খেয়ে গেল। দিয়েগোর হাসি পেল খুব।

জ্যাকসনটা পারে বটে। ও শুনল জ্যাকসন আবার প্রশ্ন করছে, "বল তো কোন জিনিস লাল আর ট্রিং ট্রিং শব্দ করে?"

"আবার? পারব না।" কবীর এবার হাত তুলে দিল।

জ্যাকসন কায়দার হাসি দিয়ে বল, "কলিংবেল।"

"মানে? ইয়ারকি? কলিংবেল লাল?" এবার ডুডু চোখ পাকিয়ে প্রশ্ন করল।

"আরে লাল ব্যাপারটা তো তোদের মিসগাইড করার জন্য বলা।"

ডুডু চোখ ছানাবড়া করে তাকিয়ে থাকল। জ্যাকসন আবার প্রশ্ন

করল, "আচ্ছা বল তো কোন জিনিস লাল আর ট্রিং ট্রিং ট্রিং শব্দ করে?"

এবার আমন বলল "কী বলছ্ না তুমি!"

"কেন বল।" জ্যাকসন আবার বলল।

"পারব না।"

জ্যাকসন ঠোঁট চেপে হাসি আটকে বলল, "কেক।"

"কেক? কেক লাল আর ট্রিং ট্রিংট্রি করে? মারব শালা।"

কবীর আবার খিঁচিয়ে উঠল।

"আরে লাল আর ট্রিং ট্রিং ট্রিং দুটোই তো তোদের মিসগাইড করার জন্য বলা।" জ্যাকসন শান্তভাবে বলল। সত্যি এই না হলে জ্যাকসন। জ্যাকসন আবার বলল, "এবার লাস্ট কোয়েশ্চন। বল তো কোন জিনিস লাল আর ট্রিং ট্রিং ট্রিং শব্দ করে?"

দিয়েগো এবার নিজে বলল, "তোর মাথা।"

"না, দমকলের গাড়ি। পারলি না তো। লাল আর ট্রিং ট্রিং শব্দটা তোদের ক্লু দেবার জন্যই তো বলা।" জ্যাকসন খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগল।

দিয়েগো মাথা তুলে দেখল লাল চিল ঘুড়িটা আজও উড়ছে। রাধাকাকু আর বোঁ ঘুড়িটা ওড়ায় না। এখন বাটানগরের মাথায় লাল ঘুড়িটা ওড়ে। দিয়েগোর মনে হয় যেন আকাশ থেকে আগুন রঙের এক পাখি বাটানগরকে লক্ষ রাখছে।

প্র্যাকটিস শেষ হয়েছে কিছুক্ষণ হল। আর দিন আটেক বাকি আছে ম্যাচের। পুরু জোর কদমে প্র্যাকটিস করাচ্ছে এখন। আজও প্র্যাকটিস হয়েছে ভাল। তারপর নিজেদের মধ্যে টিম করে খেলাও হয়েছে। দিয়েগো এবার পুরুর কথা শুনে প্র্যাকটিস করছে। আসলে পুরু যা করেছে ওর জন্য! কিন্তু গত কয়েক দিন হল দিয়েগো লক্ষ করেছে পুরু যেন কেমন আনমনা। সব কিছুই করছে কিন্তু কোথায় যেন ফাঁক। আগে পুরু প্র্যাকটিসের পর একটু বসে কথাটথা বলত, কিন্তু এখন প্র্যাকটিস শেষ হলেই পুরু চলে যায়। কী ব্যাপার দিয়েগো বুঝতে পারে না।

ডুডু হয়তো দিয়েগোর মনের কথাটাই ধরতে পারল। বলল,

"আজকাল একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিস? পুরু স্যার কেমন জানি হয়ে গেছেন, না? একটু গম্ভীর, একটু অন্যমনস্ক, ঠিক না?"

কবীর বলল, "যা বলেছিস। কী কেস বল তো?"

জ্যাকসন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "আমি জানি কী কেস।"

"তুমি তো মাল সব জানো শালা সবজান্তা গামছাওলা।"

কবীর জ্যাকসনকে হ্যাটা করে বলল।

জ্যাকসনও পালটা বলল, "আমি তো আর তোর মতো ক্যালানে নই যে কিছু জানব না। আমার কাছে খবর আছে।" দিয়েগো দেখল কবীর আর জ্যাকসনের আবার গন্ডগোল লাগছে। কিন্তু ও কিছু বলল না। কবীর এখনও ওর সঙ্গে ভালভাবে কথা বলে না। দিয়েগোর খারাপ লাগে। ছোটবেলার বন্ধু সবাই এরা। আর এরাই ওকে বিশ্বাস করে না। তবে আগে যেমন কবীর দিয়েগোর সামনেই থাকত না, সেটা এখন হয় না। ওরা এক আড্ডায় বসে কিন্তু কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না।

কবীর জানতে চাইল, "কী খবর আছে তোর কাছে?"

"তোকে বলব কেন? খুব চুলকানি, না? স্যারের খবর শুনতে খুব ভাল লাগে?" জ্যাকসন কবীরকে ভেঙিয়ে বলল।

ডুডু ব্যাপারটা সামাল দিতে বলল, "স্যারের কোনও কেসফেস নাকি?"

"কেস বলে কেস? একদম সুটকেস। সেই যে রে মনে নেই, সেই তিমিরের ব্যাপারটা। সেই যে ছিনতাই হল। স্যার অরণ্যদেবের রোল প্লে করলেন।" জ্যাকসন ঝুঁকে বসে গোপন তথ্য ফাঁস করার মতো করে বলল।

"তো?" ডুডু ব্যাপারটা বুঝতে না-পেরে জিজ্ঞেস করল।

দিয়েগো ব্যাপারটা শুনেছিল, তবে জ্যাকসন কী বলতে চাইছে সেটা বুঝতে পারল না।

"ডুডু, তুই সত্যিই দুদুভাত। পুরু স্যার ফেঁসে গেছেন। সেই যে সেই রোহিণী। যার ব্যাগ স্যার উদ্ধার করলেন।" জ্যাকসন হেসে বলল।

"তুমি কী করে জানলে?" আমন এবার জিজ্ঞেস করল।

"আরে আমি নিজে দেখেছি। স্যার, ওই রোহিণীর পেছনে ঘুরছেন।"

"মানে এখনও কেসটা পাকেনি?" কবীর জানতে চাইল।

জ্যাকসন বলল, "না। ওয়ান সাইডেড অ্যাফেয়ার। স্যার দেখেই সন্তুষ্ট। আরে সেইজন্যই তো স্যার এমন টাল খেয়ে গেছেন।"

দিয়েগোর আর ভাল লাগছিল না। পুরু ব্যক্তিগত জীবনে কী করছে সেটা তো অন্য কারও দেখার কথা নয়। ও জ্যাকসনকে বলল, "থাম তো। ফালতু কথা যত সব। সামনে খেলা আর পরীক্ষা। সেটায় কনসেন্ট্রেট কর।"

কবীর চাপা গলায় বলল, "হুঁ, কে বলছে দেখ।" দিয়েগো পাত্তা দিল না। ও ঠিক করে নিয়েছে যে এ ব্যাপারে আর কোনও রিঅ্যাক্ট করবে না। সেকেন্ড ফেব্রুয়ারির ম্যাচটায় সমস্ত উত্তর দিয়ে দেবে ও। এবার লোক দেখবে কেন ওকে দিয়েগো বলা হয়।

মাঠ থেকে উঠে পড়ল দিয়েগো। ওর একটা কাজ আছে। দু'দিন হল মা বাড়িতে এসেছে। সব শেষে ডাক্তাররা ধরতে পেরেছিলেন যে ইন্টারন্যাল আল্যার্জি হয়েছিল মায়ের। আর তার ফলে গলার ভেতরে ঘা হয়েছিল। অ্যালার্জিটা হয়েছিল দুধ থেকে। মা তো লিকুইড খেত শুধু। আর তার মধ্যে দুধটাই প্রধান। কেউ বুঝতেই পারেনি, যে-খাদ্যটা প্রধানত মা খাচ্ছে, সেটার থেকেই শরীরটা খারাপ হচ্ছে। ভাগ্যিস শেষ মুহূর্তে ব্যাপারটা ধরা পড়েছিল, তাই তো মা সুস্থ হওয়ার পথে। অবশ্য এর মধ্যে পুরুর অবদানও অনেকখানি। দিয়েগো ভাবল সেদিন যদি পুরুর সঙ্গে ধাক্কা না-লাগত তা হলে অত রাতে কোথায় পেত এবি নেগেটিভ রক্ত।

কোনওদিন দিয়েগো ভুলতে পারবে না সেই সন্ধেটার কথা। মাকে দেখে ডাক্তার বলেছিলেন ব্লাড লাগবে। এবি নেগেটিভ। সেটার স্টক বাটা হাসপাতালে নেই। সাধারণত কোনও জটিল কেস এলে বাটা হাসপাতাল রোগীকে কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু মায়ের শারীরিক অবস্থা এমনই ছিল যে বাটা থেকে এস এস

কে এম-এ যাওয়ার ধকল মা নিতে পারত না। ফলে বাটা হাসপাতালের ডাক্তারই নামকরা সিনিয়ার ডাক্তারদের, সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের আনিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক আর গম্ভীর ডাক্তারবাবুই কিছু নতুন টেস্ট করে উদ্ধার করেছিলেন মূল রোগ। আর দিয়োগোদের বলেছিলেন রক্ত দিতে হবে মাকে। মায়ের ব্লাড গ্রুপ অনুযায়ী এবি নেগেটিভ রক্ত লাগবে।

সন্ধে প্রায় আটটার কাছাকাছি ওই রেয়ার গ্রুপ কোথায় পাবে? দিয়েগোর ওরকম অসহায় বোধহয় কোনওদিন লাগেনি। ও আর বাবা মিলে যত চেনাশোনা মানুষ আছে সবার বাড়ি গিয়েছিল কিন্তু কারওই ব্লাড গ্রুপ এবি নেগেটিভ নয়। ততক্ষণে টেনশনে বাবার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে। নিমেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাবা। এক বন্ধুকে নিয়ে রওনা দিয়েছিল কলকাতায়। নিশ্চয়ই ওখানকার ব্লাড ব্যাঙ্কে এই রক্ত পাওয়া যাবে। কিন্তু ততক্ষণে যদি দেরি হয়ে যায়? দিয়েগো চিন্তা করে নিয়েছিল। জ্যাকসন। ওর প্রচুর চেনাজানা। এবার ওর সাহায্য নিতেই হবে। ওকে নিয়ে বেরিয়ে দেখবে। নিশ্চয়ই ওর চেনাশোনা কারও-না-কারও এবি নেগেটিভ রক্ত হবেই। তাই তো পাগলের মতো জোরে সাইকেল চালাচ্ছিল দিয়েগো। যে-করেই হোক জ্যাকসনকে ধরতেই হবে। একটু অন্যমনস্ক আর প্রচুর টেনশনে ছিল ও। আর তাই কি অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল?

বটতলাটা এমনিতেই অন্ধকার। সেদিন যেন আরও অন্ধকার লাগছিল। বটগাছটাও বিশাল বড়। তার নীচের গোল ছায়াটা দিনের বেলাতেও কেমন অন্ধকার অন্ধকার থাকে। আর রাতে তো কথাই নেই। সেদিন সেই অন্ধকার থেকেই হঠাৎ রাস্তায় উঠে এসেছিল পুরু। দিয়েগো শেষ মুহূর্তে দেখেছিল পুরুকে। ব্রেকও চাপার চেষ্টা করেছিল সাইকেলের, কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছিল ততক্ষণে। পুরু দিয়েগো আর সাইকেল একসঙ্গে পড়ে গিয়েছিল রাস্তার পাশে ঘেঁসের ওপর। বেশ রাগ হয়েছিল দিয়েগোর। এই লোকটা সবসময় মাঝখানে চলে আসে। এমনিতেই রক্তের জন্য পাগল পাগল অবস্থা। কিন্তু ও চমকে গিয়েছিল

যখন ওর কথা শুনে পুরু বলেছিল, "দেন দ্য অ্যাক্সিডেন্ট প্রুভস টু বি আ গুড ওয়ান।"

পুরুর রক্তের গ্রুপ এবি নেগেটিভ! দিয়েগো আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় কথা বলতে পারেনি। দিয়েগোকে অবশ্য কিছু বলতেও হয়নি। পুরু নিজেই এগিয়ে এসেছিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওর বন্ধু কুশের মোটরবাইকে করে পৌঁছে গিয়েছিল হাসপাতালে। ওদের পেছনে পেছনেই পৌঁছেছিল দিয়েগো। ব্লাড ম্যাচ করিয়ে রক্ত দিতে আরও খানিকটা সময় গিয়েছিল। হাসপাতালের করিডোরে চুপ করে বসে ছিল দিয়েগো। ম্রিয়মাণ বেগুনি আলো, পালিশ ওঠা বেঞ্চ। সাদা পোশাকের নার্সদের সামান্য শব্দের সঙ্গে চলা ফেরা। হালকা ডেটল, ওষুধ আর রক্তের গন্ধও কি? প্রতিটা মুহূর্ত কে যেন টেনে লম্বা করে দিয়েছিল। মাঝে একবার হাসপাতালের পি সি ও থেকে বাবার মোবাইলে ফোন করেছিল দিয়েগো। বলেছিল যে রক্তের বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। তবু বাবা দু'পাউচ রক্ত নিয়ে আসছে, খবর পেয়েছিল ও। দিয়েগো আবার ফিরে এসে বসেছিল করিডোরে। তখন রাত নেমে আসছে বাটানগরে।

অনেকক্ষণ পরে করিডোরের একদম অন্য মাথায় দিয়েগো দেখেছিল পুরু আসছে। ধীরে, মাথা নিচু, সামান্য দুর্বলও। ওকে দেখে বুকটা ধক করে উঠেছিল দিয়েগোর। মা ঠিক আছে তো? কাছে এসে পুরু বসেছিল ওর পাশে। ভয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেনি দিয়েগো। পাছে অন্য কোনও খারাপ খবর পুরু ওকে বলে। কিন্তু পুরুই প্রথম কথা বলল, "দিয়েগো, চিন্তা কোরো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তার বললেন ঘণ্টা তিনেক অপেক্ষা করতে। লেট আস ওয়েট।"

পুরু অপেক্ষা করবে? দিয়েগো ভাবতেই পারেনি। দিয়েগো বলল, "স্যার, আপনি চলে যেতে পারেন।"

"না। আমি একটু থাকি। কুশকে বলে দিয়েছি আমার বাড়িতে যাতে খবর দিয়ে দেয়।"

"ঠিক আছে স্যার।" দিয়েগোর গলায় নার্ভাসনেস।

"আচ্ছা দিয়েগো, তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো।"

"আসলে স্যার আমার কোনও কিছুই ঠিক হয় না। সব কিছু গন্ডগোল হয়ে যায় সবসময়। সব কিছুর রেজাল্টই শূন্য হয়।"

পুরু সামান্য থামল। হাসলও একটু, বলল, "আসলে জীবনকে দেখার ওপরই সব নির্ভর করে। তুমি বলছ শূন্য মানে '0'। জানো তো '0' যদি ZERO-র শেষ অক্ষর হয়, তবে 'OPPORTUNITY'-র প্রথম অক্ষরও। তোমাদের জীবন এখন সবে শুরু হচ্ছে। খারাপ কথা চিন্তা কোরো না।"

ব্যস এটুকুই। আর কিছু বলেনি পুরু। দিয়েগোর পাশে চুপ করে বসে ছিল। খানিক পরে বাবাও চলে এসেছিল। তবু পুরু যায়নি। মাঝরাতে নার্স এসে বলেছিল মা আউট অব ডেঞ্জার। তারপর পুরু উঠেছিল। দিয়েগো পুরুকে হাসপাতালের দরজা অবধি এগিয়ে দিয়েছিল। যাওয়ার আগে পুরু কিচ্ছু বলেনি। শুধু হেসেছিল সামান্য। দিয়েগো বুঝেছিল যে মাঝে মাঝে কথা না-বলাটাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। রাতের অন্ধকার, হাসপাতালের সোডিয়াম ভেপারের আলো আর কুয়াশার মধ্যে একসময় মিশে গিয়েছিল পুরু। নির্জন রাতের মাঝে হাসপাতালের সেই বারান্দায় একা দাঁড়িয়ে ছিল দিয়েগো। কাছের স্ক্রুপাইন গাছের থেকে টুপ টুপ করে ঝরে পড়ছিল শিশির। আর অদ্ভুত ভাল লাগছিল দিয়েগোর। তবে কি ভাললাগাগুলো ধীরে ধীরে ফিরে আসবে?

ফিরে আসছে। সত্যিই ভাললাগাগুলো ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। মাঠের বাইরে এসে সাইকেলে উঠল দিয়েগো। ওকে একবার ওষুধের দোকানে যেতে হবে। মায়ের একটা ওষুধের দরকার। দোকানের মালিক বুড়োদা বলেছিল কলকাতা থেকে এনে দেবে। চারটে ক্যাপসুল তিনশো নব্বই টাকা দাম। ওষুধটা কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। দিয়েগো বুড়োদার দোকান থেকে ওষুধটা নিল। বুড়োদা বলল, "আর দরকার হলে একটু তাড়াতাড়ি বোলো। ওষুধটা পেতে জান বেরিয়ে গেছে। আসলে খুব দামি তো। সব স্টকিস্টের কাছে পাওয়া যায় না।" দিয়েগো মাথা নেড়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। আর দেরি করবে না, আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাবে।

নঙ্গী স্কুলের সামনের গলিটা দিয়ে শর্টকাট নিল দিয়েগো। তারপর

কালিকা মিস্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে দিয়ে বটতলা হয়ে বাড়ি চলে যাবে। পাড়ার ভেতরের এই রাস্তাটা কংক্রিট করা। তারই পাশে দু'-চারটে কচুরিপানা ভরতি পুকুর। দুটো এমন পুকুর নির্বিঘ্নে পেরোলেও তৃতীয় পুকুরটার সামনে এসে দিয়েগোর সাইকেলটা থমকে গেল। কারণ উলটো দিক থেকে রুদ্র আসছে আর ওর পাশে রুপাই। দিয়েগোর বুকটা ধক করে উঠল। প্রায় বছর দুয়েক হয়ে গেল, তবু আজও রুপাইকে দেখলেই প্রথমে বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা লাগে দিয়েগোর। কিন্তু দু'জনে এখন কোত্থেকে আসছে? আজ তো তাপস স্যারের পড়া নেই। অবশ্য ইংরিজিও ওরা এক স্যারের কাছেই পড়ে।

রুদ্রই প্রথম কথা বলল, "এই যে মারাদোনা? কেমন প্র্যাকটিস চলছে?"

দিয়েগো সাইকেল থেকে নেমে বলল, "ভালই।"

"ব্যস, শুধু ভাল? সামনেই ম্যাচ মনে আছে তো? অবশ্য প্র্যাকটিস ভাল হলেও তোরা হারবি।"

"না, এবার হারব না।" নিশ্চিত গলায় বলল দিয়েগো।

"আচ্ছা?" রুদ্রর গলায় ব্যঙ্গ, "দেখি এবার জিতিস কী করে। মনে নেই গতবার কীভাবে জিতলাম।"

দিয়েগো শক্ত গলায় বলল, "তুই যা ভাবছিস তা নয়।"

"তাই নাকি? তবে এবার তোর হেল্প লাগবে না, এমনিই জিতব।" রুদ্র বাঁকা হেসে বলল।

"হেল্প মানে?" এতক্ষণে রুপাই প্রথম কথা বলল।

দিয়েগো দেখল বিপদ। ও রুদ্রকে বলল, "কী আজেবাজে কথা বলছিস রুদ্র?"

"আজেবাজে কথা? জানিস রুপাই, এই দিয়েগোটা হাড় শয়তান। গতবারের ম্যাচের আগে আমায় বলে কী রুপাইয়ের সঙ্গে আমায় ফিট করিয়ে দে আমি তোদের ম্যাচ ছেড়ে দেব। আর ম্যাচে কেমন খেলেছে সেটা তো সারা বাটানগর দেখেছে।"

"রুদ্র, বাজে বকবি না, মেরে ছাল তুলে দেব।" দিয়েগো আর সহ্য

করতে পারল না, আবার বলল, "জানোয়ার মিথ্যে কথা বলছিস কেন?"

"মিথ্যে কথা! রুপাই তুই বিশ্বাস কর। ও আমায় বলেছে তোকে পেতে ও যা খুশি তাই করতে পারে। তোর কোমরের খাঁজ দেখে নাকি ওর ইয়ে হয়ে যায়।" একটা অন্ধ, বোবা রাগ দিয়েগোকে গ্রাস করে নিল। ও সাইকেলটা ফেলে দিয়ে দৌড়ে এসে ঘাপ করে ঘুষি মারল রুদ্রর পেটে। এটা আশা করেনি রুদ্র। 'মা গো' বলে পেট চেপে বসে পড়ল রুদ্র। "শুয়োরের বাচ্চা, মাগিবাজ।" বলে চেঁচাতে লাগল। দিয়েগো এবার এগিয়ে গিয়ে বাঁ পায়ে সপাটে লাথি মারল ওর পেটে। বাঁধানো রাস্তার থেকে কচুরপানা-ভরতি পুকুরে পড়ে গেল রুদ্র।

দিয়েগো ফুঁসতে লাগল দাঁড়িয়ে। রুদ্রটা এতটা শয়তান জানত না। কিন্তু রুপাই, ও কই? হুঁশ হতে পেছনে ফিরে দেখল দিয়েগো। রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে রুপাই কাঁপছে। চোখের সামনে কোনওদিন মারামারি দেখেনি তো। দিয়েগো গিয়ে ওর সামনে দাঁড়াল, বলল, "তুমি যদি রুদ্রর কথা বিশ্বাস করো সেটা তোমার ব্যাপার। কিন্তু আমি এমন করিনি। রুদ্রই আমায় প্রস্তাব দিয়েছিল। আর সেদিন ম্যাচটা আমি ছাড়িনি। খারাপ খেলেছিলাম তাই হেরেছি। তবে একটা কথা উঠলই যখন তখন বলি, হ্যাঁ। ম্যাচটা ছাড়তে চেয়েছিলাম আমি। কারণ তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে। কিন্তু তবু ম্যাচটা ছাড়িনি আমি। কেন ছাড়িনি কোনওদিন যদি শুনতে চাও বলব। এটুকুই সত্যি। তুমি বিশ্বাস করবে কি করবে না সেটা তোমার ব্যাপার।" রুপাই মুখ তুলে তাকাল ওর দিকে। এখন আর ভয়ে কাঁপছে না। দিয়েগোর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "আমায় ভালবাসো তুমি? আগে বলোনি কেন? শোনো, রুদ্র কী সেটা আমাকে বোঝাতে এসো না। তবে একটা কথা, তোমার সব কথা শুনব আমি। যেমন ভাবে চাও তেমন ভাবেই শুনব যদি সামনের ম্যাচটা জিততে পারো তুমি। না হলে বুঝব রুদ্র সত্যি কথাই বলেছে।" আর কোনও কথা না-বলে রুপাই পুকুরের ধারে গিয়ে হাত ধরে তুলল রুদ্রকে। রুদ্র এখন আর কথা বলছে না। বরং শীতে হি হি করছে। মাথায় একটু কচুরিপানাও লেগে আছে। রুদ্র আর রুপাই হাঁটতে হাঁটতে

দিয়েগোর পাশ দিয়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় রুদ্র শুধু চাপা গলায় বলল, "শালা দেখব সামনের ম্যাচে তুই খেলিস কী করে।"

ওরা চলে যেতে রাস্তাটা খুব শূন্য আর অর্থহীন মনে হল দিয়োগোর। মনে হল অনন্তকাল ধরে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। যেন কোনও জায়গা থেকে ও আসেনি, কোথাও যাওয়ার নেই। এই শূন্যতার মধ্যে ওর কানে শুধু বাজতে লাগল রুপাইয়ের কথা। সামনের ম্যাচটা দিয়েগোর জীবনে অনেক কিছু বদলে দিতে পারে। দিয়েগো মাটিতে পড়ে থাকা, মাডগার্ড তুবড়ে যাওয়া সাইকেলটা সোজা করে হাঁটতে লাগল। সন্ধের অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে মফস্‌সলে। দিয়েগোকেও যেন চারিদিক দিয়ে অন্ধকার চেপে ধরেছে আবার। ভাল লাগা আর ভাল সময়গুলোর আসার এখনও দেরি। দিয়েগো মনে মনে বলল, জীবনে অন্তত একটা খেলায় সবাই হারে। কিন্তু জীবনে তারপরও আরও খেলা আসে। মানুষ ঘুরে দাঁড়ায়। দেখা যাক দিয়েগো পারে কিনা। সাপের মতো আঁকাবাঁকা গলি দিয়ে তোবড়ানো সাইকেল নিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল দয়ারাম আংরে।

১৯

এবার বাসন্তী শাড়িই পরবে টাপুর। গত কয়েকবারে সরস্বতী পুজোয় ও নিজের ইচ্ছেতেই শাড়ি পরেনি। বাবা মা প্রতিবারই শাড়ি পরতে বলে কিন্তু ও পাত্তা দেয় না। ধুত, কে পরে শাড়ি? এবারও তেমনই ভেবেছিল। কিন্তু আজ নিউল্যান্ড স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁঠালচাঁপা আর বকুল ফুলের গাছের ফাঁক দিয়ে একফালি নখের মতো চাঁদ আর তার বাসন্তী আভা দেখে কেন কে জানে হঠাৎ শাড়ির কথাটাই মনে পড়ল টাপুরের। আর দু'দিন পরে সরস্বতী পুজো। হয়তো সেইজন্যই।

"শাড়ি পরলে তোমাকে নদীর মতো দেখায়। মনে হয় বহুদিন পর হাজার হাজার মাইল মরুভূমি পেরিয়ে নদীর জলে পা ডুবিয়ে বসলাম। সেদিন তুমি পেয়ারাগাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে বসে কাঁদছিলে আর আমি

দেখছিলাম ঘাসের ওপর একটা একটা করে মুক্তো ঝরে পড়েছে। আমরা যারা দারিদ্র্য সীমার নীচে বেঁচে থাকি তাদের কাছে ওই এক একটা মুক্তোর কত দাম তুমি জানো?" ক্লাস এইটে পড়ার সময় সোমাদির গানের ক্লাস থেকে গঙ্গার ধারে একবার পিকনিকে গিয়েছিল টাপুর, সব মেয়েরাই সেদিন শাড়ি পরেছিল। অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে অন্ত্যাক্ষরী খেলা নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল ওর। মেয়েটা ওকে বলেছিল, "বড়লোকের বখাটে মেয়ে।" খুব দুঃখ লেগেছিল টাপুরের। গঙ্গার ধারে বাঁধের দিক থেকে হাওয়া দিচ্ছিল একটা। সেটা ছিল বসন্তকাল। নানা ফুলের গন্ধও ভেসে আসছিল দিগ্বিদিক থেকে। আর এর মধ্যে একটা পেয়ারা গাছের গোড়ায় বসে কাঁদছিল টাপুর।

সোমাদির গানের ক্লাসের ছেলেরাও ছিল সেই পিকনিকে। তাদের মধ্যেই কেউ একজন টাপুরকে একটা চিঠি লিখেছিল। গোটা চিঠির মধ্যের এই কথাগুলো আজও মনে আছে ওর। ছেলেটা কে ছিল আজ পর্যন্ত জানতে পারেনি ও। কিন্তু কখনও কখনও ওর এই কথাগুলো মনে পড়ে যায়।

টাপুর নিজের মনেই হেসে ফেলল। সত্যি কত দিন আগের কথা মনে হয় এসব। এবার একবার ঘড়ি দেখল টাপুর। সাড়ে ছ'টা। একজনের আসার সময় হয়ে গেল। আর মিনিট পাঁচ-দশেক বড়জোর। এখন জানুয়ারির শেষ। ঠান্ডার ধার কমে এসেছে অনেকটা। এবার ঠান্ডাটা যেমন হঠাৎ করে পড়ল, তেমনই হঠাৎ করে চলেও গেল। সব ব্যাপারেই এবার যে কী হচ্ছে! কালীপুজোর পর থেকেই সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আর যাতে গোলমাল না হয়, যাতে সব ঠিকঠাক চলে সেইজন্যই তো আজ এই নিউল্যান্ড স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ও। অবশ্য এর মাস্টার মাইন্ড রুদ্র। সব প্ল্যান ওর করে দেওয়া। টাপুর রুদ্রর গোটা প্ল্যানটা মনে মনে ভাবল। সত্যিই পুরোটা ফুল প্রুফ। রুদ্র সত্যিই জিনিয়াস। রুদ্রর সম্বন্ধে অনেক খারাপ কথা শোনে টাপুর। সেগুলোর কিছু হয়তো সত্যিও। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না টাপুরের। রুদ্র সত্যিই ওর দাদার মতো। যখন যা দরকার পড়ে, যখন কিছু পরামর্শের

দরকার হয় তখন টাপুরের প্রথমে রুদ্রর কথাই মনে পড়ে। পুরুর সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের পরও যেমন ওর মনে পড়েছিল। কিন্তু মন এত খারাপ ছিল যে কারও সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেই হয়নি।

পুরুর সঙ্গে সেই সন্ধের ঘনিষ্ঠতার ওম এখনও টের পায় টাপুর। খুব কষ্ট হয় ওর। এখনও লেপের ওমের মধ্যে শুয়ে পুরুর নিশ্বাস যেন ওর বুকের মধ্যে টের পায় টাপুর। শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ও বোঝে শরীরের ভেতরে যেমন আনন্দ লুকোনো থাকে তেমন কষ্টও লুকোনো থাকে। টাপুর ভেবেছিল শিমুলকে বলবে এসব কথা। কিন্তু শিমুলটা যেন কেমন হয়ে গেছে। সেই একাচোরা, জিরো কনফিডেন্স মেয়েটা যেন আর নেই। এখন মাঝে মাঝে শিমুলকে আমনের সঙ্গে দেখা যায় বাটা ব্রিজের ঢালে বসে গল্প করতে। টাপুর জানে শিমুলের আর ওর কথা শোনার তেমন সময় নেই। এখন থাকার মধ্যে আছে কেবল রুদ্র।

ওর কথায় এই রুদ্রই একবার কবীরকে পিটিয়েছিল। কিন্তু ছেলেটা এত কানকাটা যে আবার এক সন্ধেয় গুচ্ছের গিফট্ নিয়ে এসেছিল। তবে সেদিন মজা হয়েছিল খুব। কবীরের বাবা একদম মোক্ষম সময় এসে পড়েছিল । আর ওর সামনেই কবীরের কান ধরে থাপ্পড় মেরেছিল। থাপ্পড়ের ভেলোসিটিতে কবীর উলটে পড়েছিল টাপুরের পায়ে। হাতের গিফট্গুলো ছড়িয়ে পড়েছিল সারা রাস্তায়। কবীরের বাবাকে বাটানগরে সবাই চেনে। টাপুরও চিনত। কবীর আরও মার খেত সেদিন কিন্তু টাপুরই বাধা দিয়েছিল। তবে বাড়িতে গিয়ে কবীরের কী হয়েছিল সেটা টাপুর জানে না। আর জানতে ওর বয়ে গেছে।

দীর্ঘদিন মনমরা থাকার পর গত দু'দিন আগে টাপুর দেখা করেছিল রুদ্রর সঙ্গে। এক নম্বর গেটের ঠেকে গিয়েছিল টাপুর। আর সেখানে গিয়ে যথেষ্ট অবাক হয়েছিল ও। তিমির নামে সেই ফালতু ছেলেটার সঙ্গে চাপা গলায় কীসব কথা বলছে রুদ্র। টাপুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই রুদ্র বলল, "তা হলে তিমির মনে থাকে যেন, দু'তারিখ। কেমন?" তিমির হেসে চলে গেল। রুদ্র এবার টাপুরের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী রে এত দিন কোথায় ছিলিস? যাক ভালই হয়েছে তুই এসেছিস। আমার

তোর সঙ্গে দরকার ছিলই।" টাপুর অবাক হল। রুদ্র এগিয়ে এসে টাপুরের কাঁধে হাত রাখল, বলল, 'টাপুর, আমার একটা ছোট্ট প্ল্যান আছে। হয়তো একটু উইকেড, কিন্তু আমাদের স্কুলের ইন্টারেস্টে প্ল্যানটা এক্সিকিউট করা প্রয়োজন। তোর হেল্প আমার দরকার।"

"মানে? উইকেড মানে? ইজ ইট সামথিং বিগ?" টাপুর অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

রুদ্র মুচকি হেসে বলল, "নাথিং কুড বি বিগার।"

টাপুর দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে তাকিয়ে রইল রুদ্রর দিকে। কী বলছে রুদ্র? কীসের প্ল্যান? প্ল্যানটা উইকেড বলছে কেন? মানে কতটা উইকেড? কারও কি ক্ষতি হতে পারে? সাংঘাতিক কিছু নয় তো? টাপুর নিজে যথেষ্ট স্মার্ট আর ডেসপারেট। কিন্তু রুদ্রর মুখভঙ্গি আর গলার স্বর শুনে ও একটু চিন্তায় পড়ে গেল। রুদ্র হাসল, "পাগলি, ভয় পেয়ে গেলি? তেমন চিন্তার কিছু নেই। নঙ্গী হাইকে এবার একটু টাইট দেব। সেজন্যই তোর হেল্প দরকার আমার।" নঙ্গী হাইকে টাইট? টাপুর অবাক হল। আজ তিরিশে জানুয়ারি আর দু'দিন পর টমাস চ্যালেঞ্জ কাপের ফিরতি ম্যাচ। টাপুর বুঝল রুদ্র নিশ্চয়ই সেই ব্যাপারেই কিছু বলছে। কিন্তু টাপুর কী হেল্প করতে পারে? টাপুরের মাথায় কিছু ঢুকল না। ও প্রশ্ন করল, "কী ব্যাপারে হেল্প দরকার রুদ্রদা? আমি কী করতে পারি?"

রুদ্র হাসল, বলল, "শোন তা হলে— জানিসই তো দু'তারিখ আমাদের ফিরতি ম্যাচ। ওই ম্যাচটা ড্র করতে পারলেই এবারের 'টমাস চ্যালেঞ্জ কাপ' আমাদের স্কুলে আসবে। কিন্তু একটা কথা জানিস টাপুর, যে ড্র করতে চায়, আসলে সে হারতেই চায়। মানে, তার জেতার যে যোগ্যতা নেই সেটাই বোঝা যায়। শোন, আমি কিন্তু ড্র করতে চাই না। ম্যাচটা জিততে চাই। আর সেখানেই তোর হেল্প দরকার।" কী বলছে রুদ্র? কীভাবে হেল্প করবে টাপুর? ও তো আর মাঠে নেমে খেলতে পারবে না। রুদ্র সামান্য হেসে আবার বলল, "খুব অবাক হচ্ছিস, না? দাঁড়া সব বলছি। কফি খাবি?" টাপুর মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

রুদ্র রাস্তা পেরিয়ে গেল উলটো দিকের দোকানটায়। 'জর্জিয়া'-র

একটা কফি কাউন্টার আছে ওখানে। টাপুর বিশেষ চা কফি খায় না, তবু রুদ্রকে না করতে পারল না। দু'কাপ কফি দু'হাতে ধরে ধীরে ধীরে আবার টাপুরের সামনে এসে দাঁড়াল রুদ্র। কাপটা টাপুরের হাতে দিয়ে বলল, "ধর। সাবধানে, গরম আছে কিন্তু," টাপুর কাপটা হাতে নিয়ে চুমুক দিল একটা। সত্যিই খুব গরম।

রুদ্র ওর কফিতে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে উঠে বসল নিচু দেওয়ালের ওপর। ওদের ঠেকটাই হল এই ইংরিজি এল অক্ষরের মতো নিচু দেওয়ালটা ঘিরে। টাপুরও গিয়ে বসল রুদ্রর পাশে। একটু থেমে রুদ্র শুরু করল, "দেখ টাপুর, আমার এ-বছর স্কুলজীবন শেষ হচ্ছে। রবিন মেমোরিয়াল স্কুল আমার জীবনের একটা অংশ। স্কুল আমায় অনেক কিছু দিয়েছে, কিন্তু আমি কিচ্ছু স্কুলকে ফিরিয়ে দিতে পারিনি। 'টমাস চ্যালেঞ্জ কাপ' আমার শেষ সুযোগ। এ-বছর নঙ্গী হাই যদি জিতে যায় পরপর তিনবার জিতে কাপটা ওরা চিরকালের জন্য নিয়ে নেবে। এটা আমি হতে দিতে পারি না। প্রথম ম্যাচটা আমরা জিতেছি। বলতে পারিস আমি ট্রিক খাটিয়েছিলাম একটা, তার ফলেই ম্যাচটা আমরা জিতেছি। কিন্তু সামনের ম্যাচটাই আসল। দ্যাখ আমাদের স্কুলের টিম ততটা ভাল নয়। ছেলেগুলো মন দিয়ে প্র্যাকটিস করে না। তোদের পেছনে হিড়িক দিতে ব্যস্ত। আমি অনেক চেষ্টা করেও ওদের পালটাতে পারিনি। অর্থাৎ উপায় একটাই। নঙ্গী হাই-এর টিমটাকে এলোমেলো করে দেওয়া।"

টাপুর এতক্ষণে কথা বলল, " কিন্তু আমি কী করব রুদ্রদা? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

রুদ্র কফির কাপটা দলা পাকিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল। তারপর বলল, "আগে কথাটা শেষ করি, ঠিক বুঝবি। আমি হিসাব করে দেখেছি নঙ্গী হাই-এর ফুটবল টিমটা তিনটে ছেলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এক দিয়েগো, দুই ডুডু আর তিন কবীর। শোন, ডুডুর ব্যবস্থা আমি করে নিয়েছি। যাতে ও ম্যাচের দিন মাঠেই পৌঁছোতে না-পারে তার বন্দোবস্ত আমি করেছি। এখন তোকে বাকি দু'জনকে সামলাতে হবে।"

"বাকি দু'জন? আমি সামলাব? কীভাবে?" টাপুর নিজেই নিজের গলায় টেনশন টের পেল।

"ভয় পাচ্ছিস কেন? আগে আমার কথা শোন, তারপর তুই নিজেই বুঝতে পারবি যে কাজটা তত কঠিন নয়।" রুদ্রর গলায় আশ্বাস।

টাপুর চুপ করে থাকল খানিকক্ষণ, তারপর বলল, "ঠিক আছে, বলো।"

রুদ্র হাসল আবার। হাসলে কি সুন্দর লাগে রুদ্রকে। টাপুর মুগ্ধ হয়ে যায়। রুদ্র বলল, "দিয়েগো আর কবীরকে তুই সামলাবি। প্রথমে দিয়েগো। তোকে এমন কাউকে জোগাড় করতে হবে যে ম্যাচের ঠিক আগে পুরু, মানে ওদের কোচকে গিয়ে বলবে যে দিয়েগো এ-ম্যাচটা রবিন মেমোরিয়ালকে ছেড়ে দেবে। কেমন?" পুরু, নামটা শুনতেই শরীরটা কেঁপে উঠল টাপুরের। আসলে ও নামটা শোনার জন্য তৈরি ছিল না। একটু ধাতস্থ হয়ে ও আবার জিজ্ঞেস করল, "ওদের কোচ কথাটা বিশ্বাস করবে কেন?"

রুদ্র কাঁধ ঝাঁকাল, "করবে, বিশ্বাস করবে। গত ম্যাচের পর গোটা বাটানগরে এমন একটা প্রোপাগান্ডা করা হয়েছে যে পুরু বিশ্বাস করবেই। তবে হ্যাঁ, কীভাবে কাজটা করবি সেটা তোকে ঠিক করতে হবে। কিন্তু মনে রাখবি টাইমিংটা ইমপর্ট্যান্ট। খেলার ঠিক আগে কথাটা গিয়ে বলতে হবে। এতে দুটো কাজ হবে। প্রথমটা হল টিমটার একটা মরাল সেট ব্যাক হবে আর দ্বিতীয়টা হল, আমি ডেফিনিট পুরু ওকে বসিয়ে দেবে।"

"কিন্তু যদি না-বসায়?" টাপুর জিজ্ঞেস করল। রুদ্রর চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। ও বলল, "তা হলে বুঝব পুরু ফালতু লোক। ফুটবল ভালবাসে না। আর টাপুর, সেটুকু রিস্ক আমাকে নিতেই হবে। ডুডুকে যেভাবে আটকাব সেভাবে দিয়েগোকে আটকানো যাবে না। কারণ ওরা অনেকে মিলে একসঙ্গে মাঠে আসে আর ডুডু আসে একলা। তাই দিয়েগোকে মাঠ থেকে এভাবেই সরাতে হবে।"

চুপ করে বসে রইল টাপুর। কাকে পাঠাবে ম্যাচের ঠিক আগে পুরুর কাছে? মরে গেলেও ও নিজে যাবে না। কিন্তু এমন একজনকে পাঠাতে হবে

যার অ্যাপিয়ারেন্সটাই হবে খুব অনেস্ট। কাকে, পাঠাবে কাকে? হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মতো নামটা মাথায় এল টাপুরের— শিমুল। ওই পারে এই কাজটা করতে। শুধু ওকে মোটিভেট করতে হবে। মিথ্যে করে বলতে হবে যে দিয়েগো ম্যাচ ছেড়ে দিতে চায়। আমন আর ওর স্কুল হারবে শুনলে, টাপুর নিশ্চিত, শিমুল, ওরা যা চায় সেটা করবেই। কিন্তু পটিয়ে পাটিয়ে শিমুলকে রাজি করাতে হবে। তাই রুদ্রকে এখন কিচ্ছু বলবে না কাকে দিয়ে কাজটা করাবে ও।

রুদ্র জ্যাকেটের চেনটা একবার নামিয়ে আরেক বার ওপরে ওঠাল। ভুরুদুটো কুঁচকে আছে একেবারে। টাপুর বুঝল রুদ্র এবার আরেকজনের কথা বলবে ওকে। আরেকজন মানে কবীর। টাপুর বুঝল রুদ্রর সমস্যাটা। ওর কথাতেই কবীরকে পিটিয়েছিল রুদ্র আর এখন ওর কাছে নিশ্চয়ই টাপুরকে যেতে বলতে ওর খারাপ লাগছে। টাপুর আস্তে করে রুদ্রর হাত ধরল। বলল, "রুদ্রদা, আরেকজন?"

রুদ্র ঠোঁট চাটল একবার। গলাটা খাঁকরে বলল, "না, মানে ভাবছিলাম যে কবীরের কাছে তোকে পাঠানো ঠিক হবে কিনা। আসলে আগে যা সব ঘটে গেছে তারপর... কিন্তু যাওয়াটাও জরুরি। টাপুর তুই কি যেতে পারবি?"

টাপুর ছোট্ট করে হাসল, "তুমি বলো না একবার। ডোন্ট হেসিটেট।" স্ট্রিট বালবের হলুদ আলো আর কুয়াশা মিশে ইম্প্রেশনিস্ট ছবির মতো দৃশ্য তৈরি হয়েছে একটা। টাপুরের মামা চিত্রশিল্পী। ওর দৌলতেই ছবি সম্বন্ধে টাপুর কিছু জানে। রুদ্র সেই স্থিরচিত্রটাকে ভেঙে বলল, "শোন টাপুর। যা বলছি মন দিয়ে শোন। কবীরের সঙ্গে তোকে দেখা করতে হবে। অ্যারেঞ্জমেন্টটা আমিই করিয়ে দেব। এখন কবীরকে কী বলবি মন দিয়ে শোন।" রুদ্র পরপর বলে যাচ্ছিল টাপুরকে— ওকে কী কী বলতে হবে কবীরকে, আর দরকার পড়লে কী করতে হবে।

আজ রুদ্রর সেই কথাগুলোই পরপর বলতে হবে টাপুরকে। কিন্তু কী হল। কবীর আসছে না কেন এখনও। তবে কি কোনও গন্ডগোল হল?

বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে এখন। চাঁদটাও আরও একটু ঘুরে চলে গেছে পাতার গভীরে। টাপুরের অস্বস্তি হতে লাগল, কবীর যদি না-আসে?

"যো হ্যায় আলবেলা মদ নয়নও ওয়ালা...' পলিফনিক রিংটোনের শব্দে চিন্তাটা ছিঁড়ে গেল টাপুরের। মোবাইলের স্ক্রিনে দেখল 'রুদ্রদা' শব্দটা। তাড়াতাড়ি জবাব দিল টাপুর, "হ্যালো রুদ্রদা, কী ব্যাপার বলো তো?"

"শোন, কবীরকে একজনের মাধ্যমে খবর পাঠিয়েছি যে তুই ওর সঙ্গে দেখা করবি 'নিউল্যান্ড ক্যাফে'-তে। সাড়ে ছ'টা নাগাদ।"

"কিন্তু তুমি তো নিউল্যান্ড স্কুলে বলেছিলে।"

"আরে যেই ছেলেটাকে কবীরকে খবর দিতে বলেছিলাম, মালটা এমন ছাগল, যে কবীরকে ভুল করে নিউল্যান্ড ক্যাফেতে অপেক্ষা করতে বলেছে। আর আমায় আগেও বলেনি। একটু আগে বলেছে। দেখেছিস তো কীসব জিনিসপত্র নিয়ে আমায় চলতে হয়।'

"সে তো হল। আমি এখন কী করব?" টাপুর জিজ্ঞেস করল।

"শোন, এখন সাড়ে ছ'টাই বাজে। তোর স্কুলের সামনে থেকে মেন রোডে গিয়ে অটো ধরে দোকানে পৌঁছোতে আট-দশ মিনিট লাগবে। তুই আর দেরি করিস না। কবীর নিশ্চয়ই এটুকু সময় এক্সট্রা ওয়েট করবে। টাপুর, প্লিজ দেখিস কাজটা যেন হয়।"

নিউল্যান্ডে ক্যাফের কাচের সুইংডোর ঠেলে যখন টাপুর ঢুকল তখন প্রায় ছ'টা চল্লিশ বাজে। ক্যাফের ভিতরে হালকা মিউজিক বাজছে। দু'-চারজন বসেও আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আর ক্যাফের এক কোনায় গোল কাচের টেবিল থুতনিতে হাত রেখে বসে আছে কবীর।

দুর থেকে কবীরের মুখ দেখে টাপুর বুঝল কবীর ওকে ঢুকতে দেখেছে। কারণ কবীর সিট ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। টাপুর চট করে একবার দেওয়ালের আয়নায় নিজেকে দেখে নিল। সাদা জিনস্, লাল ফুল সোয়েটার। নিজেকে দেখে আশ্বস্ত হল টাপুর। এরকম মেয়ে কোনও ছেলেকে দিয়ে যা খুশি তাই করিয়ে নিতে পারে।

বুক ভরে শ্বাস নিল টাপুর। এই ছোট্ট অঞ্চলটার মধ্যে খেলা শুরু হবার আগেই আরেক খেল শুরু হয়ে গেছে। আর এই খেলাটাই টাপুরকে ঠিকভাবে খেলতে হবে আজ।

টাপুর যখন কবীরের সামনে বসল, কবীর তখনও দাঁড়িয়ে। টাপুর সামান্য হাসল, বলল, "বসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

কবীর কোনও উত্তর না-দিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল টাপুরের দিকে। টাপুর আবার বলল, "বসো।"

এবার বসল কবীর। তীক্ষ্ণ চোখে টাপুরের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী ব্যাপার? আমায় ডেকে এনেছ কেন তুমি? কী দরকার?"

টাপুর এবারও হাসল। চট করে উত্তর না-দিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, "কিছু খেলে হয় না? ওয়েটার।" টাপুরের ডাকে একজন ওয়েটার এগিয়ে এল। দুটো চিকেন পিৎজার অর্ডার দিল টাপুর। তারপর আর দেরি না-করে সরাসরি কবীরের দিকে তাকাল, বলল, "কবীর, তুমি বলেছিলে আমার জন্য সব কিছু করতে পারো তুমি। কথাটা কি সত্যিই?" টাপুর দেখল কবীরের মুখের রাগের ভাবটা ভাঙতে ভাঙতে বিস্ময় থেকে আশায় এসে থামল। মনে মনে হাসল টাপুর। ওষুধ ধরেছে।

কবীর ঢোক গিলল কয়েকবার তারপর বলল, 'টাপুর, তোমার জন্য আমায় অনেক কষ্ট, মার, অপমান সহ্য করতে হয়েছে। তবু তোমায় আমি ভালবাসি। হ্যাঁ, তোমার জন্য সব কিছু করতে পারি আমি।

"চিন্তা করে দেখো, সব কিছু?"

কবীর চোয়াল শক্ত করল, বলল, "হ্যাঁ সব কিছু।"

টাপুর ভাবল ছেলেটা নিজেই ফাঁদে ঢুকে পড়েছে। ও টেবিলে রাখা পেপার টাওয়েল নিয়ে সেটাকে ভাঁজ করতে করতে বলল, "তা হলে দু'তারিখের ম্যাচটা আমাদের ছেড়ে দাও তুমি। যদি আমরা জিতি আমি তোমার।"

"কী?" কবীরের মুখে হতভম্ব ভাব। যেন কথাটার মানেটাই ধরতে পারেনি।

টাপুর বলল, "ম্যাচটা ছেড়ে দিলে আমি বুঝব যে তুমিই সত্যিই আমায় ভালবাসো। নাথিং ইজ ইজি কবীর। তুমি জানো যে বাটানগর ছোট্ট জায়গা। কনসারভেশন এখানে বেশি। একটা হিন্দু মেয়ে যখন মুসলিম ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে, ব্যাপারটা খুব সুখের হবে না। আমি কোনওরকম স্টেপ নেবার আগে দেখতে চাই যে তুমি সত্যিই আমায় ভালবাসো কি না। কারণ যার তার জন্য তো সব ছাড়া যায় না। এটাকে তুমি পরীক্ষা ভাবলে পরীক্ষা। কিন্তু তুমি যদি ম্যাচ ছাড়ো জেনো আমি তোমার হব।"

কবীর কোনও কথা না-বলে মাথা নিচু করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, "আমায় তুমি ইচ্ছে করে গোল খেতে বলছ? আমায় ইন্টিগ্রিটি ভাঙতে বলছ?"

টাপুর এবার গম্ভীর হয়ে গেল, বলল, "শোনো কবীর, আমি এখানে নেগোসিয়েশন করতে আসিনি। মাই অফার ইজ সিম্পল। টেক ইট অর লিভ ইট।" কথাটা বলে হাত দিয়ে কবীরের হাতে একটু চাপ দিল টাপুর। এসব ভাইটল ছোঁয়াগুলো খুব দরকারি। কবীরের মুখ দেখে ও বুঝল কবীর দ্বিধায় পড়েছে। টাপুর আরেকটু চাপ বাড়াল, বলল, "কবীর, এটুকু, আমি জানি, তুমি আমার জন্য করবে।" কবীর শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল টাপুরের দিকে। ওর শরীর ধ্বংসস্তূপের মতো পড়ে রয়েছে চেয়ারে। টাপুর জানে কবীর এই লোভ সামলাতে পারবে না। ম্যাচ ছাড়বেই। যাক রুদ্রর কথা রাখতে পেরেছে ও। টাপুর টেবিলে দিয়ে যাওয়া পিৎজায় এক কামড়ও না-দিয়ে বিলের টাকাটা রেখে বেরিয়ে এল। এখানে থাকার আর মানে হয় না।

ফেরার সময় টমাস বাটা অ্যাভিনিউ দিয়ে হেঁটেই ফিরছিল টাপুর। মাঘ মাস। ঝকঝক করছে আকাশ। অনেক উঁচু দিয়ে দ্রুত স্যাটেলাইট চলে গেল একটা। ঠিক যেন উল্কা। যে-চিন্তাটা ও মনে আনতে চাইছিল না এতদিন, এবার সেটাই এই নির্জন রাস্তায় হুড়মুড় করে এসে পড়ল। পুরু। নঙ্গী হাই-এর হারা মানে পুরুর চাকরি শেষ। পুরুর যা আর্থিক অবস্থা এটা ওর কফিনে শেষ পেরেকের মতো হবে। আর টাপুরের হাত

দিয়েই কিনা সেটা হল। টাপুরের চোখের সামনে ভেসে উঠল বহুদিন আগের এক দৃশ্য। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকা গম্ভীর এক যুবক। টাপুরের গলার কাছটা ব্যথা করছে। লোককে শায়েস্তা করে সবসময় আনন্দ পায় টাপুর। কিন্তু এবার একদম ভাল লাগছে না। এত কষ্ট হচ্ছে বুকে। ভীষণ অস্থির লাগছে। ও না-চাইলেও চোখের কোণগুলো ভিজে উঠছে ওর। ওঃ পুরু, তুমি কেন আমায় ফিরিয়ে দিলে? কেন একটু ভালবাসলে না আমায়? এই শাস্তি তো তোমার প্রাপ্যই ছিল। আমায় ভাল না-বাসার শাস্তি, আমায় ফিরিয়ে দেবার শাস্তি। টাপুর আবছা কুয়াশার জাল কেটে হাঁটতে লাগল। আর দু'-চারটে মুক্তো গড়িয়ে পড়তে লাগল পথে। টাপুর চোখ মুছল না। যাক, ওর কষ্টগুলো, ওর কবীরকে বিপথে টানার পাপগুলো, জল হয়ে বেরিয়ে যাক।

২০

কেউ কি পায়েস বসিয়েছে? কাছে কিংবা দূরে? নতুন গুড় দিয়ে তৈরি পায়েস? সকালে ঘুম থেকে উঠেই গন্ধটা পেয়েছিল ডুডু। প্রথমে ভেবেছিল শীতকাল, মা হয়তো পায়েস করছে। কাল সরস্বতী পুজো, বাড়িতে অনেক লোকজন এসেছে, তাই হয়তো মা পুলিপিঠে আর চালের পায়েস বসিয়েছে। কিন্তু দেখল, তা নয়। আশেপাশে যারা থাকে তাদের বাড়িতেও বোধহয় নয়, কারণ সেসব বাড়ির সঙ্গে ডুডুদের সম্পর্ক ভাল। ভাল কিছু রান্না হলেই দেওয়া নেওয়া হয়। তবে? এরকম পায়েস পায়েস গন্ধ পাচ্ছে কেন ডুডু? তবে কি এটাও সেই 'ঠিক বিরিয়ানি নয়' টাইপের গন্ধ? মানে আবার কি কোনও গন্ডগোল হবে?

সকালের সময় প্রথম গন্ধটা পেয়েছিল ডুডু, তারপর আবার পেল একটু আগে। কিটব্যাগে জার্সি, বুট, শিনগার্ড ঢোকাচ্ছিল ও। আজ সেই মরণ বাঁচন ম্যাচ। খেলা শুরু হবে সাড়ে তিনটের সময়। এখন দুপুর

পৌনে দুটো। ডুডু সবসময় সব জায়গায় আগে আগে পৌঁছে যায়। না হলে কেমন যেন টেনশন হয় ওর। ওর ইচ্ছে আছে সওয়া দুটোর মধ্যে মাঠে চলে যাবে। এমনিতেই আজকের ম্যাচটা ঘিরে একটা চাপা টেনশন তৈরি হয়েছে। সেইজন্য চাইছিল একটু আগে মাঠে গিয়ে মাঠের সঙ্গে অ্যাকাস্টমড হতে। সেইমতো দুপুরে হালকা খাওয়াদাওয়া করে কিট গোছাচ্ছিল ডুডু কিন্তু ঝামেলা বাধাল গন্ধটা। নতুন গুড় দিয়ে তৈরি পায়েসের গন্ধ আসছে কোত্থেকে? এ কি বিপদের গন্ধ না অন্য কিছুর?

মাঝে মাঝে ডুডু ভাবে সত্যিই গত জন্মে কুকুরটুকুর ছিল না তো ও? মাইরি, উৎকট গন্ধগুলো আর ঢোকার জায়গা পায় না? ওর নাকেই এসে ঢুকতে হবে? এমনিতেই আজ বৃহস্পতিবার। বিকেলবেলায় অর্থাৎ বারবেলার পর খেলা, তার ওপর এই গন্ধ, কী অঘটন ঘটবে কে জানে। গলা শুকিয়ে গেল ডুডুর। টেবিল থেকে জলের বোতলটা তুলল ও।

ঠিক দুটোয় সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল ডুডু। বেরোবার আগে ঠাকুরদাকে প্রণাম করে নিয়েছে। ঠাকুরদা মাথায় হাত রেখে কীসব মন্ত্রটন্ত্র পড়ে দিয়েছেন। সেটুকুই যা আজ ভরসা। রাস্তার মোড়ে ডুডু দেখল মেঘাদি আসছে। আজ মেঘাদির স্কুল ছুটি, ডুডু জানে। কিন্তু এই দুপুরে কোত্থেকে আসছে মেঘাদি? ডুডু সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। মেঘাদি ডুডুর কাছে এসে দাঁড়াল। "কী রে ভরদুপুরে কোথায় চললি? তোর ম্যাচ সাড়ে তিনটের সময় না?"

ডুডু বোকার মতো হাসল, বলল, "না মানে ওই আর কী। তুমি এখন কোত্থেকে আসছ?"

"মনে নেই কাল আমার স্কুলে সরস্বতী পুজো। তার আয়োজনেই বেরিয়েছিলাম। অবশ্য মনে থাকবেই বা কেমন করে? আজকাল তো আর না-ডেকে পাঠালে আসিস না। আর সত্যিই তো আসবিই বা কেন। সে তো দিল্লি গেছে, এখন কদিন ক্লাসে আসছে না।" ঠেশ দিয়ে বলল মেঘাদি। ডুডু চুপ করে গেল। ও জানে সায়েকা দিল্লি গেছে। ওকে জ্যাকসন বলেছে। ও জ্যাকসনকে জিজ্ঞেস করেছিল কীভাবে খবর পেয়েছে ও, কিন্তু জ্যাকসন সেটা আর বলেনি। মেঘাদির কথার খোঁচায়

অস্বস্তি হল ডুডুর। ভাবল সায়েকার কথাটা না-বললেই কি চলছিল না মেঘাদির? সত্যিই সায়েকার জন্য খুব মনখারাপ হয় ডুডুর। এই যে ও এখানে নেই এতে যেন ম্লান হয়ে গেছে বাটানগর। কেমন যেন রং-চটা বাড়িঘর, ময়লা আকাশ, কঙ্কালের মতো গাছ, পুরনো হলুদ শাড়ির মতো রোদ, সবই কেমন যেন ফ্যাকাশে। ডুডু দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা। আর কথা না-বাড়িয়ে বলল, "আমি এলাম মেঘাদি।"

মেঘাদি হাসল, হাত দিয়ে ওর চুলটা ঘেঁটে দিয়ে বলল, "পাগল ছেলে, বেস্ট অব্ লাক। আজ জিততে হবে কিন্তু।" ডুডু ম্লানভাবে হাসল একটু, তারপর সাইকেলে উঠল।

রেললাইনের পাশ দিয়ে গিয়ে বাটা ব্রিজকে ডানদিকে রেখে বাটা অ্যাভিনিউতে উঠবে ও। রেললাইনের পাশের রাস্তাটা বাটানগরের অন্যান্য রাস্তার মতোই নির্জন। তার ওপর এখন দুপুরবেলা। রাস্তাঘাট আরও ফাঁকা। অবশ্য রাস্তা ফাঁকা হওয়ার অন্য আরেকটা কারণও আছে। আর সেটা হল আজকের ম্যাচ। কমসে কম হাজার দশেক লোক হবে আজ। বাটানগর ছাড়াও বজবজ, আক্রা, সন্তোষপুর অঞ্চল থেকেও প্রচুর লোক আসে এই খেলাটা দেখতে। ডুডু সাইকেল চালাতে লাগল।

গতকাল থেকে শীতটা বেশ কমে গেছে হঠাৎ। আজ আবার মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে একটা। কে জানে কেন রোদটাকে আর অতটা ফালতু মনে হচ্ছে না এখন। আকাশটাও মনে হচ্ছে নতুন রং করানো। কেসটা কী? একটু আগেও যা মনে হচ্ছিল তা তো আর মনে হচ্ছে না। এত দ্রুত কারও মন পালটায় নাকি? তবে কি গন্ধটা কোনও ভাল কিছুর ইঙ্গিত? কী ভাল হতে পারে? ম্যাচ জিতবে? সায়েকা ওর সঙ্গে কথা বলবে আবার? কী ভাল অপেক্ষা করে আছে ওর জন্য? ডুডু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। সামনে, কিছুটা দূরে, রাস্তাটা বাঁদিকে বাঁক নিয়েছে। ওই জায়গাটার দু'দিকে কিছুটা বুনো ঝোপঝাড় আছে। ডুডু যদি অন্যমনস্ক না হত, যদি একটু সাবধান হত, তবে ও দেখতে পেত ওই ঝোপের পাশে তিনটে রুক্ষ চেহারার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।

সায়েকা কি সত্যি ওর সঙ্গে আগের মতো কথা বলবে আবার?

আবার কি শুধু ওর সঙ্গে সময় কাটাতে চাইবে? এইসব ভাবতে ভাবতে বাঁকের কাছে চলে এল ডুডু। আর হঠাৎ কী যেন হল। চোখের সামনে পৃথিবীটা দুলে উঠল ওর। সাইকেল থেকে ও ছিটকে পড়ল রাস্তার পাশে ঘাসে। থতমত খেয়ে গেল ডুডু। কী হল? পড়ে গেল কী করে? তবে ভাগ্য ভাল ঘাসে পড়েছে বলে বিশেষ লাগেনি ডুডুর। একটু ধাতস্থ হওয়ার আগেই ও দেখল তিনটে মুখ ঝুঁকে আছে ওর ওপর। মুখগুলো দেখলেই বোঝা যায় সেগুলো মোটেই বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। বরং কিছুটা হিংস্রই। এর মধ্যে দু'জনকে চিনতে পারল না ডুডু। কিন্তু মাঝের ছেলেটাকে দেখে শিরদাঁড়া দিয়ে হিম স্রোত বয়ে গেল ওর। রোগা ফ্যাকাশে ছেলেটাকে খুব ভাল করে চেনে ও। ছেলেটা তিমির।

"হ্যালো ডুডু মাস্টার, ফুটবল খেলতে যাচ্ছ?" তিমির ব্যঙ্গ করে বলল। ডুডু কোনও জবাব না-দিয়ে চুপ করে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। তিমির হাসল। তারপর বাবু হয়ে বসে পড়ল ডুডুর পাশে। শান্ত গলায় বলল, 'আজ তোকে খেলাধুলো করতে হবে না, বুঝলি। আমার সঙ্গে বসে থাক।"

ডুডু এবার বলল, "কী যা-তা বলছিস? ছাড় আমায়। মাঠে যেতে হবে।"

তিমির এবার গলাটা শক্ত করল, "সোজা বাংলা বুঝিস না? আজ তোর খেলা বন্ধ। তোকে আমার সঙ্গে সন্ধে ছ'টা অবধি থাকতে হবে। এখন চুপ করে বস।"

"মানে? মগের মুল্লুক নাকি?" ডুডু তেড়েমেরে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। অন্য দুটো ছেলে ধাক্কা মেরে মাটিতে বসিয়ে দিল ওকে। ডুডুর সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। কী হচ্ছে কী?

ও বলল, "তিমির, ইয়ারকি ভাল লাগছে না কিন্তু। ছাড় আমায়।"

তিমির শক্ত করে ডুডুর থুতনি ধরল, "হারামি, ইয়ারকি মারছি? তুই কে রে? যদি এখান থেকে এক পা-ও নড়িস, তোর গোড়ালির রগ দুটো কেটে দেব. বুঝেছিস?" ডুডু দেখল তিমিরের হাতে-ধরা ক্ষুরটা রোদে ঝিকোচ্ছে।

"এমন কেন করছিস তিমির? জানিস না খেলাটা কত ইমপর্ট্যান্ট। আমায় ছেড়ে দে।" ডুডু কাতর গলায় বলল। তিমির আবার হাসল, "তোর খেলায় পেচ্ছাপ করি রে শুয়োরের বাচ্চা। তোকে ম্যাচে খেলতে দেব না। বুঝলি? এখন চুপ কর।" একটা ছেলে পকেট থেকে একটা সিগারেট দিল তিমিরকে। সিগারেটের সামনেটা লজেন্সের র‍্যাপারের মতো মোড়ানো। ডুডু বুঝল ওটাতে গাঁজা আছে। ও আবার বলল, "তিমির, আমায় ছাড়। নয়তো ভাল হবে না বলছি।"

ঠাস করে চড় পড়ল ডুডুর গালে। তিমির চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "ভাল হবে না মানে? আমায় থ্রেট করছিস তুই? শোন, আজ ম্যাচটা তোকে খেলতে দেব না। আর একটা কথা বললে কিন্তু হাঁ মুখ চিরে কুমিরের মতো করে দেব।" তিমিরের মুখ দেখে ডুডু বুঝল তিমির অমন করতেও পারে। তিমির আবার বলল, "শালা, সেদিন তোদের মার আমি ভুলিনি। আজ দেখ তোদের খেলার তেইশটা কীভাবে মারি।"

একটু দূরে সাইকেলটা কাত হয়ে পড়ে আছে। এমন কপাল, রাস্তা দিয়ে একজনও যাচ্ছে না। সময়ের সঙ্গে সূর্য ধীরে ধীরে পশ্চিমে সরতে শুরু করেছে। এখানটায় বসে বাটা কোয়ার্টারের সামনে মাঠগুলোয় কালকের পুজোর ছোট ছোট প্যান্ডেল দেখা যাচ্ছে। ডুডু আড়চোখে তিমিরের হাতঘড়িটা দেখল। তিনটে বাজে। আর মাত্র আধঘণ্টা বাকি আছে খেলা শুরুর। মাঠে সবাই নিশ্চয়ই ওর কথা ভাবছে। ওরা কি কেউ খুঁজতে আসবে না ওকে? ডুডু মাথা নিচু করে বসে রইল। এমনিতেই ও শান্ত। ওর পক্ষে তিনজনের সঙ্গে মারামারি করা সম্ভব নয়। এখন ও বুঝল কেন ওর নামটা 'বন্ড, জেমস বন্ড'-এর মতো করে বলা যায় না। ও সামান্য এক মফস্‌সলের ছেলে। ভিতু, ঈশ্বরবিশ্বাসী, কারও খারাপ চায় না। তবে ওর এরকম হল কেন? এটাই স্কুলের হয়ে ওর শেষ খেলা। সেটা কি ও স্মরণীয় করে রাখতে পারবে না। এভাবে একটা নোংরা ছেলে ওকে আটকে দেবে? ডুডুর চোখ ফেটে জল আসছে। ভগবান।

কে জানে ভগবান আছেন কিনা। কে জানে মানুষের বিপদে কেউ তাকে আড়াল থেকে রক্ষা করেন কিনা। কিন্তু তবু মানুষকে তাঁকে

ডাকতে হয়। তাঁর ওপর ভরসা করতে হয়। ঠাকুরদা বলেন মানুষের এই বিশ্বাস আর ভরসার মিলিত রূপ হল ভগবান। ডুডু চুপ করে বসে রইল। ওর বিশ্বাস আর ভরসাকে মেলাতে চাইল প্রাণপণে। তিমিররা নিজেদের মধ্যে কীসব কথাবার্তা বলছে। ডুডু সেদিকে মন দিল না। তিনটে পাঁচ। ওর ঘাম হতে শুরু করল এবার। কেউ কি সত্যিই আসবে না?

ঠিক সেই মুহূর্তে রাস্তার দূরের বাঁকে চারটে সাইকেল ধুলো উড়িয়ে বাঁক নিল একসঙ্গে। কিছু শুকনো পাতা উড়ে এল চাকায় চাকায়। একঝাঁক চড়াই উড়ে পালাল। আশেপাশের ঝোপ থেকে চমকে উঠল দুটো ছাগলছানা। চারটে সাইকেল দ্রুত এগোতে লাগল কমলালেবু রঙের রোদ চিরে। আবছা শব্দ পেয়ে ডুডু বাঁদিকে তাকাল। তিমিররা নিজেদের কথাবার্তা আর সামান্য নেশা হয়েছে বলেই বোধহয় বুঝতে পারেনি। ডুডু ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে দেখল অনেকটা দূরে চারটে সাইকেল ভাঙা পিচের রাস্তার ধুলো উড়িয়ে আসছে। তার মধ্যে একটা সাইকেল লাল, গিয়ার চেঞ্জিং। বাটানগরে একমাত্র একজনেরই এই সাইকেল আছে। আর সেই সাইকেলের পাশের সাইকেল থেকে গোলাপি ওড়না উড়ছে একটা। এই ওড়নাটা কার চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারে ডুডু। ওর সারাগায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, তবে কি বিশ্বাস আর ভরসা মিলল শেষ পর্যন্ত? ও দেখল কয়েকজনের সঙ্গে ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে জ্যাকসন আর হিরে মুক্তোর সেই মেয়েটা। সায়েকা।

সাইকেলগুলো যখন প্রায় কাছে চলে এসেছে হঠাৎ ঝোপের মধ্যে থেকে দাঁড়িয়ে উঠল ডুডু। তিমিররাও এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে যে কিছু একটা হচ্ছে। তিমির হাতের ক্ষুরটা তুলে লাফিয়ে উঠল, "অ্যাই শুয়োরের বাচ্চা..." কিন্তু আর কিছু বলার সুযোগ পেল না, জ্যাকসন সাইকেল নিয়ে সোজা গিয়ে ধাক্কা মারল ওর তলপেটে। "মা গো" বলে পেট চেপে বসে পড়ল তিমির। বাকি দুটো ছেলে বেগতিক দেখে ততক্ষণে দৌড় মেরেছে। ওদের পেছনে কেউ দৌড়োল না। মাটিতে পড়ে থাকা তিমিরকে কলার ধরে তুলল জ্যাকসন, মিহি গলায় বলল,

"'কী চাঁদ! ডুডুকে নিয়ে কী করছিলি?" ডুডু যথাসম্ভব সংক্ষেপে পুরো ব্যাপারটা বলল। জ্যাকসন হাসল, "তিমির, রুদ্র তোকে এটা করতে বলেছে, না?" তিমির আমতা আমতা করছে দেখে এবার এগিয়ে এল একজন লম্বা ভীষণ সুপুরুষ ছেলে। সে রোগা তিমিরকে ঘাড় ধরে মাটি থেকে অনায়াসে ছ'ইঞ্চি তুলে ফেলল, তারপর বলল, "লিভ হিম টু মি। হি উইল টক।"

এতক্ষণে কথা বলল সায়েকা, "দাদা, ওকে ছাড়, মাঠে যাবি চল। দেরি হয়ে যাবে।" দাদা? সায়েকার? ডুডু সায়েকাকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার দাদা? মানে?"

"আবার মানে? আমি কি ডিকশনারি? দাদা, মানে জ্যাঠতুতো দাদা। এন ডি এ তে আছে। আমরা দিদুকে নিয়ে এসেছি দিল্লি থেকে। ছুটি বলে আমাদের সঙ্গে দাদাও এসেছে।" দাদা এবার তিমিরকে দু'বার ঝাঁকিয়ে ছুড়ে ফেলল দূরে। ডুডুর মনে হল তিমির যেন শোলার তৈরি। এই তিনজন ছাড়া স্কুলেরই আরেকজন স্টুডেন্ট ছিল। ও এবার তিমিরকে তাড়া করল। তিমির মাটি থেকে উঠে চোখের নিমেষে রেললাইন টপকে পালিয়ে গেল। "এই ক'টা বাজে? চল তাড়াতাড়ি।" ডুডু আর পাত্তা না-দিয়ে সাইকেলটা মাটি থেকে তুলে বলল।

"ডোন্ট হেস্ট। খেলা শুরু হবে চারটেতে। এম এল এ সাহেব চারটেয় আসবেন। ফলে চল্লিশ মিনিট সময় আছে এখনও।" জ্যাকসন নিশ্চিন্ত গলায় বলল। ওরা এবার সাইকেলে উঠে পড়ল সবাই। এখান থেকে বাটা স্টেডিয়াম আট মিনিট লাগবে বড়জোর। ডুডু জিজ্ঞেস করল, "আমি এখানে আছি জানলি কী করে?"

"তুই সায়েকাকে জিজ্ঞেস কর। আমি দাদার সঙ্গে কথা বলি।" বলে জ্যাকসন চোখ টিপল ডুডুকে। ডুডু শুনল এবার দাদার দিকে মুখ ঘুরিয়ে জ্যাকসন জিজ্ঞেস করছে, "আচ্ছা ডি এন এ তো শুনেছি। এন ডি এ কী? জিন গবেষণার কোনও নতুন জায়গা?" সায়েকা আর ডুডুর সাইকেল সামনে এগিয়ে গেল।

ধীরে সাইকেল চালাচ্ছিল ওরা। বিকেলের রোদ এত সুন্দর

কোনওদিন খেয়াল করেনি ডুডু। বড় রাস্তার দু'পাশের লাল সাদা কোয়ার্টারগুলোয় রং করা হয়েছে। মাঠের আগাছাও সব পরিষ্কার করা হয়েছে। শীত শেষের বার্তা নিয়ে একটু একটু করে সবুজ পাতা আসছে রাস্তার দু'পাশের গুলমোহর গাছে। সায়েকা পাশ ঘেঁষে সাইকেল চালাচ্ছে। ডুডু মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছে ওর গায়ের। নরম হাওয়ায় চুলগুলো বারবার এসে পড়ছে কপালে। রোদ লেগেই বোধহয় ফরসা গাল দুটো হালকা গোলাপি রং ধরেছে। ডুডু ভাবল এ-মেয়ে কোথা থেকে এল? একে না-পেলে বাঁচবে কী করে ডুডু? বুকের মধ্যে কষ্ট হতে লাগল ওর। আধঘণ্টা আগেও জানত না সায়েকা ওর এত কাছাকাছি আসবে। মাঠের মধ্যে বসে তিমির আর ওর সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে থেকে শুধু ভগবানকে ডাকছিল ডুডু। তবে কি সত্যিই ভগবান আছেন? তিনি কি সত্যিই শেষ মুহূর্তে হাত ধরেন ডুবন্ত মানুষের? ডুডুর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কেউ কি সত্যিই অলক্ষ্যে থেকে লক্ষ করছেন ডুডুকে।

"গালটা লাল কেন, ওরা মেরেছিল বুঝি?" সায়েকা জিজ্ঞেস করল।

ডুডু সামান্য লজ্জিত হয়ে বলল, "ওই একটু, তেমন লাগেনি।"

"হুঁ বাহাদুর কত! একটুও লাগেনি! না-লাগলে অমন পাঁচ আঙুলের দাগ বসে যায় গালে?"

ডুডু হাসল, "তোমরা আমার খবর পেলে কী করে?"

"সে এক ইতিহাস। আমার দাদাকে তোমার কথা বলেছিলাম।"

"আমার কথা? কেন?" ডুডু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

"আঃ শুধু প্রশ্ন আর প্রশ্ন। ন্যাকা না? জানো না কেন? এখন চুপ করো। তো, দাদা আবার ফুটবল-পাগল। বলল তোমায় আর ম্যাচ একসঙ্গে দেখবে। মাঠে গিয়ে দেখলাম সবাই এসেছে শুধু তুমি নেই। প্রথমে খুব রাগ হল আমার। তারপর জিজ্ঞেস করাতে জ্যাকসন বলল, তুমি সবার আগে মাঠে আসো। আজ যখন আসোনি নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। পুরু স্যারও অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন। আমরা দাদার মোবাইল থেকে প্রথমে তোমার বাড়িতে, পরে মেঘাদির বাড়িতে ফোন করি। শুনলাম তুমি অনেক আগে বেরিয়ে গেছ। তখন জ্যাকসনই বলল যে

খুঁজতে যাবে। তুমি যে-পথে মাঠে আসো সেটা ওর চেনা। আমি, দাদা, জ্যাকসন আর তোমাদের স্কুলের অন্য একজন ছেলেও এল আমাদের সঙ্গে। আর এদিকে তো তোমাকে ঝোপে বসিয়ে রেখেছে। যদি না তোমার সাইকেলটা রাস্তার উপর পড়ে থাকত, আমরা বুঝতেই পারতাম না তুমি কোথায়। অবশ্য তুমিও ঠিক সময়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলে ঝোপের মধ্যে থেকে। ওঃ যা একটা অ্যাডভেঞ্চার গেল না! আর তোমারও বলিহারি। অত ফাঁকা রাস্তা দিয়ে চলাফেরার মানে কী?"

ডুডু বলল, "শর্টকাট তো, তাই।"

"শর্টকাট? সত্যিই, এসব করতে গিয়েই তো বিপদ ডেকে আনো। আমার চিন্তা হয় না বুঝি?"

স্টেডিয়াম এসে গেছে। ডুডু ভাবল স্টেডিয়ামটা আর দুশো মাইল দূরে হলে কী ভালই না হত! ও দেখল চারিদিকে রঙিন ফ্ল্যাগ উড়ছে, খাবারদাবার নিয়ে লোকেরা বসে পড়েছে। দর্শকও ঢুকছে পিলপিল করে। চারিদিকে হইহট্টগোল, কেমন একটা মেলা মেলা পরিবেশ। তবু, এসবের মাঝেও নিজেকে খুব হালকা আর নির্জন মনে হল ডুডুর। ওর জন্য চিন্তা হয় সায়েকার? ডুডুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ওর কপিরাইটেড প্রশ্ন, "মানে?" গেটের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ল সায়েকা। এবার আর বিরক্তি নেই, শুধু ঠোঁট টিপে মৃদু হাসল। কিছু বলতও হয়তো কিন্তু পারল না। পেছন থেকে জ্যাকসন আর সামনে থেকে পুরু স্যার সমেত অন্য ছেলেরা এগিয়ে এল হন্তদন্ত হয়ে। ডুডুকে হাত ধরে টানতে টানতে ওরা নঙ্গী হাই-এর টেন্টের দিকে নিয়ে গেল। শেষ মুহূর্তে একবার পেছনে ফিরল ডুডু। নরম হাওয়ায় গোলাপি ওড়নাটা এখনও উড়ছে আর তার অধিশ্বরী, এত মানুষের ভিড়েও, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। সেই থুতনিতে ঘূর্ণি, হাসিতে মুক্তোর বিজ্ঞাপন। ডুডু অলক্ষ্যের মানুষটাকে ধন্যবাদ দিল আর বুঝল ঠিক এই মুহূর্ত থেকে ওদের ছোট্ট জনপদে শুরু হল বসন্ত।

ডুডু টেন্টে গিয়ে কিট ব্যাগটা নামাল। ওঃ যা গেল আজকে! দিয়েগো জুতোর ফিতে বাঁধছিল। ডুডুকে দেখে এগিয়ে এল, "কী রে কোথায়

ছিলি? জানিস না টিম নামবে? ভাগ্যিস এম এল এ লেট করলেন। না হলে কী হত বল তো?"

জ্যাকসন পাশ থেকে টিপ্পনী কাটল, "কী হত আবার? হাতে হ্যারিকেন পেছনে ইংরিজি বাজনা। শালা, ডুডু কিডন্যাপ হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস নায়িকা উদ্ধার করল। ওঃ তারপর কী সিন! চুমু, জড়াজড়ি, কাকা।"

"মারব শালা লাথি। ওসব কোথায় হল রে?" ডুডু খেঁকিয়ে উঠল।

জ্যাকসন বলল, "ও হয়নি বলেই রেগে যাচ্ছিস?" ডুডু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তক্ষুনি ঢুকল পুরু, "কাম অন, হারি আপ। আর মিনিট পনেরো বাকি আছে মোটে। ও! আর একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আছে। আজ এই ম্যাচে ক্যাপটেন হল দেবপ্রস্থ।"

"অ্যাঁ? ক্যাপ্টেন? এ যে মাসির গোঁফ গজিয়ে মেসো হয়ে ওঠা। স্যার, আমি, আমি ক্যাপ্টেন হব।" ফস করে বলে উঠল জ্যাকসন। পুরু কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু এবার বাধা দিলেন হেডস্যার। বললেন, "মনোময়, তুই ক্যাপ্টেন হবি? তুই তো টিমেই নেই। ঠিক আছে, আগে কো-অর্ডিনেট জিওমেট্রির ইলিপ্‌স্‌-এর প্রতিটা ফর্মুলা বল তো?

জ্যাকসন ঢোঁক গিলল, "স্যার ঠিক আছে, আমি ভাইস ক্যাপ্টেন হব তা হলে।"

দিয়েগো এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল ডুডুকে। বলল, "চল আজ জিতে আসি।" ডুডু এমনিতেই বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল, এবার আনন্দে চোখে জল চলে এল প্রায়। এরা কি ওকে না-কাঁদিয়ে ছাড়বে না? ডুডু ড্রেস করতে শুরু করল।

"স্যার, একটা মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।" একটা ক্লাস এইটের ছেলে এসে পুরুকে বলল। মেয়ে? পুরুর সঙ্গে? সবাই তাকাল একসঙ্গে। পুরু ডুডুকে ডেকে নিয়ে টেন্টের বাইরে এল। ওদের সঙ্গে হেডস্যারও বেরিয়ে এসেছেন। ডুডু দেখল স্কুলের সেক্রেটারি প্রাণবল্লভ মিত্রও দাঁড়িয়ে আছেন ওখানে, এদিকে মাঠও ভরতি। বাঁশের ব্যারিকেডের মধ্যে থেকে পুলিশ ভিড় সামলাচ্ছে। এরই মধ্যে, লাল লং

স্কার্ট আর পোলো নেক গেঞ্জি পরে যে মেয়েটা দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে দেখে চোখ কপালে উঠে গেল ডুডুর। এ যে শিমুল! কী ব্যাপার? ডুডু জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার রে শিমুল?"

পুরু অবাক হয়ে ডুডুকে দেখল একবার, তারপর শিমুলকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও? কেন?"

শিমুলকে কেমন যেন বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। চুলগুলো এলোমেলো, ঠোঁটে খড়ি উঠছে, ও দাঁড়িয়ে ঠোঁট চাটছিল আর বারবার নাক থেকে পিছলে পড়া চশমাটা ঠিক করছিল। ডুডু বুঝল শিমুল কোনও একটা ব্যাপারে খুব টেনশনে আছে। পুরুর প্রশ্নে শিমুলের চোখমুখ আরও শক্ত হয়ে উঠল। কোনওক্রমে ও বলল, "স্যার, একটা খবর দেবার ছিল। আমি রবিন মেমোরিয়ালে পড়ি। আমি খবর পেয়েছি দিয়েগো নামের ছেলেটা ইচ্ছে করে ম্যাচ ছেড়ে দেবে আজ। স্যার, আমি ফুটবল বুঝি না, কিন্তু মনে হল এটা আপনাকে জানানো দরকার।" পুরুর চোয়াল ঝুলে গেল। চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে উঠল নিমেষে। ও বলল, "আমি বিশ্বাস করি না। দিয়েগো মোটেই ওরকম করবে না।"

শিমুল এবার কাছে এগিয়ে গেল পুরুর। ডুডু দেখল কেমন একটা ডেসপারেট ভাব ওর। ও বলল, "স্যার, বিশ্বাস করুন। দিয়েগোর ইনটেনশন খুব খারাপ। আমি এমন জায়গা থেকে খবরটা পেয়েছি যে, তাতে ভুল নেই।"

"কে খবর দিয়েছে তোমাকে?" পুরুর গলায় রাগ।

শিমুল আবার বলল, "স্যার, বিলিভ মি। আয়াম সিরিয়াস, দিয়েগো ইজ বাগড্।"

পুরু কঠিন গলায় বলল, "না, দিয়েগো খেলবে। তোমার যা বলার তুমি বলেছ, নাউ লিভ।"

"না ও যাবে না।" বাঘের মতো গলা শুনে চমকে তাকাল ডুডু। এতক্ষণে মুখ খুলেছেন প্রাণবল্লভ মিত্র। উনি আবার বললেন, "দিয়েগো খেলবে না।"

পুরু এবার ওঁর দিকে মুখ ফেরাল, "মানে? একটা কোথাকার কে মেয়ে তার কথায় দিয়েগো খেলবে না?"

"না খেলবে না। ওর জায়গায় অন্য কেউ খেলবে।"

"কিন্তু আমার টিম হয়ে গেছে। ডুডু আর দিয়েগো ছাড়া স্ট্রাইকার বলতে মনোময় আছে আমার হাতে। দিয়েগো টিমে খেলবেই।" পুরু শান্ত কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল।

"মানে? আমার কথার অবাধ্য হচ্ছ? এই চাকরি করছ কার দয়ায় তুমি? পুরু, মনোময়কে ড্রেস করাও। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ফাইনাল।" প্রাণবল্লভ মিত্র আর কথা না-বলে টেন্টের মধ্যে চলে গেলেন।

ডুডু দেখল পুরুর মুখ লাল হয়ে আছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। এ আবার কী অশান্তি শুরু হল? কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিল ডুডু? পুরু হেডস্যারের দিকে তাকাল একবার। হেডস্যার এগিয়ে এসে পুরুর পিঠে হাত রাখলেন, বললেন, "মন খারাপ কোরো না। ফার্স্ট হাফটায় দিয়েগোকে নামিয়ো না। সেকেন্ড হাফটায় দেখা যাবে।" পুরু মাথা নিচু করে টেন্টে চলে গেল। ডুডু ভেবে পাচ্ছিল না, ও কী করবে? শিমুল তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডুডু ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল, "শিমুল, এসবের মানে কী? তুই খেলা শুরুর মুহূর্তে কী শুরু করলি বল তো? আগে এসে বলতে পারিসনি?"

শিমুল বলল, "আমাকেই টাপুর ব্যাপারটা বলল মিনিট দশেক আগে। ডুডুদা, আমি আর থাকতে পারিনি। আমন যেখানে খেলছে... সেখানে... ও হারলে..." শিমুল আর বলতে পারল না। ডুডু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। আমনকে পছন্দ করে শিমুল? আমন যাতে না হেরে যায় তাই শিমুল এসেছে? আর দিয়েগো সত্যি এমন করেছে? এও সম্ভব?

ডুডু দেখল শিমুল ধীরে ধীরে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। ও কী করবে বুঝতে পারল না। এমন দিনেই ও ক্যাপ্টেন? ডুডু দু'হাত দিয়ে মাথার চুল মুঠো করে দাঁড়িয়ে রইল। ও দেখল ওদের টিম বেরিয়ে আসছে টেন্ট থেকে। সাদা কালো জার্সি পরা দশজন খেলোয়াড়। সবার

সামনে কবীর। আজ কবীরটা কেমন যেন চুপচাপ, হয়তো কনসেন্ট্রেট করছে। এগারো নম্বর হিসাবে দলে যোগ দিল ডুডু। মাঠে নামার আগে সাইড লাইনের মাটি ছুঁয়ে ডুডু একবার প্রণাম করল। তারপর পেছনে ফিরে তাকাল। দেখল রিজার্ভের জায়গায় বুট খুলে বসে আছে দিয়েগো। মাথা নিচু। ডুডুর চোখে চোখ পড়াতে দিয়েগোর পাশ থেকে পুরু উঠে এল ওর কাছে। কাঁধে হাত রেখে বলল, "ডুডু, প্লে ইয়োর ন্যাচারাল গেম। টেনশন নিয়ো না।" তারপর সেন্টার সার্কেলের কাছে দাঁড়ানো জ্যাকসনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, "শট মারার সময় কী করতে হবে মনে আছে তো?" জ্যাকসন দূর থেকে বুড়ো আঙুল তুলল। পুরু রিজার্ভ বেঞ্চে ফিরে যাওয়ার আগে বলল, "ডুডু, ওয়ান টাচে খেলবে। সময় নেবে। ওদের বল ধরতে দেবে না বেশি। কেমন? বেস্ট অব লাক।"

ডুডু সেন্টার সার্কেলের কাছে এসে দাঁড়াল। কবীর গোলে দাঁড়িয়ে, আমন হাফে। আর মাঝ মাঠে দাঁড়িয়ে জ্যাকসন হাসছে। ৪-৪-২ পদ্ধতিতে খেলছে নঙ্গী হাই আর রবীন মেমোরিয়াল ৪-৩-৩ পদ্ধতিতে। ডুডু দেখল কথা নেই বার্তা নেই জ্যাকসন হঠাৎ ভুলভাল প্লেয়ার সাজাতে শুরু করেছে। কাউকে বলছে "পয়েন্টে দাঁড়া," "তুই এক্সট্রা কভারটা গার্ড কর," "আমন মিড উইকেটে যা।" ডুডুর মাথা গরম হয়ে গেল। "কী করছিস তুই?" চিৎকার করল ও। জ্যাকসন কান অবধি হেসে বলল, "একটু ফিল্ডিং সাজিয়ে নিচ্ছিলাম। আমি ভাইস ক্যাপ্টেন না।"

ডুডু আর পারল না, আবার চিৎকার করে বলল, "এবার কানের গোড়ায় দেব। সবসময় ইয়ারকি, না?"

রেফারি টস করতে ডাকল ওদের। নিকেলের মুদ্রা টং করে উঠে গেল হাওয়ায়। টসে রুদ্র জিতে সাইড নিল। ডুডুর সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে হাত মিলিয়ে চাপা গলায় বলল, "তিমিরের হাতে খুব জোর, কী বল। চড়টা আলপনার মতো ফুটে আছে তোর মুখে।" ও, তা হলে এই জানোয়ারটাই! দাঁত চেপে ডুডু হাত ছাড়িয়ে নিল। রুদ্র হাসল, বলল, "ও ক্যাপ্টেন, মাই ক্যাপ্টেন, কাম অন।"

ঠিক চারটের সময় রেফারির বাঁশির সঙ্গে শুরু হয়ে গেল খেলা। টমাস চ্যালেঞ্জ কাপের আক্ষরিক অর্থে ফাইনাল। মাঠের পূর্ব প্রান্তে রবিন মেমোরিয়াল আর পশ্চিম প্রান্ত আগলাচ্ছে নঙ্গী হাই। ডুডু স্ট্রাইকার হলেও খেলা শুরুর প্রথম খানিকক্ষণ বল ধরে নীচে নেমে নিজেদের অর্ধে খেলতে লাগল। দেখল রবিন মেমোরিয়ালও বিশেষ এগোচ্ছে না। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। ওরা আজ ড্র করলেই কাপটা জিতে যাবে।

মিনিট দশেক ঢিমে তালে খেলা চলল। আর বারো মিনিটের মাথায় ঘটল ঘটনা। মাঝ মাঠ থেকে আমন চিপ করে বলটা রাখল ডান দিকে। ডুডু ওদের রাইট উইঙ্গারের সঙ্গে ওয়ান-টু খেলে বলটা নিয়ে পৌঁছে গেল বক্সের মাথায়। রবিন মেমোরিয়ালের ডিফেন্ডার ওকে ট্যাকেল করার আগেই আলতো করে বলটা ভাসিয়ে দিল দুটো ডিফেন্ডারের মাথার ওপর দিয়ে জ্যাকসনের দিকে। বলটা রিসিভ করে পুশ করলে চারটে গোলকিপারও গোল বাঁচাতে পারবে না। কিন্তু বুকে রিসিভ করার বদলে জ্যাকসন হঠাৎ শরীরটাকে ছুড়ে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল করে দিয়ে চাইনিজ ভলি মারতে গেল। বলটা উড়ে এসে লাগল ওর হাঁটুতে, তারপর গড়াতে গড়াতে চলে গেল কর্নার ফ্ল্যাগের কাছে গোল লাইন অতিক্রম করে। গোল কিক।

"কী করছিস তুই?" ডুডু চিৎকার করে উঠল। জ্যাকসন মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "ভাবলাম জিকোর মতো মারব। গতকালই ই এস পি এন-এ পুরনো খেলা দেখছিলাম একটা। জিকো এভাবে গোল দিয়েছিল।" রুদ্র পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলল, "শালা, তোদের সার্কাসের জোকার এবার খেল দেখাচ্ছে।"

এরপর রবিন মেমোরিয়াল চেপে ধরল কিছুটা। ডুডুদের দম বেরিয়ে যাচ্ছিল। তবে রবিন মেমোরিয়ালের স্ট্রাইকারদের অপদার্থতায় ওদের কোনও শটই গোলে থাকল না। এরই মধ্যে আঠাশ মিনিটে আমন একজনকে কাটিয়ে বল বাড়াল বাঁ প্রান্তে। ডুডুদের লেফট ব্যাক ওভার ল্যাপে গিয়ে বলটা ধরে সেন্টার রাখল বক্সের মাথায়। ডুডু বুক দিয়ে বলটা নামিয়ে মারতে যাবে হঠাৎ কোত্থেকে জ্যাকসন উদয় হল, "লিভ

ইট” বলে দুম করে শট মেরে দিল বলটায়। বলটা বেলুনের মতো উড়ে গেল বারের ওপর দিয়ে। জ্যাকসন এবার নিজেই বলল, “বলটা ভীষণ খারাপ বুঝলি, আমি যে ড্রপ শট মারলাম, বলটা বুঝতেই পারল না।”

আবার চেপে ধরল রবিন মেমোরিয়াল। দু'বার প্রায় গোলও হয়ে যাচ্ছিল। প্রথমবার বলটা সোজাই ছিল, কিন্তু কবীরই বুকে লাগিয়ে প্রায় গোল খেয়ে যাচ্ছিল। ভাগ্যিস আমন গোললাইন সেভ করল। দ্বিতীয়টাও সেরকমই। সহজ একটা বল গ্রিপ করতে গিয়ে কবীর ফসকাল। বলটা চলে গেল ফাঁকায় দাঁড়ানো রুদ্রর কাছে। কিন্তু এবার তড়িঘড়ি করতে গিয়ে রুদ্র মিস করল। নঙ্গী হাই-এর সমর্থকদের হাঁফ ছাড়ার শব্দে ডুডুর মনে হল কোথাও স্টিম ইঞ্জিন ছাড়ল বোধহয়। বিপদ, ডুডু বুঝল ঘোর বিপদ। ওরা আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে খেলা থেকে। কিছুতেই ম্যাচটা ধরতে পারছে না। ইস্ দিয়েগোটা যদি থাকত!

আর ঠিক বিয়াল্লিশ মিনিটের মাথায় ঘটল অঘটনটা। মাঝ মাঠে রুদ্র ফাউল করল আমনকে। ফ্রি কিক থেকে ডুডুর মিস পাসে আবার বলটা ধরল রুদ্রই। বল পেয়েই দৌড়োতে শুরু করল ও। সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। রুদ্র একজনকে কাটিয়ে ঢুকে গেল নঙ্গী হাই-এর পেনাল্টি বক্সে, পেছন পেছন তাড়া করছিল আমন। আর উপায় না দেখে আমন শুয়ে রুদ্রর গোড়ালিতে টোকা মারল। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রুদ্র। পি করে বাঁশি বাজাল রেফারি। পেনাল্টি। সঙ্গে বোনাস হিসাবে হলুদ কার্ড দেখল আমন। ডুডু কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্যস, এবার গোলটা খাবে। আর আশা নেই। ও দেখল সাইড লাইনের ধারে একটা জলের বোতল রাগ করে ছুড়ে ফেলে দিল পুরু, আর দিয়েগো শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

পেনাল্টি স্পটে বল বসিয়ে রুদ্র হঠাৎ এগিয়ে গেল কবীরের দিকে। কিছু একটা বললও। ডুডু শুনতে পেল না ঠিক। কিন্তু লক্ষ করল কবীর মাথা নিচু করে ফিরে গেল গোলের কাছে। রুদ্র পিছিয়ে এসে আমনের সামনে দাঁড়াল এবার, মৃদু হেসে বলল, “শিমুলকেও কি তুই এভাবেই পেছন থেকে... অবশ্য আমিও ওকে খেয়ে দেখেছি। সামনে থেকেও

দারুণ।” ডুডু কথাগুলো শুনেও কিছু বোঝার আগেই দেখল আমন ঝাঁপিয়ে পড়েছে রুদ্রর ওপর। এলোপাথাড়ি হাত-পা চালিয়ে চিৎকার করে যাচ্ছে, “শুয়োরের বাচ্চা মেরে ফেলব তোকে, শালা, হারামি।” সবাই মিলে কোনওক্রমে ছাড়িয়ে দিল দু'জনকে। রুদ্রর গাল ছড়ে গেছে, থুতনি নীল হয়ে গেছে কিছুটা। আমনকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। ও তখনও চিৎকার করে যাচ্ছে। ডুডু বুঝল যা সর্বনাশ হওয়ার হয়ে গেছে। রেফারি উইদাউট বল ফাউল করার জন্য আমনকে রেড কার্ড দেখিয়ে দিল। আমন যখন মাঠ থেকে বেরোচ্ছে রবিন মেমোরিয়ালের সমর্থকদের চিৎকার বোধহয় কলকাতা থেকেও স্পষ্ট শোনা গেল। স্বাভাবিক, ম্যাচ তো রবিন মেমোরিয়ালের পকেটে।

ডুডু চোখ বন্ধ করল একবার। রিজার্ভ বেঞ্চের দিকে তাকাবার সাহস আর নেই ওর। ডুডু ভাবল অলক্ষ্য থেকে সত্যিই কি কেউ লক্ষ করছেন ওকে? দেখতে পাচ্ছেন ওর যন্ত্রণা? আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল একবার। লাল, আগুন রঙের একটা বিশাল পাখি অনেক উপরে ভেসে আছে।

পেনাল্টি স্পটে বলটা বসিয়ে ডুডুর দিকে তাকিয়ে হাসল রুদ্র। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল রেফারির বাঁশির। সারা মাঠ নিস্তব্ধ। অনেক দূরের পাখির কিচির মিচির পর্যন্ত স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। নিজের নিশ্বাসটাও শুনতে পেল ডুডু। আর তারপরেই শুনল স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ভেদ করা বাঁশির আওয়াজ। রুদ্র কোনা করে দৌড়ে গেল বলটার দিকে, তারপর বাঁ পায়ের শটে সেকেন্ড পোস্টের কোনায় বলটা রাখল। নিশ্চিত গোল। রবিন মেমোরিয়ালের সমর্থকরা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু চিৎকারটা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই কী জানি একটা ঘটল। ডুডু দেখল একটা সরলরেখার মতো কবীর ছিটকে গেল বলটার দিকে। ওর বাড়ানো হাতে লেগে বলটা দিক পরিবর্তন করে পোস্টে লাগল, তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে পার হয়ে গেল গোললাইন। সারা মাঠ হঠাৎ চুপ। ডুডুর মনে হল ওর হৃৎপিণ্ডটা বুঝি মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে। রেফারি পিঁ করে বাঁশি বাজিয়ে দিল। কর্নার। কবীর ছিটকে বেরোল গোল থেকে।

হতভম্ব রুদ্রর দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "শুয়োরের বাচ্চা, ভেবেছিস আমি বুঝব না টাপুর কেন এসেছিল? মেয়েদের দিয়ে নোংরামো শুরু করেছিস? দালাল শালা, দম থাকলে একটা গোল দিয়ে দেখা।" রুদ্র মাথা নিচু করে কর্নার ফ্ল্যাগের দিকে এগিয়ে গেল। বল স্পটে বসিয়ে কর্নার নিতে নিতে রেফারির বাঁশি জানিয়ে দিল— হাফ টাইম।

ওরা মাঠ থেকে বেরোতেই পুরু এগিয়ে এল ওদের দিকে। ডুডু দেখল কবীর তখনও রাগে ফুঁসছে। পুরু চিন্তিত মুখে এসে ডুডুকে বলল, "এবার কী বিপদ হল বুঝলে? আমরা দশজনে নেমে এলাম। ওরা ওয়ান ম্যান অ্যাডভান্টেজ পেয়ে গেল। যাক তোমরা টেন্টের ভেতরে এসো। ইস, দিয়েগোটাকে যদি খেলাতে পারতাম!" পুরু শেষ কথাগুলো বলার পর ঠোঁট কামড়ে ধরল নিজের।

কিন্তু টেন্টে না-ঢুকে পাশ থেকে কবীর জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা স্যার, দিয়েগোকে নামাচ্ছেন না কেন? ফার্স্ট হাফে নামাননি, ভাবলাম স্ট্র্যাটেজি, কিন্তু এবার নামাচ্ছেন না কেন?"

পুরু চট করে একবার ডুডুকে দেখে নিল। তারপর খুব সংক্ষেপে গোটা ঘটনাটা বলল কবীরকে।

"মানে দিয়েগো চিট করবে টিমকে? স্যার, ওরা, মানে রবিন মেমোরিয়ালের ছেলেরা, যে ছেলেটাকে ম্যাচ ছাড়ার প্রস্তাব দিয়েছিল সে দিয়েগো নয়, সে আমি। আমায় ম্যাচ ছাড়তে বলেছিল ওরা। দিয়েগোর নাম এর মধ্যে টেনে আনা হয়েছে চক্রান্ত করে। স্যার আপনি ব্যাপারটা বুঝুন। এটা ওদের প্ল্যান।" ডুডু উত্তেজিত হয়ে বলল, "স্যার, আমাকেও তো ম্যাচে আসতে আটকেছিল ওরা। প্রথমে আমি, তারপর কবীর আর সব শেষে দিয়েগো, ওর প্ল্যানটা এবার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। রুদ্র আমাদের নোংরাভাবে আটকাতে চাইছে। ও প্রচণ্ড ধড়িবাজ ছেলে। জেতার জন্য ও যা খুশি তাই করতে পারে। স্যার, আপনি দিয়েগোকে নামানোর বন্দোবস্ত করুন, আমরা আছি আপনার সঙ্গে।"

পুরু মাথা নিচু করে ভাবল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, "চলো

তো।" ডুডু, কবীর আর পুরু একসঙ্গে ঢুকল টেন্টের মধ্যে। এই জায়গায় স্কুলের স্যাররা আর প্লেয়াররা ছাড়া অন্যদের ঢোকা বারণ। ডুডু দেখল টেন্টে সব প্লেয়াররা মাথা নিচু করে বসে আছে আর প্রাণবল্লভ মিত্র একা চেঁচিয়ে যাচ্ছেন গাঁক গাঁক করে। ওদের দেখে জ্যাকসন উঠে এল ওদের পাশে। চাপা গলায় বলল, "মাইরি, এই মালটাকে কে সেক্রেটারি করেছে বল তো? যা চেঁচাচ্ছে না, মনে হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেছে।" ডুডু শুনল প্রাণবল্লভ মিত্র তখন আমনকে ঝাড়ছেন রেড কার্ড দেখার জন্য। ডুডু দেখল দেরি হয়ে যাচ্ছে। ও পুরুকে খোঁচাল, "স্যার, প্লিজ একটু দেখুন। আর বিশেষ সময় নেই।"

দিয়েগো এসবের মধ্যে এক কোনায় চুপ করে বসে ছিল। পুরু চিৎকার করতে থাকা প্রাণবল্লভ মিত্রের ওপর গলা তুলে বলল, "দিয়েগো, গেট রেডি, নামতে হবে তোমায়। বুট পরো, বুট পরো।" থতমত খেয়ে মাঝপথে চিৎকার থামিয়ে দিলেন প্রাণবল্লভ মিত্র মহাশয়। ডুডু দেখল ওঁর চোখদুটো গোল হয়ে উঠেছে। ধাতস্থ হয়ে উনি এবার পুরুকে বললেন, "মানে? কী বলছ তুমি? না, দিয়েগো খেলবে না। জানো না তুমি কেন? ও খেললে আমরা জিতব না।"

পুরু গম্ভীর কিন্তু শান্ত গলায় বলল, "স্যার, ও না-খেললেও কি আমাদের সুযোগ আছে? দেখুন, আমি আমার প্লেয়ারদের জানি, আমি ফুটবলটাও জানি। প্লিজ আমায় আমার কাজ করতে দিন। সমস্ত টিম চাইছে দিয়েগো নামুক। আর দিয়েগোকে সত্যিই প্রয়োজন।"

ডুডু বলল, "হ্যাঁ স্যার। দিয়েগোকে চাই।"

প্রাণবল্লভ মিত্রের মুখ লাল হয়ে উঠেছে। উনি ভাবতেই পারছেন না যে কেউ ওঁর বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে। উনি আবার চিৎকার করলেন, "কী বললে? আমার মুখের ওপর কথা? আমি..."

"প্রাণবল্লভবাবু," এতক্ষণ চুপ করে থাকা হেডস্যার এবার কথা বললেন, "আপনি প্লিজ ওদের নিজেদের মতো খেলতে দিন। আমার ছেলেরা ঠিক জিতবে।"

প্রাণবল্লভ অনেক কষ্টে রাগটা গিললেন। পুরুর দিকে ভস্ম করে

দেবার মতো দৃষ্টি দিয়ে বললেন, "ঠিক আছে। কিন্তু মনে রেখো যদি হেরে যাও..."

পুরু কথাটা শেষ করে দিল নিজেই, "ঘাড় ধরে বের করে দেবেন।" ডুডু দেখল প্রাণবল্লভ মিত্র গটগট করে টেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

পুরু আর সময় নষ্ট করল না। জোরে বলে উঠল, "সবাই একসঙ্গে বসো। আর একটু সময় বাকি আছে মাত্র। শোনো ডুডু, আমি ডিফেন্স থেকে একজনকে তুলে নিচ্ছি। তুমি রাইট হাফে নেমে এসে আমনের জায়গাটা নাও আর মনোময় সরে আসবে তোমার জায়গায় মানে রাইট স্ট্রাইকারে। আর দিয়েগো তুমি নামবে লেফট স্ট্রাইকারে। মনোময় শোনো, শট মারার সময় আমার কথা মনে রাখছ না কেন? তোমরা জেনো, ওরা কিন্তু দিয়েগোকে টার্গেট করবে। ফাঁকায় জায়গা নিয়ে তোমাকে এর সুযোগ নিতে হবে মনোময়। শোনো, সমস্ত প্র্যাকটিস, সমস্ত কষ্ট, যারা তোমরা এতদিন করেছ, আজ শেষ পঁয়তাল্লিশ মিনিট তার পরীক্ষা। কবীর, আমি জানি তুমি কোনও গোল খাবে না আজকে। স্পার্টাকাসকে মনে রেখো তোমরা। তিনশো সৈন্য নিয়ে হাজার হাজার শত্রু সৈন্যকে আটকে দিয়েছিলেন ওঁরা। আর তোমরা দশ জন নিয়ে এগারো জনকে হারাতে পারবে না? পারবে। লেটস ডু ইট টুগেদার। কাম অন।"

সারামাঠ দেখল নঙ্গী হাই-এর দল যখন মাঠে নামছে তাদের সবার শেষ প্লেয়ারটাকে। বেঁটে, ঝাঁকড়া চুল, মাটির দিকে চোখ। চাপা গুঞ্জন উঠল ভিড়ের মধ্যে "দিয়েগো, দিয়েগো।"

সেন্টারে বল বসিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেল দিয়েগো। কিক অফ করার জন্য রুদ্র এগিয়ে এল। দিয়েগোর দিকে তাকিয়ে জোরে বলল, " কী রে এবারও গতবারের মতো করবি নাকি?" ডুডু দেখল দিয়েগো পাত্তাই দিল না ওকে। রেফারি বাঁশি বাজিয়ে বুঝিয়ে দিল খেলা শুরু।

রবিন মেমোরিয়াল প্রথম মিনিট আটেক বল নিজেদের মধ্যে দেওয়া-নেওয়া করে কাটাল। ডুডুরা অনেকবার বল তাড়া করল কিন্তু

রবিন মেমোরিয়াল পুরো ডিফেন্সে ঢুকে গেছে। ম্যাচ ড্র করাই যেন ওদের লক্ষ্য। কিন্তু দশ মিনিটের মাথায় হঠাৎ আক্রমণে উঠল রবিন মেমোরিয়াল। তিন-চারটে লম্বা পাস খেলে ওরা পৌঁছে গেল নঙ্গী হাই-এর বক্সে। গোল হয় হয় অবস্থা কিন্তু নঙ্গীর লেফট ব্যাক সুমন বলটা কোনওমতে ক্লিয়ার করে দিল। মাঝ-মাঠে দাঁড়ানো দিয়েগোর কাছে বলটা উঁচু হয়ে এল। দিয়েগোর পেছনে রবিনের দুটো প্লেয়ার। দিয়েগো বলটা রিসিভ না-করে, চকিতে শরীর ঘুরিয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠে বলটা পাস বাড়াল ফাঁকায় দাঁড়ানো জ্যাকসনকে। ডুডু অবাক হয়ে দেখল বলটা নিয়ে জ্যাকসন কিছুটা এগিয়ে পেনাল্টি বক্সের বাইরে থেকেই দুম করে শট মেরে দিল। বলটা গোলের প্রচুর বাইরে দিয়ে গিয়ে লাগল দর্শকদের মধ্যে দাঁড়ানো রবিন মেমোরিয়ালের একটা মেয়ের গায়ে। জ্যাকসন আনন্দে চিৎকার করে উঠল, "হোয়াট আ শট। পুরো বুলস আই।" রুদ্র পেছন থেকে বলল, "জোকার, শালা। হ্যাংলার বাচ্চা।"

খেলা চলতে লাগল। পনেরো মিনিট, কুড়ি মিনিট। কিছুই হচ্ছে না। দিয়েগোকে বলই ধরতে দিচ্ছে না ওরা। যত বার ও বল ধরছে কেউ-না-কেউ এসে মারছে ওকে। এরই মধ্যে রবিনের দুটো প্লেয়ার হলুদ কার্ডও দেখেছে। একটা থ্রো ইনের সময় দিয়েগো ডুডুর কাছে এল। বলল, "এভাবে হবে না, বলটা একটু হোল্ড করার সময় দে আমায়। জাস্ট আমায় কভার কর।"

পঁচিশ মিনিটের মাথায় রবিন মেমোরিয়ালের ভুল পাস থেকে একটা বল পেল দিয়েগো। ডুডু দেখল রবিনের দুটো প্লেয়ার ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ছুটে আসছে। ডুডু দিয়েগোকে কভার করার জন্য হঠাৎ সামনে চলে এল ওদের। দিয়েগো এই সুযোগটা নিয়ে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ডুডু ওদের ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গেল কিন্তু ওর বিশেষ লাগেনি। মাটি থেকে উঠে ও দেখল গোলের দিকে এগিয়ে চলেছে দিয়েগো। বলটা লাট্টুর মতো বাঁ পায়ে ঘুরছে। ঝাঁকড়া চুলগুলো নড়ছে মাথায়। চার, পাঁচ, ছয়। একের পর এক কাটিয়ে চলেছে ও। সারামাঠ আবার পুরনো দিনের মতো চিৎকার করছে, "দিয়েগো, দিয়েগো।"

সাদা-কালো জার্সি পরা বেঁটে ছেলেটার সেদিকে খেয়াল নেই, ও দৌড়ে চলেছে। ততক্ষণে রবিন মেমোরিয়ালের গোলকিপার গোলের মুখ ছোট করার জন্য এগিয়ে এসেছে। সেটা দেখে ছুটন্ত বলের তলায় আলতো করে বাঁ পায়ে মারল দিয়েগো। মেরে আর সেদিকে তাকাল না। কিন্তু ডুডু দেখল, সারামাঠ দেখল, সাদা-কালো বলটা গোলকিপারের নাগাল এড়িয়ে উঁচু হয়ে রামধনুর মতো বেঁকে দ্বিতীয় পোস্টের কোণ দিয়ে গোলে ঢুকে গেল। ১-০, নঙ্গী হাই স্কুল।

সবাই পাগলের মতো দৌড়ে গেল দিয়েগোর দিকে। ডুডু দেখল কবীর হাতদুটো বুকের কাছে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছে গোল লাইনে। পুরু আনন্দে, উত্তেজনায় পায়চারি করছে রিজার্ভ বেঞ্চের সামনে। ডুডুর চোখে চোখ পড়তে হাত দিয়ে ডাকল ওকে। ও দৌড়ে গেল পুরুর কাছে, পুরু বলল, "সাবধান, এবার সাবধান। ওরা মরণ কামড় দেবে। একটা গোল করতে হবে আর। মিনিট কুড়ি সময় আছে।"

আবার শুরু হল খেলা। এবার সত্যিই রবিন মেমোরিয়াল মরণ কামড় দিতে শুরু করল। ওদের সব প্লেয়ার প্রায় উঠে এসেছে। দুটো খেলার এগ্রিগেটে ফলাফল এখন ১-১। এবার যে গোল দেবে সেই জিতবে। রবিন মেমোরিয়ালের আক্রমণ একের পর এক আছড়ে পড়তে শুরু করেছে নঙ্গী হাই-এর ডিফেন্সে। শুধু দিয়েগো ওপরে দাঁড়িয়ে। জ্যাকসনও নীচে নেমে ডিফেন্স করছে। ডুডুদের নাকের জলে চোখের জলে অবস্থা। ডুডু বুঝল দশজন মিলে এগারো জনের সঙ্গে পাল্লা টানতে গিয়ে দম ফুরিয়ে এসেছে ওদের।

পঁয়ত্রিশ মিনিট, আটত্রিশ মিনিট। এবার সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রবিন মেমোরিয়াল। কবীর একা লড়ে যাচ্ছে। নিজের চেয়ে অনেকটা বড় হয়ে উঠেছে যেন। দিয়েগো মাঝ-মাঠে দাঁড়িয়ে সমানে চেঁচাচ্ছে "বল দে, বল দে" বলে। ডুডু দেখল পুরু সাইড লাইন থেকে দেখাচ্ছে যে আর পাঁচ মিনিট মাত্র বাকি। মোটে পাঁচ মিনিট? তবে কি একস্ট্রা টাইম খেলতে হবে? ডুডু জানে একস্ট্রা টাইম খেলতে হলে সব শেষ, কারণ কেউ দম পাবে না। এই সাতপাঁচ চিন্তার মধ্যেই একটা কর্নার

পেল রবিন মেমোরিয়াল। সবাই এসে জড়ো হল নঙ্গী হাই-এর পেনাল্টি বক্সে, শুধু দিয়েগো সেন্টার সার্কেলের মাথায় দাঁড়িয়ে আর দিয়েগোর পাশে রবিন মেমোরিয়ালের একটা ডিফেন্ডার। আর রবিনের গোলকিপারও গোল ছেড়ে এগিয়ে এসেছে প্রায় ওদেরই কাছে।

নিজেদের পেনাল্টি বক্সে দাঁড়িয়ে ডুডু কবীরকে বলল, "পারলে বলটা ফিস্ট করে দিয়েগোকে দেওয়ার চেষ্টা করিস তো।" রবিনের রাইট আউট কর্নার কিক নিতে গেল। রেফারি কিক নেবার বাঁশি বাজাল। কিক নেওয়া হবে, ঠিক সেই সময় আবার গন্ধটা পেল ডুডু। কে যেন পায়েস বসিয়েছে কোথাও। নতুন গুড়ের পায়েস। এ কীসের গন্ধ? চিন্তা করতে করতে বলটা উড়ে এল। জ্যাকসনের মাথা ছাড়িয়ে ডুডুর মাথা টপকে বলটা নেমে এল পেনাল্টি বক্সের মধ্যে। প্রায় সবাই একসঙ্গে লাফাল হেড করতে। আর সেই জটলার মাথায় চড়ে বলটা প্রাণপণে ফিস্ট করে দিল কবীর। বলটা গিয়ে পড়ল সুমনের পায়ে। ও বলটা মাঝ-মাঠের দিকে জোরে ক্লিয়ার করে দিল। আর বিদ্যুৎ বেগে বলটা গিয়ে পড়ল সেন্টার সার্কেলের মাথায় দাঁড়ানো দিয়েগোর পায়ে।

বলটা গোড়ালি দিয়ে ডিফেন্ডারের মাথার ওপর দিয়ে তুলে প্রায় মাঝ-মাঠে দাঁড়ানো গোলকিপারকেও কাটিয়ে নিল দিয়েগো। গোলকিপার শেষ মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কিন্তু ওই পেছন থেকে তাড়া করে আসা ডিফেন্ডারের ধাক্কায় দু'জনেই পড়ে গেল। বল পায়ে দিয়েগো একা। বেশ খানিকটা দূরে গোলপোস্ট দেখা যাচ্ছে। দিয়েগো বিদ্যুৎ বেগে দৌড়োল গোলের দিকে। পড়ে থাকা গোলকিপার আর ডিফেন্ডারটাও উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে। অন্যান্য প্লেয়ারদের সঙ্গে ডুডু আর জ্যাকসনও দৌড় দিয়েছে। ডুডু আড় চোখে দেখল পুরুও সাইডলাইন ধরে দৌড়োচ্ছে। কিন্তু দিয়েগো শট মারছে না কেন। একদম ফাঁকা গোল পেয়েও মারছে না কেন শট ও? ডুডু অবাক হয়ে দেখল পেনাল্টি বক্সে ঢুকে বলটা পায়ের তলায় রেখে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল দিয়েগো। ফাঁকা গোল পেয়েও গোলে বল মারছে না। হ্যাঁচোর প্যাঁচোর করে দৌড়োচ্ছে রবিন মেমোরিয়ালের গোলকিপার। সমস্ত রবিন

মেমোরিয়ালের টিম নেমে যাচ্ছে দিয়েগোর দিকে। ডুডু আর জ্যাকসনও জীবনের শ্রেষ্ঠ দৌড়টা শুরু করেছে। সারামাঠ চিৎকার করছে, "মার দিয়েগো, মার।" পুরু চিৎকার করছে, "বলটা গোলে দাও।" প্রাণবল্লভ মিত্র চিৎকার করছেন, "গোল দাও গোল দাও।" দিয়েগো দাঁড়িয়ে আছে। চোয়াল শক্ত। পায়ের তলায় বল। ডুডু পেনাল্টি বক্সের প্রায় মাথায় পৌঁছে গেছে আর জ্যাকসন ভুল করে চলে গেছে ডানদিকে। গোলকিপার আর ডিফেন্ডারটা গোল বাঁচাতে শেষ মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল দিয়েগোর পায়ে। দিয়েগো বল নিয়ে ছোট্ট নাচের ভঙ্গিতে কাটিয়ে নিল দু'জনকে, তারপর সারা মাঠকে বিস্মিত করে কোনায় পৌঁছে যাওয়া জ্যাকসনকে পাস বাড়িয়ে দিল। জ্যাকসনের সামনে দু'জন রবিন মেমোরিয়ালের প্লেয়ার। ডুডু দেখল বলটা নিয়ে তাদের কাটাবার কোনও চেষ্টাই করল না জ্যাকসন। দুরূহ অ্যাঙ্গেল থেকে সোজা বাঁ পায়ে শট মেরে দিল। বলটা অদ্ভুতভাবে হাওয়ায় ভাসল তারপর বাঁক খেল। সামনে দাঁড়ানো দুটো প্লেয়ারের ফাঁক দিয়ে বেঁকে, গোলকিপারের নাগাল এড়িয়ে বলটা ঝরা পাতার মতো গোল লাইন পেরিয়ে জড়িয়ে গেল জালে। ডুডু অবাক হয়ে লক্ষ করল বলটা ঠিক মারার মুহূর্তে ডান চোখটা বন্ধ করে নিয়েছিল জ্যাকসন।

রেফারির খেলা শেষের বাঁশিটা চাপা পড়ে গেল নঙ্গী হাই-এর সমর্থকদের চিৎকারে। ডুডু বসে পড়ল মাঝ-মাঠে। জিতেছে, শেষ পর্যন্ত জিতেছে ওরা। এত সংকট, মনোমালিন্য, অনিশ্চয়তা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত 'টমাস চ্যালেঞ্জ কাপ' পেয়েছে ওরা। ডুডুর খুব হালকা লাগছে এখন। চারিদিকে হইহট্টগোল থেকে মনে মনে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে অনেক ওপরে ভেসে থাকা লাল একটা পাখির দিকে তাকিয়ে রইল ও। মনে মনে ধন্যবাদ দিল ও পাখিটারও আরও অনেক অনেক ওপরের, অলক্ষ্যের একজনকে। তিনি লক্ষ করেন, সত্যিই তিনি লক্ষ করেন। এরই মধ্যে জ্যাকসন দৌড়ে এল ওর কাছে, বলল, "বলটা এবার কথা শুনল দেখলি ডুডু। কারণ জানিস? এত দিন মরিয়েন্তেস, রোনালডিনহোরা শট মারছিল আর আজ মারল মনোময়

মুখোপাধ্যায়। আমি জোকার, না? দেখ শালা, একেই বলে জোকার ট্রাম্প।”

মাঠের হইহট্টগোলের মধ্যে ডুডুর হাতে এম এল এ সাহেব তুলে দিলেন ‘টমাস চ্যালেঞ্জ কাপ’। পরপর তিনবার। চিরদিনের মতো। পুরুকে নিয়ে ওরা লোফালুফি করল খানিকক্ষণ। এরই মধ্যে সবার সামনে প্রাণবল্লভ মিত্র এসে জড়িয়ে ধরলেন পুরুকে। বললেন সামনের বারও যেন জেতে নঙ্গী হাই। হইচইয়ের মাঝে এবার ডুডুর কাছে এল রুদ্র। সেই তেজ আর নেই যেন। ও বলল, “সরি ফর এভরিথিং। আমি অনেকভাবে তোদের আটকাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারলাম না। ইটস নাথিং পারসোনাল। তবে যদি আরেকবার সুযোগ পেতাম, আবার তোদের হারাবার চেষ্টা করতাম। এনিওয়ে কনগ্র্যাটস।” পাশের থেকে জ্যাকসন কিছু বলতে যাচ্ছিল। ডুডু বাধা দিল। ও নিজে বলল, “তোর হয়তো পারসোনাল ছিল না, বাট ইট ওয়াজ পারসোনাল টু আস। আমাদের সবার মুখ থুবড়ে পড়া জীবনটাকে দাঁড় করাবার জন্য জেতার দরকার ছিল এই ম্যাচটা। আর আবার খেলা হলেও তোরা পারতিস না। রুদ্র, সামথিঙস আর অনলি পসিব্‌ল্‌ ইন ড্রিমস। এটাও তাই।” রুদ্র হাসল। এ অবজ্ঞার হাসি নয়। তারপর ডুডুর কাঁধে চাপড় মেরে চলে গেল। রুদ্র চলে যেতেই জ্যাকসন বলল, “ওই দ্যাখ।” ডুডু দেখল ভারী মিষ্টি দেখতে একটা মেয়ে, ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটা ডুডুদের পাশে দাঁড়ানো দিয়েগোকে বলল, “থ্যাঙ্ক ইউ। আমার কথা রেখেছ তুমি। এবার বলো কী বলতে চাও আমায়।” পেছন থেকে জ্যাকসন টিপ্পনি কাটল। “দিয়েগো আর কী বলবে? সেই বর্গির আমল থেকে তো শুধু শুনেই গেল।”

দিয়েগো হাসল। এই হাসি, এই চোখ ডুডু এখন চেনে। ও শুনল মেয়েটাকে দিয়েগো বলল, “বলব রুপাই বলব, ইন গুড টাইম। যখন সময় হবে, তখন তোমাকেই সব বলব।”

রুপাই বলল, “আমি অপেক্ষা করব দিয়েগো। তোমাদের সেলিব্রেশন হয়ে যাক। আমি তোমার জন্য মাঠের গেটে অপেক্ষা করব।

আজ তোমার সঙ্গে ফিরব আমি।” এই বলে মেয়েটা হাজার ওয়াটের হাসি দিয়ে চলে গেল ভিড়ে। কিন্তু কবীর, কবীর কই? একটু দূরে শিমুলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আমনকে জিজ্ঞেসা করল ওরা। আমন বলল, “কবীরদা এমন ‘গিভ আপ’ না! এর মধ্যে টেন্টে একা বসে আছে।”এরা তাড়াতাড়ি টেন্টে ঢুকে গেল। ডুডু দেখল একা মাটিতে বসে আছে কবীর। মাথা নিচু, চোখের কোণ দিয়ে জল পড়ছে ওর। এ-জলের মানে এখন বুঝতে পারল ডুডু। টাপুর। ভেঙে-যাওয়া প্রেম সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হয় মানুষকে। কিন্তু কী করবে বুঝতে পারল না ডুডু। ও দেখল দিয়েগো এগিয়ে গিয়ে বসল কবীরের সামনে। শান্ত গলায় বলল, “কবীর, চল বাইরে চল। এই মুহূর্ত সারাজীবনে একবারই আসে। আর কাঁদবি না। কত কিছু ছেড়ে যেতে হয় জীবনে। সেজন্য তো মন খারাপ হবেই, তা বলে সেটা বয়ে বেড়াস না। আজ তুই যা খেললি আমার সারা জীবন মনে থাকবে। আর কাঁদিস না। জানিস না বয়েজ ডোন্ট ক্রাই।” কবীর জামার হাতায় চোখ মুছে দিয়েগোর হাত ধরল। তারপর একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল ওরা।

টেন্টের বাইরে সায়েকা অপেক্ষা করছিল ওর দাদার সঙ্গে। ওকে দেখে ডুডুর মনটা আরও ভাল হয়ে গেল। এবার দাদার সঙ্গে ফরমালি পরিচয় হল ওর। দু’-একটা টুকটাক কথার মধ্যে জ্যাকসন হঠাৎ দাদার হাত ধরে বলল, “আচ্ছা তুমি তো এন ডি এ-তে আছ? সেটা কি ওই পলিটিক্সের এন ডি এ? এত ইয়ং এজে হঠাৎ পলিটিক্সে জয়েন করলে?” দাদা থতমত খেয়ে গেল। নার্ভাস হয়ে বলল, “আ-আমি আসি আজ। তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। সায়েকা, তুই বাড়ি চলে আসিস ঠিক সময়ে, কেমন?”

সায়েকা বলল, “দাদা, মাকে বলিস না কিন্তু, ম্যানেজ করে নিস প্লিজ।”

দাদা চলে যেতেই জ্যাকসন বলল, “আমিও যাই, পরী ওয়েট করছে। তোরা একা একা কথা বল।”

“পরী? মানে?” ডুডু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

সায়েকা বলল, "হ্যাঁ, এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? পরী তো ওর প্রেমিকা।"

"কী?" ডুডু গোল গোল চোখে তাকিয়ে থাকল জ্যাকসনের দিকে। জ্যাকসন বোকা আর চালাকের রেজালটেন্টে হাসি দিল একটা। তারপর চলে গেল। সায়েকা বলল, "সত্যিই আমি ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে পরীর অ্যাফেয়ার আছে। এত রাগ হয়েছিল না। ভাগ্যিস জ্যাকসন এসে আমায় বলল যে পরী ওর গার্লফ্রেন্ড। আর তুমি ভদু একটা। কথাটা বলতে পারোনি আমায়? যাক, আজ জিতেছ, আজ আর বকব না। আজ খুব আনন্দ হচ্ছে আমার। আয়াম সো গ্ল্যাড। আই ফিল লাইক কিসিং।" ডুডু চমকে গেল, কিস? ঠাকুরদার মুখটা মনে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়, কিন্তু আজ ও সেই মুখটার ওপর চাদর চাপা দিয়ে দিল একটা। মনে মনে বলল, 'প্লিজ ঠাকুরদা, আজ একটু অন্য দিকে তাকিয়ে থাকো। আর জ্যাকসন? ডুডু মনে মনে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ মনোময়।"

আরও বেশ কিছু পরে। টমাস বাটা অ্যাভিনিউ দিয়ে ফিরছিল ডুডুরা। সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে একটা। রাস্তার মার্কারি ভেপার ল্যাম্প কণ্ঠহারের মতো জ্বলে আছে পরপর। কোনও কথা বলছিল না ওরা, শুধু আলতো করে হাত ধরে আছে একে অপরের। ডুডু এখন যেন বুঝতে পারল পায়েসের গন্ধের মানে কী!

ওদের সামনেই চারজন প্রৌঢ় মানুষ হাঁটছিলেন। তাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ডুডু শুনল একজন জিজ্ঞেস করছেন, "আচ্ছা নঙ্গীর টিমটা এত ভাল খেলল কী করে বলো তো? গত ম্যাচেও তো জঘন্য খেলেছিল! এ যে মিরাকল্।"

খয়েরি চাদর গায়ে আরেকজন শান্ত গলায় উত্তর দিলেন, "এতে মিরাকলের কিছু নেই। ওদের নতুন গেমস টিচারের জন্যই তো এটা সম্ভব হল। দেখছিলে না, ম্যাচের মাঝে মাঝে কীরকম নির্দেশ দিচ্ছিল। সব ছেলেরা কেমন কথা শুনছিল ওর! জানো ও কে? ও আমার ছেলে। পুরু।"

ডাক পয়েন্টের কাছে এসে হঠাৎ সায়েকা ডুডুর হাত জড়িয়ে ধরল।

মাথাটা আলতো করে একবার ওর কাঁধে রেখে সরিয়ে নিল। আস্তে আস্তে সাহেব কলোনির রাস্তায় হাঁটতে লাগল ওরা। এই প্রায়-সন্ধের অল্প আলোয় ডুডু দেখল হিরে মুক্তোর মেয়েটা চোখে পৃথিবীর সমস্ত ভালবাসা জড়ো করে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ডুডু আর একটু কাছে টেনে নিল ওকে। শীত শেষের ওম নিয়ে সায়েকা মৃদু আদুরে গলায় বলল, "ডুডু, ডুডু নামটা প্রথম থেকেই এত ভাল লেগেছে না আমার!"

২১

এদিকটায় সার সার পাম গাছ। পেছনে লাল সাদা হস্টেল। তার বড় বড় কাচের জানলা, সবুজ রঙের বিশাল দরজা, ইংরাজি 'ডি' অক্ষরের মতো চাতাল। এই চাতালেই এখন বসে আছে ওরা। দূরে প্যান্ডেলের মাইক বাজছে। 'রং দে বসন্তী' ছবির গান হচ্ছে। এর আগের গানটায় এই চাতালে জ্যাকসন আর ডুডু নাচছিল। জ্যাকসন তো নাচতে নাচতে পুরুকেও হাত ধরে টানছিল নাচবার জন্য। পুরু নাচেনি। হেসে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল। জ্যাকসনটা খুব মজার ছেলে।

ওরা যেখানে বসে আছে তার কিছু দূরে বাটার রাস্তা। দূরত্ব এমন যে এখানে বসলে রাস্তার সব কিছু দেখা গেলেও রাস্তার গোলমালটা পোহাতে হয় না। আজ রাস্তায় অনেক লোকজন কারণ আজ সরস্বতী পুজো। বাটানগরে প্রচুর সরস্বতী পুজো হয়। দু'পা দূরে দূরেই এক একটা ক্লাব। আর তাদের ছোট্ট ছোট্ট পুজো। আর এই পুজোগুলোর বৈশিষ্ট্য হল এর ঠাকুরের মূর্তি। দেশলাই কাঠি, আলপিন, বিস্কুট, মিষ্টি থেকে শুরু করে রাংতা, ভাঙা কাচ সব কিছুর মূর্তি তৈরি হয়। একবার তো একটা ক্লাব দুটো মেয়েকে নিয়ে এসেছিল। দু'ঘণ্টা দু'ঘণ্টা করে ওরা ঠাকুরের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল। সেই দেখতে কী ভিড় কী ভিড়। পুরুর মনে আছে কুশ তো একটা মেয়েকে চোখও মেরেছিল। সেই নিয়ে ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে অশান্তি হয়েছিল খুব।

কথাটা মনে পড়াতে নিজের মনেই হাসল পুরু। আজ কুশটা থাকলে ভাল হত। অবশ্য বলেছে আসবে। এখন সন্ধে সাতটা। বলেছে সাতটাতে আসবে। কিন্তু কুশের সাতটা তো!

পুরুর সঙ্গে আজ ডুডু জ্যাকসন ছাড়াও কবীর, দিয়েগো, আমন, রুপাই, শিমুল আর সায়েকা আছে। এই শেষের তিনজন আজ দুপুরের সংযোজন।

গতকাল প্রাণবল্লভ মিত্র খেলার শেষে পুরুকে যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন আজ স্কুলে সেটাই মৌখিকভাবে বলে দিয়েছেন উনি। আজ শুক্রবার, সোমবার স্কুল খুললেই নঙ্গী হাই স্কুলের গেমস টিচারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে যাবে পুরু। সেই কথা শোনার পর জ্যাকসন ধরেছিল, “স্যার, খাওয়াতে হবে, খাওয়াতে হবে” বলে। পুরু “ঠিক আছে” বলার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাকসন অন্যদের জুটিয়ে ঠিক করে ফেলেছিল যে আজ সন্ধেতেই হবে ব্যাপারটা। পুরুর খুব ভাল লেগেছিল। কোনওদিন কেউ এভাবে কিছু চায়নি ওর কাছে। আর ছেলেগুলোকে এই ক'মাসে খুব ভালবেসে ফেলেছে পুরু। নিজের ছোট ভাইয়ের মতোই দেখে ওদের। কিছুক্ষণ পরে আবার জ্যাকসন ফিরে এসেছিল। পুরু তখন পরিবেশন করছে।

স্কুলে সরস্বতী পুজোয় খিচুড়ি, বাঁধাকপির তরকারি, বেগুনভাজা, চাটনি, পাঁপড় আর পায়েস হয়। ক্লাসঘরের সামনের লম্বা বারান্দায় ছাত্ররা খেতে বসে। পুরু সবে পায়েসের বালতিটা নিয়েছে এমন সময় জ্যাকসন এসে হাজির। বলল, “স্যার, আমরা তো আসবই, আরও কয়েকজনকে নিয়ে আসব?”

“পুরু অবাক, আরও কয়েকজন? মানে?”

“মানে, স্যার কয়েকজন মেয়েকে। ওরা আমাদের বন্ধু স্যার। অন্য কিছু ভাববেন না কিন্তু! নতুন বন্ধু বলতে পারেন। আনব স্যার? মানে, ওরা আসলে ভাল হবে।”

পুরু হেসে বলেছিল, “ঠিক আছে, অত ব্যাখ্যা দেবার কিছু নেই। নিয়ে এসো।”

সেই ওরা এসেছে। শিমুল অবশ্য একটু কিন্তু কিন্তু করছিল। গতকাল মাঠে যে ও ভুল তথ্য দিয়েছিল সেটা ততক্ষণে জেনে গেছে ও। কিন্তু এখানে সবাই মিলে যখন বলেছিল ওতে ওর কোনও ভুল নেই তখন খানিকটা স্বাভাবিক হল। এতক্ষণে অবশ্য পুরু বুঝে গেছে, এই 'বন্ধু' মেয়েগুলো আসলে কারা। পুরুর বেশ মজাই লাগছে। এই অল্পবয়সি ছেলেমেয়েগুলোর ভাবভালবাসা খুব অদ্ভুত হয়। আর কোনও বয়সেই বোধহয় মানুষ এরকম সর্বস্ব পণ করে প্রেমে পড়তে পারে না। বেশ লাগছে ওদের।

আর এই ভাললাগাটুকুর মধ্যে থেকে হঠাৎ টাপুরের কথা মনে পড়ে গেল পুরুর। টাপুরও কি সর্বস্ব দিয়ে ভালবাসেনি পুরুকে? এই সমাজে দাঁড়িয়ে টাপুর তো অনেকখানি মাত্রা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল পুরুর জন্য। পুরুর মনে পড়ে গেল আজ দুপুরের কথা।

স্কুলের পুজো, পরিবেশন শেষ করে বাড়ি ফিরছিল পুরু। ওর সঙ্গে ছিল ওদেরই স্কুলের বায়োলজির টিচার মৃণালদা আর তাঁর বন্ধু অর্ণবদা। অর্ণবদাকে পুরু ছোটবেলা থেকে চিনত। মৃণালদা আর অর্ণবদা মৃণালদার বাড়িতে একসঙ্গে ঢুকে যাওয়ার পর পাড়ার ভেতরের রাস্তা দিয়ে একাই ফিরছিল পুরু। এই রাস্তাটা সরু, ছায়ায় ঢাকা। মাঝে মাঝে দু'-একটা বাঁকে ছোট ছোট ছেলেরা তিন-চার ফুটের প্যান্ডেল বানিয়ে সরস্বতী পুজো করছে। কিন্তু দুপুর বলেই কেমন ঝিম-ধরা একটা ভাব সব দিকে। এর মধ্যে দিয়ে হেঁটে হেঁটে ফিরছিল পুরু। সাইকেল আনেনি সঙ্গে।

হাঁটতে হাঁটতে ও চলে এসেছিল শানিবুড়োর বাগানের সামনে। বাটানগরে এই বাগান খুব বিখ্যাত। বসন্তের আভাস পেয়ে বাগান আবার রং ধরছে এখন। আর এই বাগানের সবুজ-হলুদ পাতার মধ্যে থেকে হঠাৎ ওর সামনে বেরিয়ে এসেছিল টাপুর। চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল পুরুর। সবুজ পাড়ের বাসন্তী শাড়ি পরেছে টাপুর। মাথায় আলগা একটা খোঁপা। দুই ভুরুর মাঝে সবুজ টিপ। এরকম টাপুরকে কোনওদিন দেখেনি পুরু। অবাক হয়ে টাপুরের দিকে তাকিয়েছিল ও। কোনও কথা

বলতে পারছিল না। টাপুরই প্রথম কথা বলেছিল। হাতের প্যাকেট থেকে দুটো বড় তালশাঁসের সন্দেশ পুরুর হাতে দিয়ে বলেছিল, "আমাদের বাড়িতে পুজো হয়েছে, তার প্রসাদ, খেয়ে নাও। আমি অনেকক্ষণ থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি পুরু। এত দেরি করলে কেন?" পুরু হতভম্ব হয়ে তাকিয়েছিল টাপুরের দিকে। আসলে এত সুন্দর লাগছিল টাপুরকে যে দম বন্ধ হয়ে আসছিল পুরুর। টাপুর আবার বলল, "পুরু, আর বছরখানেক, তারপর আমি বিদেশে চলে যাব। আমার জেঠু থাকে কানাডায়। আমি চলে যাব জেঠুর কাছে। জানো, বাবা মা আমাকে পাঠাতে চায় না, কিন্তু আমিই জেদ ধরেছি। আমি যাবই। আর থাকব না এখানে। তুমি ভাবছ এসব তোমায় বলছি কেন। কিন্তু পুরু, আমি তো তোমার জন্যই চলে যাচ্ছি। আমি সহ্য করতে পারব না যে তুমি এই শহরে থাকবে কিন্তু আমার হবে না।" টাপুর ঠোঁট কামড়ে মাটির দিকে তাকিয়েছিল। পুরু সন্দেশ হাতে দাঁড়িয়ে ছিল বোকার মতো। একটা কথাও মুখ দিয়ে বেরোচ্ছিল না ওর। টাপুর আবার বলল, "তুমি আমায় এত কষ্ট দিলে কেন পুরু? আমি জানি, আমি খুব লাউড। তা বলে আমায় ভালবাসতে পারলে না তুমি? তাই তো রাগ হয়েছিল আমার। তোমায় জব্দ করতে চেয়েছিলাম আমি। বোকা শিমুলটাকে দিয়ে মিথ্যে খবর পাঠিয়েছিলাম তোমার দল ভাঙতে। আমি চাইছিলাম তোমায় হারাতে। কিন্তু তুমি জেতায় আনন্দ হচ্ছে কেন আমার? পুরু, তুমি এর উত্তর জানো? জানো এখনও আমি পড়ার টেবিলে বসলে দেখতে পাই গম্ভীর মুখের একটা ছেলেকে। যে সাইকেল স্ট্যান্ড করে উঠে আসছে আমার পড়ার ঘরে। আমি স্পষ্ট দেখি টেবিল ল্যাম্পের আলোয় তুমি মুখ নিচু করে বই দেখছ আর টেবিলের ওই পারে বসে আছে ক্লাস নাইনের এক মেয়ে। তার গলা শুকিয়ে কাঠ, হাতের তালুতে ঘাম। তুমি চলে যাওয়ার পর তোমার চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে থাকতাম আমি। টেবিলে তোমার হাত রাখার জায়গায় আমার হাত রাখতাম। বালিকা থেকে নারী হয়ে ওঠার সবটুকুতে তুমিই আমার

সঙ্গে ছিলে পুরু। আমার সঙ্গে থাকবেও। আর কোনওদিন আমাকে তুমি দেখবে না। দেখা হলেও আমিই চিনব না তোমায়। কিন্তু মনে রেখে দেব। তুমি মনে রাখবে কি রাখবে না সেটা প্রশ্ন নয়, আমি তোমায় সারাজীবন মনে রেখে দেব পুরু। শুধু এটুকু জেনো একটা পাগলি তোমায় প্রচণ্ড ভালবেসেছিল। আর আজ এই দুপুরে সেই পাগলিটার মৃত্যু হল। এই মুহূর্তটুকু, তোমার এই বয়সটুকু, চিরদিনের মতো আমার হয়ে গেল। এই দুপুর এই রোদ কোনওদিন পৃথিবীতে ফিরে আসবে না আর। আমাদের বিচ্ছেদের সঙ্গে এরও মৃত্যু হল আজ।"

আর একটা কথাও না-বলে পুরুকে একা রেখে চলে গিয়েছিল টাপুর। খাঁ খাঁ দুপুরে নিঝুম রাস্তায় একা দাঁড়িয়ে ছিল পুরু। হাতের সন্দেশটুকু না-থাকলে ও হয়তো বিশ্বাসই করত না টাপুর এসেছিল। যে-মেয়েটাকে ও মনে মনে ঘৃণা করত, তার সামনে নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছিল পুরুর।

এসব মনে পড়াতে এত জনের মধ্যে বসেও নিজেকে কেমন নিঃসঙ্গ লাগল পুরুর। ওর চিন্তাটা ভাঙল কবীরের কথায়, "স্যার, এখনও দিয়েগোরা আসছে না কেন বলুন তো?"

পুরু বলল, "আসবে, ধৈর্য ধরো।" কবীর আবার আড্ডায় মশগুল হল। কথা আছে এখানে বসেই 'নিউল্যান্ড ক্যাফে' থেকে কিনে এনে স্ন্যাকস খেয়ে নেবে ওরা। সেইমতো দিয়েগো আর আমন গেছে খাবার আনতে। ওদের ফিরে আসার সময়ও হয়ে এল প্রায়।

পুরু মুখ ঘুরিয়ে দেখল ওরা নিজেদের মধ্যে কীসব গল্প করছে। স্বাভাবিক। এই বয়সটায় প্রচুর কথা জমে থাকে। পুরু যদিও ওদের চেয়ে ছ'-সাত বছরের বড়। তবু কেন কে জানে ওর নিজেকে মধ্য বয়স্ক মনে হয়। আসলে জীবনে যে যত বিপদে পড়ে তার মনের বয়স তত বেড়ে যায়। পুরু একবার চারিদিক তাকাল। এই ছবির মতো সুন্দর বাটানগর, এই সরস্বতী পুজোর সন্ধে, চাকরির একটা হিল্লে হয়ে যাওয়া, এই অনুজপ্রতিমদের মধ্যে বসে থাকা, সব কিছুই তো আনন্দের। কিন্তু ওর

আনন্দ হচ্ছে না কেন? কেন মনে হচ্ছে ওর, যে গলায় কাঁটা ফুটে আছে? সবসময় অস্বস্তি! সবসময় কী নেই, কী নেই ভাব! তার কারণ কি রোহিণী?

গতকাল খেলার পর মাঠ থেকে ফিরছিল পুরু। তখন হন্তদন্ত হয়ে এসেছিল কুশ। কুশ এম বি এ পড়বে বলে 'ক্যাট'-এর জি ডি পি আই-এর ট্রেনিং নিচ্ছে। তার ক্লাস ছিল বলে কুশ ম্যাচে আসতে পারেনি। কিন্তু ট্রেন থেকে স্টেশনে নেমেই সোজা চলে এসেছিল মাঠে। আর আসতে আসতে খবর পেয়ে গিয়েছিল যে ম্যাচটা নঙ্গী হাই জিতে গেছে। কুশ বলেছিল, "বিশ্বাসঘাতক! রবিন মেমোরিয়ালের স্টুডেন্ট হয়ে নঙ্গী হাইকে খেলায় জিততে সাহায্য করলি?" পুরু হেসেছিল। কিছু বলেনি। ও কীভাবে বোঝাবে কুশকে যে এই ম্যাচটার ওপর পুরুর জীবন নির্ভর করছিল।

ওরা যখন ফিরছিল ঠিক সেই সময়েই দৃশ্যটা দেখেছিল পুরু। সিনেমা হলের সামনের রাস্তা দিয়ে হাতে একটা ফুলের তোড়া আর কাঁধে খুব সুন্দর একটা পাটের তৈরি ব্যাগ নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে রোহিণী। ফুলের তোড়া দেখে ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল পুরুর। ফুল কে দিল ওকে? কুশ ধরেছিল ব্যাপারটা, ও বলল, "কী রে, ফুলের তোড়া দেখে চুপসে গেলি মনে হচ্ছে? শালা ওকে যা দেখতে, কেউ যদি গোটা বাগানটা উপড়ে দিয়ে দেয়, তাতেও কিছু বলার নেই। যতই খেলায় জিতিস আর যা-ই করিস, তুই কিন্তু চিরকালীন আতা ক্যালানে। ও একটা মেয়ে ছাড়া তো কিছু নয়। একবার প্রোপোজ করেছিলিস, রিপ্লাই দেয়নি, তার মানে কি সারাজীবন বসে সেই নিয়ে গ্রাম্বল করবি? শালা, একটা ফুলের তোড়া দেখেই তোর মুখের যা জিয়োগ্রাফি তাতে সামনের বার মাধ্যমিকের সিলেবাস বদলাতে হবে মনে হচ্ছে। যা না, কথা বল না আবার। পৃথিবীর নাইন্টি পারসেন্ট মেয়েকে মাল্টিপল প্রপোজাল দিতে হয়। যা।"

পুরু কুশের কথায় ভরসা পেয়ে রাস্তা পেরিয়ে গিয়েছিল রোহিনীর দিকে। রোহিণী পুরুকে সামনে দেখে যেন ভূত দেখছে এমনভাবে

চমকে উঠেছিল। তারপর দ্রুত পুরুকে কোনও কিছু বলার সুযোগ না-দিয়েই চলে গিয়েছিল পাশ কাটিয়ে। বোকার মতো দাঁড়িয়ে ছিল পুরু। রাস্তায় তখন মাঠ থেকে খেলা দেখে ফেরা লোকের ঢল। তাই অত লোকের মাঝে কিছু করতেও পারেনি পুরু। শুধু বোকার মতো দেখছিল বড় একটা মাঠ, নানা ধরনের গাছ, আর তার মধ্যে দিয়ে যাওয়া উঁচু নিচু রাস্তার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে রোহিণী।

তখন থেকে মনটা খচখচ করছে ওর। সব কিছু করেও যেন কিছু করতে ইচ্ছে করছে না। "স্যার, কী চিন্তা করছেন?" জ্যাকসন পুরুর পাশে বসে জিজ্ঞেস করল, পুরু দেখল অন্যান্যরাও এসে ওকে ঘিরে বসে পড়েছে। মাঘ মাস চললেও শীত হঠাৎ কমে এসেছে এখন। তাই কারও গায়েই খুব কিছু শীতের পোশাক নেই। সবার মুখ চোখ দেখে ভারী আনন্দ হল পুরুর। ইস ও যদি এই বয়সটা ফিরে পেত আবার! "কী স্যার, কী চিন্তা করছেন এত?" আবার প্রশ্ন করল জ্যাকসন। পুরু সামান্য হেসে বলল, "কই কিছু না তো।"

"তা হলে এবার চিন্তা করুন।" বলে জ্যাকসন বলল, "আচ্ছা স্যার, বলুন তো 'একটি অবিবাহিতা মেয়ে নীচে দাঁড়িয়ে আছে' এর ইংলিশ ট্রান্সলেশন এক কথায় কী হবে? মানে একটাই ইংলিশ শব্দ বলতে হবে যার মানে দাঁড়ায় এটা।"

পুরু হাসল, এ আবার কীরকম প্রশ্ন। খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "ধুস, পারব না। তুমি বলো।"

জ্যাকসন তৃপ্তির হাসি দিল, "এনিওয়ান? তোরা কেউ পারবি?" সবাই চুপ। পুরু বুঝল কেউ পারবে না। জ্যাকসন মিটিমিটি হাসছে। সায়েকা বলল, "কেন সাসপেন্স ক্রিয়েট করছ? বলেই দাও না?"

জ্যাকসন বলল, "তা হলে সবাই ফেল তো?"

"না ফেল নয়। উত্তরটা হবে Missunderstanding।" পুরু অবাক হয়ে দেখল ওদের জটলার থেকে একটু দূরে মোটরবাইক স্ট্যান্ড করতে করতে জবাবটা দিল কুশ। জ্যাকসন থতমত খেয়ে গেল। এটা ও আশা করেনি। কুশ এবার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "তোমার উত্তর তো

দিলাম। এবার বলো তো মায়ের বোন মাসি হলে বাবার বোন পিসি কীভাবে প্রমাণ করবে?"

জ্যাকসন বলল, "এ আবার কী? ধুর, এ আবার প্রমাণ করাই যায় না।"

কুশ হাসল, "পারলে না তো? খুব সোজা। আচ্ছা শোনো:

মাতার বোন মাসি

১-এর বোন মাসি

মাতা

পিতার বোন   পি (তা) × (মা) সি

(মাতা) =পিসি।"

"গুরু, গুরু" বলে জ্যাকসন কুশের হাত ধরল। পুরু ভাবল একেবারে সেয়ানে সেয়ানে হয়েছে। ও কথা ঘোরাবার জন্য বলল, "কী রে দেরি হল? যাক গে! পরিচয় করিয়ে দিই। এ হল কুশ, আমার বন্ধু। আর এরা হল..."

কুশ পুরুকে কথা শেষ করতে না দিয়ে নিজেই এগিয়ে গিয়ে সবার সঙ্গে পরিচয় করে নিল। ঠিক সেই সময় দুটো সাইকেল বেল বাজিয়ে হাজির হল সেখানে। পুরু দেখল দুটো ঢাউস সাদা পলিপ্যাকে খাবারদাবার নিয়ে এসেছে দিয়েগো আর আমন।

ওরা খাবারের প্যাকেটগুলো বের করার উদ্যোগে নিতে যাবে এমন সময় কুশ ফিসফিস করে পুরুর কানে বলল, "রোহিণীকে দেখলাম রাকার সঙ্গে বেরিয়েছে। সিনেমা হলের সামনে ফুচকা খাচ্ছে। এখন গেলে ধরতে পারবি।"

পুরু রোহিণীর নাম শুনে চিড়িং করে শক খেল যেন। ওঃ আবার সেই মেয়েটার কথা কেন? ও অভিমানভরে বলল, "না আমি যাব না।"

কুশ চাপা গলায় বলল, "ছাগলামো করিস না। যা। প্রুভ ইয়োর টেনাসিটি, গার্লস লাইক দ্যাট।" এই সামান্য কথাতেই পুরু দ্বিধায় পড়ে গেল। কুশ এবার আলতো ধাক্কা দিয়ে বলল, "যা না শালা।" পুরু এবার সত্যি উঠল। এখান থেকে সিনেমা হল খুব কাছে। তিন-চার মিনিটের

হাঁটা পথ। পুরু সবাইকে "একটু আসছি" বলে জোরে পা চালাল সিনেমা হলের দিকে। ভাবল এর মধ্যে যদি ফুচকা খাওয়া হয়ে গিয়েও থাকে, তা হলেও ওরা বেশি দূর যেতে পারেনি। ওই চত্বরেই হবে। শুধু একটু খুঁজে নিতে হবে, এই যা।

সিনেমা হলের চত্বরটা বেশ ঝলমল করছে আজ। আর হবেই তো! সরস্বতী পুজো বলে কথা। পুরুকে বেশিক্ষণ খুঁজতে হল না। দেখল, বড় রাস্তা দিয়ে একটু দূরে হেঁটে যাচ্ছে দুই বোন। সামান্য ভিড় থাকলেও দু'জনকে চিনতে অসুবিধা হল না পুরুর। ও রোহিণীদের পিছু নিল। আজ একটা হেস্তনেস্ত করবে ও। রোহিণী বহুত ঝুলিয়েছে ওকে। এত দিনে একটা কথাও বলেনি। অহংকার, না? আজ ওর সমস্ত অহংকার ভাঙবে পুরু।

দুটো পুজো প্যান্ডেলের মাঝখানের অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় পুরু গিয়ে দাঁড়াল ওদের সামনে। পুরু লক্ষ করল ওকে দেখেই রোহিণীর মুখটা যেন হঠাৎ সাদা হয়ে গেল ঠিক গতকালের মতো। পুরু ভাবল ও কি দৈত্য না দানব? ওকে এত ভয় পাওয়ার কী আছে? পুরু কঠিন গলায় বলল, "আমাকে চিনতে পারছ রোহিণী? মানে, আমাকে চিনতে পারো তুমি? আমি কী অন্যায় করেছি বলতে পারো? আর কত দিন তোমার কাছে আসব আমি? আমাকে পছন্দ হয় না সেটা সরাসরি বলে দিলেই তো পারো, এভাবে অবজ্ঞা করার, কথা না-বলে চলে যাওয়ার কী মানে হয়? তুমি সুন্দরী বলে তোমার খুব অহংকার, না? তুমি জানো ভালবাসলে কেমন লাগে? কতটা কষ্ট হয়? আমায় এভাবে কষ্ট দিয়ে কী লাভ তোমার? বলো, কথা বলছ না কেন? কেন কথা বলছ না?"

পুরু শেষ কথাগুলো বলার সময় একটু চিৎকার করে ফেলল। ও দেখল রোহিণী কাঁপছে। ওর অতর্কিত আক্রমণে রাকাও হতবাক। পুরু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু রোহিণী আর দাঁড়াল না। পিছন ফিরে দ্রুত হাঁটতে লাগল ওদের বাড়ির দিকে।

পুরুও ওর পিছু নিত কিন্তু রাকা এবার হাত ধরে ফেলল পুরুর। ও তাকিয়ে দেখল রাকার চোয়াল শক্ত হয়ে আছে। চোখ দুটোও যেন

জ্বলছে। পুরু এবার নিজে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাকা কঠিন গলায় বলল, "আপনি দিদির সম্বন্ধে কতটুকু জানেন যে ওকে অহংকারী বললেন? দিদি ভাল, প্রতিবাদ করতে পারে না, তাই আপনি যা ইচ্ছে তাই বলে যাবেন? খুব তো ভালবাসেন বলছেন। যাকে ভালবাসেন তাকে এতগুলো কথা শোনাতে খারাপ লাগল না?"

পুরুর তেজ কমে গেছে এতক্ষণে। আসলে খুব বেশিক্ষণ তেজ করে থাকতে পারে না পুরু। ও হতাশ গলায় বলল, "আমি কী করব? তোমার দিদি আমায় মানুষ বলে গণ্য করে না। তুমি বুঝবে না এর যন্ত্রণা। জানো আমার কথার উত্তর পর্যন্ত দেয় না।"

রাকা থমকাল, তারপর বলল, "সত্যি কথাটা শুনবেন? মনের জোর আছে? শোনার পর দিদিকে ভালবাসবেন আর?"

পুরু ঘাবড়ে গেল, জিজ্ঞেস করল, "মানে? কী বলছ তুমি?"

রাকা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল পুরুর দিকে। তারপর বলল, "শুনুন তবে, আমার দিদি কথা বলতে পারে না। জন্ম থেকেই স্বরযন্ত্রের একটা ডিফেক্ট আছে ওর। ও সব শুনতে পায় কিন্তু কিছু বলতে পারে না। সেইজন্য সবসময় সংকুচিত হয়ে থাকে ও। বুঝলেন তো কেন ও কিছু বলে না আপনাকে? তারাতলার কাছে একটা ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড বাচ্চাদের স্কুলে পড়ায় ও। সেটুকু নিয়েই থাকে। আপনি ওকে পছন্দ করেন শোনার পর থেকে ওর জীবনটা একটু অন্যরকম হয়েছে। কিন্তু আর কি আপনি ওকে পছন্দ করবেন? ভালবাসবেন? একটা বোবা মেয়েকে ভালবাসবেন আপনি?"

পুরু নিষ্পলক তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর জিজ্ঞেস করল, "ও কি আমায় পছন্দ করে রাকা?"

রাকা বলল, "আমি জানি না, নিজেই জিজ্ঞেস করুন গিয়ে।"

পুরুর মাথা ঘুরছে যেন। ওর হাত পা কাঁপছে। এখন রোহিণী কোথায়? পুরু প্রায় দৌড়োতে লাগল রোহিণী যে-পথে হেঁটে গেছে সেই পথে। রোহিণী কি বাড়ি চলে গেল? প্রায় মল্লিকবাজারের মোড় এসে গেছে। ডানদিক দিয়েই রোহিণীদের বাড়ি যাওয়ার রাস্তা। পুরু দ্রুত বাঁক

নিল সেই দিকে আর তখনই চিৎকার শুনল একটা, "স্যার ওই দিকে না। সোজা গেছে সোজা, বাটা ফ্যাক্টরির দিকে।" পুরু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল রাস্তার অন্য দিক থেকে জ্যাকসন চেঁচাচ্ছে। ওর পাশে দিয়েগো, আমন, কবীর, সায়েকা, শিমুল, রুপাই আর কুশ। সবাই একসঙ্গে ওকে বাটা ফ্যাক্টরির রাস্তাটা দেখাচ্ছে।

পুরু থতমত খেয়ে গেল। ওরা জানল কী করে? যাক গে। পুরু এবার বাটা ফ্যাক্টরির রাস্তার দিকে যেতে লাগল। ও জানে এই পথ দিয়েও রোহিণীদের বাড়ি যাওয়া যায়। কিন্তু এখানেই বা রোহিণী কোথায়? এদিকটা বেশ ফাঁকা। এখানে পুজোটুজো হয় না। সন্ধের পর থেকেই ঝিম মেরে থাকে অঞ্চলটা। পুরু এদিক ওদিক দেখতে লাগল। এবার ভয় করতে লাগল ওর। যখন রোহিণীকে ওসব কথা বলেছে তখন ওর মাথার ঠিক ছিল না। কী বলতে কী বলেছে! মেয়েটা যদি কিছু করে বসে? পুরু পাগলের মতো এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। চারিদিকের গাছপালার মধ্যে ঠাহর করা মুশকিল। তবে কি ফিরে গিয়ে অন্য জায়গায় দেখবে? পুরু যখন কী করবে বুঝতে পারছে না ঠিক তখনই চোখে পড়ল ওর। দূরের দুটো বকুল গাছ, আর তার মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে রোহিণী।

পুরু একটু হেঁটে একটু ছুটে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রোহিণী মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুরু সামনে যাওয়াতেও মুখ তুলে তাকাল না। পুরু নরম করে ডাকল, "রোহিণী। আমার দিকে তাকাবে না রোহিণী? আমার এই তুচ্ছ, সামান্য জীবনটাকে বড় করে তুলবে না তুমি? আমার জীবনের সমস্ত ভাঙচুরগুলো তুমি ঠিক করে দেবে না নিজের হাতে? রোহিণী, আমাকে তোমার কাছে একটু রাখবে তুমি? আমাকে সারিয়ে তুলবে একটু?" রোহিণী ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকাল পুরুর দিকে। পুরু অবাক হয়ে দেখল সেই চোখ। এত সহজ, কিন্তু এত রহস্যময় আর কিছু কোনওদিন দেখেনি পুরু। পুরু ভাবল যার চোখ এত কথা বলে সে না হয় কথা বললই না। কী এসে গেল তাতে? পুরু

আলতো করে হাত ধরল রোহিণীর। হঠাৎ বড় রাস্তার ওখান থেকে হল্লা উঠল একটা। পুরু দেখল কুশ আর বাকিরা দাঁড়িয়ে আছে দূরে, আর ওদের দিকে হাত নাড়ছে।

পুরু হাসল। দেখল রোহিণী শক্ত করে ওর হাতটা ধরে রয়েছে। হঠাৎ মৃদুমন্দ হাওয়া বইতে লাগল। সরস্বতী পুজোর সন্ধে গাঢ় হয়ে রাতের দিকে চলতে লাগল। ওরা দু'জনে দু'জনকে ধরে দাঁড়িয়ে রইল ওই বকুল গাছের তলায়। আকাশে ভেসে থাকল শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ। দু'-চারটে রাতের পাখি হাওয়া কেটে চলে গেল কোথাও। তখন দূরে, ছায়ার মতো মানুষেরা সুখ দুঃখ পেরিয়ে হেঁটে চলেছে। গাছেদের নতুন হয়ে ওঠার সময় হয়ে এল। পাতা ঝরার মরশুম শেষ হয়ে এল প্রায়। বসন্ত আসছে। এই লেবু রঙের চাঁদ, এই সারি সারি ঘুমন্ত গুলমোহর, এই দু'-এক ঝাপটা ফুলের গন্ধ, এই কণ্ঠহারের মতো মার্কারি ভেপার, এই ঝুলনের মতো সাজানো শহরতলি, এইসব বন্ধুত্ব, এইসব ভালবাসা— সমস্তকে সাক্ষী করে, হাজার হাজার মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে, বসন্ত ফিরে আসছে আবার। বসন্ত ফিরে আসে বারবার।